সুধীন্দ্রনাথ

নিরঞ্জন হালদার
সম্পাদিত

বাঙালী প্রকাশ ভবন
১০৬/১, রাজা রামমোহন সরণী
কলকাতা-৭০০০০৯

ভূমিকা

কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পর্কে এই আলোচনা-গ্রন্থটি সম্পাদনার একটা ইতিহাস আছে। স্বাধীনতার রজত-জয়ন্তী বর্ষকে স্মরণীয় করার উদ্দেশ্যে ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট স্বাধীনতার পরবর্তী ২৫ বছরের বাংলা কবিতার একটা সংকলন প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন। এক কম্যুনিস্ট কবিকে ওই সংকলনটি সম্পাদনার ভার দেওয়া হয়। কিন্তু সংকলনের পাণ্ডুলিপিতে দেখা গেল, সুধীন্দ্রনাথ সমেত কয়েকজন অগ্রগণ্য কবির কবিতা ওই পাণ্ডুলিপির অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তখন সুধীন্দ্রনাথের কবিতার প্রতি নতুন করে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য 'কালি ও কলম' পত্রিকা একটা সুধীন্দ্রনাথ সংখ্যা প্রকাশ করেন এবং একই সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখের কবিতা প্রস্তাবিত সংকলনে স্থান দেওয়ার জন্য ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের উপর চাপ দেওয়া হয়, ব্যাপারটা লোকসভাতেও ওঠে। ফলে ওই কবি আগের পাণ্ডুলিপিটি সংশোধন করতে বাধ্য হন। দুটি প্রচেষ্টার সঙ্গে আমার যোগাযোগ থাকায় বন্ধুবর অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত একদিন আমাকে সুধীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটা বই সম্পাদনার দায়িত্ব নিতে বলেন। প্রথমে সংশয় ছিল, সাহিত্যের অঙ্গনে আনাগোনা নেই এমন কেউ এই জাতীয় বই সম্পাদনায় উদ্যোগী হলে লেখকেরা হয়তো সহযোগিতা করবেন না। আমার এই আশঙ্কা পরে ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়েছে।

মননধর্মী, যুক্তি-ভিত্তিক এবং সেই সঙ্গে আবেগ-মণ্ডিত কবিতার জন্য সুধীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে এক স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তক। তাঁর প্রবন্ধও যে জগতের সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেয়, পরবর্তীকালে প্রায় কোনো মননশীল লেখকের পক্ষে সেই জগতকে এড়িয়ে চলা সম্ভব হয়নি। যাঁরা মননশীল রচনা পাঠে আগ্রহী, একাধিক বিষয় বা বিশ্বের নানা সমস্যা কিংবা মানবসমাজের অগ্রগতি নিয়ে যাঁরা ভাবিত, বাংলাভাষার সেই সব পাঠক সুধীন্দ্রনাথের মধ্যে আত্মস্থ হতে পারেন, শানিত করতে পারেন নিজের বুদ্ধিবৃত্তিকে, আর গর্বিত হতে পারেন নিজের সাহিত্যের ঐতিহ্যের কথা ভেবে। রবীন্দ্রনাথে যে ধারার সূত্রপাত, সেই ধারার একটা বিশেষ স্রোতকে একটা বিশেষ দিকে নিয়ে গিয়েছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। বর্তমানে হতাশ

হলে সান্ত্বনা বা নতুন পথের হদিস পাওয়ার আশায় মানুষ পিছনের দিকে তাকায়। ইউরোপের মানুষ অনেক সময় পিছন ফিরে গ্রীক দর্শন ও সাহিত্যে অবগাহন করে এবং নতুন করে যুক্তি-ভিত্তিক মানসিকতাকে পুষ্ট করার সুযোগ পায়। এইভাবেই ইউরোপে রেনেশাঁসের সূত্রপাত হয়েছিল। কিন্তু এদেশের মানুষ পিছন ফিরে তাকালেই সাধারণত ক্রমেই যুক্তিহীন এবং নানা ধরনের গোঁড়ামির শিকার হয়। বর্তমানে এদেশে শিক্ষার মান দ্রুত নামছে, বিদেশের উন্নত চিন্তা-ভাবনাও তিরিশ দশকের মতো এদেশের যুব-সমাজকে আলোড়িত করছে না। ফলে বাংলা সাহিত্যের কর্মীদেরও নিজেদের যুক্তি-ভিত্তিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সাযুজ্য স্থাপনের প্রয়োজন। এটা দরকার পুরানো চিন্তা-ভাবনার জাবর কাটার জন্য নয়, ঐতিহ্যে অবগাহন করে নতুন ভাবনা-চিন্তা করা বা তার ফসল তোলার জন্য, নিজেদের স্বাবলম্বী করার জন্য। আমার ধারণা, মহৎ লেখক হতে হলেই তাঁকে ঐতিহ্যে পা রাখতে হয়। ঐতিহ্যের প্রতি অন্ধ আনুগত্য যেমন অগ্রগতির সব পথ রুদ্ধ করে দেয়, তেমনি ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে আর যাই হোক, কোনও চিরায়ত সাহিত্য রচনা সম্ভব নয়।

এই বইয়ের প্রতিটি রচনাই সুপরিকল্পিত। রচনাগুলিও বিষয় অনুসারে সাজানো। তাই নামী বা বয়স্ক লেখকদের প্রথম দিকে স্থান দেওয়ার কথা চিন্তাই করা হয়নি। যিনি যে-বিষয়ে পারদর্শী, প্রধানত সেই বিষয়ে তাঁর রচনা এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রেও বয়সের বাছবিচার করা হয়নি। প্রবাল দাশগুপ্ত যখন সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধটি লেখেন তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র উনিশ বছর এবং এটাই তাঁর জীবনের প্রথম রচনা। আবদুল মান্নান সৈয়দের মূল প্রবন্ধটিও বাইশ বছর বয়সে লেখা। পরিকল্পনা অনুসারে প্রতিটি ক্ষেত্রে নতুন লেখা না-পাওয়ায় পত্র-পত্রিকা থেকে পুরানো লেখা ও চিঠি বাছাই করতে হয়েছে! এই গ্রন্থে সুধীন্দ্রনাথ কবি হিসাবে প্রাধান্য পেলেও, পাঠক-পাঠিকারা তাঁকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জানবার সুযোগ পাবেন। আবার নানা দিক থেকে সুধীন্দ্রনাথের কবিতার বিচার-বিশ্লেষণের চেষ্টা হলেও কয়েকটি প্রাসঙ্গিক মন্তব্য ছাড়া তাঁর প্রেমের কবিতা সম্পর্কে একটা পৃথক আলোচনা এই গ্রন্থে অনুপস্থিত। এটা এই বইয়ের একটা উল্লেখযোগ্য ত্রুটি। সময়াভাবে নরেশ গুহ, শিবনারায়ণ রায়, সন্তোষকুমার ঘোষ, নীরেন্দ্রনাথ

চক্রবর্তী ও আরও দু' একজন এই সংকলনের জন্য লিখতে পারেননি। আশা করা যায়, তাঁদের লেখা নিয়ে ভবিষ্যতে আর একটা সংকলন প্রকাশিত হবে। আমার আবেদনে সাড়া দিয়ে যাঁরা লেখা পাঠিয়েছিলেন, স্থানাভাবে তাঁদের সকলের লেখা এখানে ছাপা গেল না। এজন্য আমি ওই লেখকদের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। প্রকাশনার ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় এই বই-এর আকার আর বড় করা সম্ভব হল না। একই কারণে এই বইয়ের বিভিন্ন প্রবন্ধ ছোট করতে হয়েছে। আশা করি লেখক ও পাঠক-পাঠিকারা সেজন্য আমাকে ক্ষমা করবেন।

এই বই সম্পাদনার ব্যাপারে আমি অনেকের কাছেই ঋণী, পৃথকভাবে তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হলেও দিল্লির নেহরু মিউজিয়মের জে-এস-নাহালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। চিঠিগুলি মাইক্রোফিলম করা বাবদ টাকার জন্য অপেক্ষা না করে তিনি নিজের দায়িত্বে মাইক্রোফিলম পাঠিয়ে পরে টাকার জন্য বিল পাঠিয়েছিলেন। পৃথিবীর কোনও লাইব্রেরির পক্ষে যে এ-ধরনের কাজ সম্ভব, তা আমার ধারণার বাইরে ছিল। মাত্র দুদিনের মধ্যে 'সুধীন্দ্রনাথের রচনার বর্ণানুক্রমিক সূচী' তৈরি করে দেওয়ায় শ্যামল বিশ্বাসের নিকটেও আমি কৃতজ্ঞ।

প্রথম পরিকল্পনার পর থেকে বইটি ছাপা হতে প্রায় আড়াই বছর লাগল। বইটির জন্য শ্রীমতী রাজেশ্বরী দত্ত লণ্ডনে অধীর হয়ে অপেক্ষা করেছেন, কখনও টেলিফোনে জানতে চেয়েছেন বইটি বের হয়েছে কিনা। আর বইটি সম্পাদনায় অগ্রণী হয়েছি শুনে যিনি নিজে উৎসাহিত হয়ে সকলকে অনুরোধ করেছিলেন আমাকে সাহায্য করতে, দিয়েছিলেন নানা রকম পরামর্শ, এবং বইটি হাতে পেলে হয়তো আনন্দে চেয়ার বা সোফা ছেড়ে উঠতেন এবং তারপর একটা সিগারেট ধরাতেন, বইটি প্রকাশিত হওয়ার অনেক আগেই তিনি আমাদের মধ্য থেকে বিদায় নিয়েছেন। বইটি বের হল অথচ বুদ্ধদেব বসু নেই, কথাটা ভাবতেই খারাপ লাগছে।

বইটি সুধীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নতুন করে আলোচনার সূত্রপাত ঘটাতে পারলে এই সংকলনের জন্য সময় ও অর্থব্যয় সার্থক হয়েছে বলে মনে করতে পারব।

ইতি—

নিরঞ্জন হালদার

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বুদ্ধদেব বসু, রাজেশ্বরী দত্ত, অম্লান দত্ত, কিটি দত্ত. সন্তোষকুমার ঘোষ, অরুণকুমার সরকার, নরেশ গুহ, চিন্ময়ী গুহ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, আলোক সরকার, নবনীতা দেব সেন, অনাথ মিত্র, দীপক বসু রায়চৌধুরী, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ দত্ত, সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন সেন, মায়া শাসমল, কার্তিক শাসমল, জে. এস. নাহাল, আর. এল. নিগম, নকুল চট্টোপাধ্যায়, আশিস নিয়োগী, মণি দাশগুপ্ত, বিপ্লব দাশ, রাধানাথ মণ্ডল, শ্যামল বিশ্বাস ও দুলালচন্দ্র ভুঞ্যা।

বিশ্বভারতী, ইণ্ডিয়ান রেনেশাঁস ইনস্টিটিউট (দেরাদুন), নেহরু মিউজিয়াম (দিল্লি), জাতীয় গ্রন্থাগার ও এশিয়াটিক সোসাইটি (কলকাতা)।

কবিতা, কবিতা পরিচয়, কালি ও কলম, উত্তরসূরী, শতভিষা, র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট, দেশ, কৃত্তিবাস ও পুরোগামী।

সূচীপত্র

চিঠিপত্র

আবদুল মান্নান সৈয়দ

সুধীন্দ্র কাব্যের পটভূমি

সেটা ছিল ১৯১৪-র মধ্যগ্রীষ্ম, যখন য়ুরোপে ছোট্ট একটি যুদ্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে অচিরেই মহাদেশের পাঁচটি বৃহৎ শক্তিকে জড়িয়ে ফেললে শীতোষ্ণ নাগপাশে, আর তারপরই দ্রুত ঘন করতালে পৃথিবী ভরে শুরু হয়ে গেল এই শতকের প্রথম প্রধান যথেচ্ছ তাণ্ডব। এতদিনে বিচূর্ণ হল শান্ত, সোনালী, সুখদ, বরদ ও শুভদ উনিশ শতক। একটি আস্ত বিশ্বযুদ্ধ যেন পাল্টে দিল একই সংগে প্রাক্তন ফিজিক্স আর ফিলজফি।

আকাশ-পাতাল তোলপাড়ের মধ্য দিয়ে এক নতুন ভুবন জেগে উঠবে, এমন ধারণা আলো হয়ে ছিল সব মানুষের মনে। কিন্তু বিশ্বব্যাপী এইসব স্বপ্নরঙা সুধী-চিত্ত মারাত্মক ভুল বুঝে এক সময়ে খাঁচার ভিতরে চমকে উঠল, উদ্যোগের ময়ূরপঙ্খী গতি হারালো বাস্তবের পঙ্ককুণ্ডে এসে। এই বঙ্গভূমিতেও প্রতিশ্রুত বিপ্লব চিন্ময় মেরুদণ্ড ভেঙ্গে ফিরে এল।

শেয়ারমার্কেট আছড়ে পড়ে শতচূর্ণ হয়ে গেল, হাজার বাতির ঝাড়লণ্ঠন গেল এক ফুঁয়ে তমসায় তলিয়ে, দেখা দিল 'গ্রেট ক্রাশ' তথা নিরালম্ব শনির সময়। সদাগর, স্বৈরাচারী আর একনায়কের একচ্ছত্র শাসনের তলায় হীরের ভিতরে বিষের মতো শুকিয়ে ছিল দারুণ যে-সঙ্কট, এবার তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মূর্তি ধরে বেরিয়ে এল। এসে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যার ভিৎ কাটিয়ে দিয়েছিল, সেই দ্বিধা টলোমলো বিশ্বাসের মাটি দিলে একেবারে সরিয়ে; 'ধর্ম' নামক বিশ্বাসের যে-দুর্গে অন্তিম এতকাল ছিল মানুষের আশ্রয়, তাও ধ্বসে পড়ল; প্রাক্তন পৃথিবীর যাবতীয় তরু, প্রদীপ ও জল ছেড়ে দিয়ে অন্য এক পাতাশূন্য গাছ ও বিমর্ষ আলো ও ঘোলা ডোবার শোচনীয়তায় এসে উপস্থিত হল এই গ্রহের মানুষ।

কোনো লেখকই সময় সীমা ও দেশ পরিধির বাইরের অধিবাসী নন এবং স্বভাবতই তার উপর কালের শাসন পড়ে থাকে। অন্যান্য দেশের মতো,

বাংলাভূমির কবি কথকদের উপরেও এই সময়-শাসন লক্ষ্য করা যায়। বিশ-শতকীয় বাংলা কাব্যের তিন প্রধান—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম ও জীবনানন্দ দাশ—উপযুক্ত সময়কে ছুঁয়ে আছেন, ঐ যুগের স্বাক্ষরও আছে তাঁদের রচনায়। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন 'বিংশ শতাব্দীর সমবয়সী', 'জন্মাবধি যুদ্ধে যুদ্ধে, বিপ্লবে বিপ্লবে' বেড়ে উঠেছেন, 'বিনষ্টের চক্রবৃদ্ধি' দেখে হয়তো তাঁর হাত থেকে আস্তে আস্তে ঝরে পড়েছে 'অগ্রজের অটল বিশ্বাস'। অবশ্য একথা কখনো বলা যাবে না যে, এই কবি নিছক সময়ের দান। কোনো শিল্পীই তা হতে পারেন না—তাঁর সমকালে অন্য যে-সব কবি কাব্য রচনা করেছেন, তাঁদের সঙ্গে তাঁর মানস ও কবিতার ব্যবধানই তাহলে সম্ভব হত না। কবির রচনায় সময়ের ছাপ স্পষ্ট, তত্রাচ একথা কখনই বলা যায় না যে সময়ই কবিতার ছাঁচ গড়ে তোলে। বস্তুত কোনো এক অলৌকিক, অচেনা অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপই কবিতার জন্মদাত্রী।

কবির শৈশব কেটেছে যুদ্ধের নান্দীরোলের ভিতর, দেশে ও বিদেশে এক প্রবল ঝটিকা যখন পণ করে বসেছে সনাতন মানবচিত্তকে সে বিদীর্ণ করবেই। কিন্তু কেবল বহির্জগতের সাধ্য ছিল না কবির কাব্য নিরূপণের। তাহলে তাঁরই সমকালীন বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে ও জীবনানন্দ দাশ কী ভাবে কালো সময়ের প্রভাব থেকে মুক্তি পেয়ে গেলেন? বুদ্ধদেবের নির্দ্বন্দ্ব নন্দন-সর্বস্ব স্নিগ্ধতা, অমিয় চক্রবর্তীর ঈষদবিদীর্ণ আধ্যাত্মিকতা ও বিষ্ণু দে'র উদ্বেল বিশ্বাস কী ভাবে সম্ভব হল? একমাত্র জীবনানন্দ দাশের সংগেই তাঁর মনোজগতের কিছু ঐক্য দ্রষ্টব্য: জীবনানন্দ সারা জীবন ক্লান্তির কথা বলেছেন। আর সেজন্য ধরা দিতে চেয়েছেন 'স্বপ্নের হাতে'; সুধীন্দ্রনাথের মতোই মৃত্যু কামনা করেছেন, অবশ্য জীবনানন্দ শেষ পর্যন্ত 'কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে', এ-রকম আশাই রেখে গেছেন।

সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় যে নিখিল নিবিড় নৈরাশ্য, তার পিছনে কারণ ছিল একাধিক। শুনিতে পাওয়া সময়, রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আর সবার উপরে তাঁর কবিহৃদয়ের উন্মুখতা সত্যিকার অন্তঃপ্রেরণা না থাকলে এই নিরাশাকে তিনি আজীবন আগলে রাখতে পারতেন না। তবু, কোনো কবিই স্বয়ম্ভূ নন, প্রথম পাঠে কোনো কবিকে যতই অভিনব লাগুক, একটু মনোযোগ দিলেই তার পিছনে অন্তত কিছুকালের রচিত ইতিহাস দেখা যাবে। অর্থাৎ সুধীন্দ্রনাথ এই নৈরাশ্যের প্রথম শিকার নন এবং তা নিতান্ত বিদেশ বাহিতও

নয় : এই স্বদেশেই তার আগে এবং সমকালে অন্তত কোনো-কোনো কবি, অন্তত কোনো কোনো সময়ে এই নৈরাশ্যের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন।

"বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক কবি, মাইকেল মধুসূদন দত্ত পরিপূর্ণ আশাবাদী ছিলেন—একথা মানতে আমি প্রস্তুত নই। সত্য, উনিশ শতকী উজ্জীবনের দিনে তাঁর জন্ম, এবং তাঁর রচনাতেও প্রচুর উজ্জ্বল সাক্ষ্য আছে তবু তাঁর মনোজগৎ যেখানে বিদীর্ণ, সেখানে তিনি বিশ-শতকী নাগরিক, আমাদেরই একজন, এবং তাঁর বিদ্রোহ যদি অধিকতর অন্তর্মম্য ও সাহিত্যিক হত, তাহলে তিনি নিরন্তর যে অনুতাপে দগ্ধ হয়েছিলেন, যে আশার ছলনে পতিত হয়েছিলেন, তা দুরতিক্রম্য ও নৈরাশ্য নিবিড় হত সন্দেহাতীত ভাবে। মাইকেলের কোনো প্রতিভাবান অনুসারক বাংলা সাহিত্যে দেখা যায়নি—হেম-নবীন-কায়কোবাদ শুধুমাত্র প্রতারক বহিরঙ্গের ছদ্মবেশে মজেছিলেন—তা নইলে তাঁর অজাত সন্তানের ভিতরে উপযুক্ত মনোভাব প্রকাশ পেতে পারত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিরাট প্রভাবই হয়তো সে পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিল; এবং তাই যতদিনে সূর্যাস্ত হল তারপরে মাইকেলের ঐ অভ্যন্তরীণ প্রভাবই আধুনিক পোশাকে মুড়ে এসে সুধীন্দ্রনাথে ফলে উঠল।

বস্তুতঃ, উক্ত লুক্কায়িত নৈরাশ্য বাদ দিলে বাংলা ভূমির সমগ্র উনিশ শতকী সাহিত্য শতবিচিত্র মঙ্গলের প্রসঙ্গে উন্মুখর। রবীন্দ্রনাথ, কিন্নরকণ্ঠ, এসে ঐ কল্যাণের মন্ত্র—একান্ত বাংলাভূমির কল্যাণের মন্ত্র ছড়িয়ে দিলেন বিশ্ব-সংসারে। পৃথিবীকে তিনি ভালবাসেন, এই একটি কথাই কতবার কতভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বললেন। আশি বছর ধরে বললেন বারবার 'যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নাই,' ক্লান্তিহীন পুনরাবৃত্তিতে এক জীবনে শুধু ভালবাসা তাঁকে রোজ রোজ জন্ম দিয়ে গেল। শুধু কল্যাণ মঙ্গল ভালো, শুধু সুখদ ভাবনার অত্যধিক প্রজননেও ক্লান্তি তাঁকে পেড়ে ফেলতে পারল না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সুখের বিষয়, আমার পূর্বোক্তিই অসাধ্য হত এবং রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ মহত্ব লাভ করতে পারতেন না, যদি না তিনি উত্তর জীবনে হঠাৎ প্রায় হঠাৎ, জীবনের অন্য একটি দিক সম্বন্ধে অবহিত হয়ে উঠতেন: চিত্রপর্যায়; 'সে', 'খাপছাড়া', ও 'গল্পসল্প' ছোটদের উদ্দিষ্ট এই তিনটি গ্রন্থ, 'ল্যাবরেটরি' গল্পটি, 'মালঞ্চ' ও 'চার অধ্যায়' উপন্যাস; 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধ; একেবারে শেষ জীবনের কোনো-কোনো কবিতা।

উনিশ শতকী বাস্তবতা ও সৌন্দর্যধ্যান থেকে মধ্য বিশ-শতকের অবচেতনা

পর্যন্ত তাঁর মহাকবির হাত প্রসারিত হল অন্ত-জীবনের নিরর্থ-সুন্দর কাটাকুটিতে কি দুঃস্বপ্নপ্রতিম চিত্রপারম্পর্যে : চাঁদ, গোলাপ ও নারীর মুখের ছবি এক ভীষণ সুন্দর ভূতলবাসের ইতিকথা রচনা করে দিলেন—যা দেখলে আমাদের রক্তের ভিতরে ভয় করে।—তবে কি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তিনিও মানুষ, প্রাণপণে চাপা দিয়ে রেখেছিলেন নিজের একটি অংশ, যা মৃত্যুর কয়েক বছর আগে হঠাৎ বেরিয়ে এলো নিগূঢ় ভিতর থেকে? 'ল্যাবেরেটরি' ও 'চার অধ্যায়ের' কোনো কোনো অংশ যৌনতায় আরক্ত হয়ে উঠল : 'সে', 'খাপছাড়া' ও 'গল্পেসল্পে' মহাকবির সমুদ্রপ্লাবী করুণা মুখ ফিরিয়ে থাকল, আদর্শরোষে ও পবিত্র-ঘৃণায় তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল তাঁর রচনা, দেখলেন : সিভিলাইজেশনের সবচেয়ে প্রধান কাজ মানুষকে পেষণের, এমন কী, এমন কথাও তার মনে হল, 'মানুষকে ভুল করে গড়েছেন বিধাতা'। এইসব রচনার জন্য তাঁর অন্তর্জীবন যেমন, তেমনি তাঁর সমকালও সমানভাবে দায়ী। একদিন দেখেছিলেন 'জগৎ পারাবারের তীরে ছেলেরা করে খেলা'। তারা যে কী সর্বনেশে সন্তান এতদিনে বুঝতে পারলেন যেন। তাঁর পক্ষে আশ্চর্য, বাংলা সাহিত্যের পক্ষে 'মালঞ্চ' উপন্যাস রচনা করলেন, রৈবিক মালঞ্চের বুঝি বিষপুষ্প ফুটে উঠতে চাচ্ছে তখন—নির্মম ঐ গ্রন্থ, দয়াহীন তার কুশীলবেরা : আদিত্য, নীরজা, সরলা সকলেই তাই, তার উপসংহার ক্ষমাহীন :

'হঠাৎ ঢিলে শেমিজপরা পাণ্ডুবর্ণ শীর্ণ মূর্তি বিছানা ছেড়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলো। অদ্ভুত গলায় বলল, "পালা পালা পালা এখনই, নইলে দিনে দিনে শেল বিঁধব তোর বুকে, শুকিয়ে ফেলব তোর রক্ত।" বলেই পড়ে গেল মেঝের উপর।'

এই মনই ভীষণ রেগে উঠেছে—'সভ্যতার সংকট' নামক বহ্নিমান প্রবন্ধে :

'জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল।'

রবীন্দ্রনাথের সমকালে যে কজন কবি তাঁর সর্বগ্রাস থেকে নিজেদের কোনো রকমে স্বতন্ত্ররূপে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন : নজরুল ইসলাম, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও মোহিতলাল মজুমদার। স্মরণীয়, তিরিশের কবিরা প্রথমাবস্থায় এইসব বিধর্মীদের শরণ নিয়েছিলেন। নজরুল বলীয়ান যৌবনের, মোহিতলাল তীব্র দেহবাদের ও যতীন্দ্রনাথ তিক্ত দুঃখবাদের পথ বেছে

নিয়েছিলেন। যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের কোনো দিক থেকেই মিল নেই, এবং শেষোক্তের তুলনায় প্রথমজন অনেক অগভীর। তত্রাচ, যতীন্দ্রনাথের নাম এ কারণে উল্লেখযোগ্য যে, তিনিই প্রথম স্পষ্টভাবে তির্যকভাবে মানব জীবনের দুঃসহ নৈরাশ্যের কথা বলেন—অবশ্য তা জীবনের উপরিস্তরের বাস্তবতার, তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'মরীচিকা', 'মরুমায়া' ইত্যাদি নামের মধ্যেই তাঁর জীবন-দর্শন বিম্বিত।

//তিরিশের শ্রেষ্ঠ কবি ও বাংলা কাব্যেতিহাসের অন্যতম প্রধান, জীবনানন্দ দাশও অফুরান নৈরাশ্যের অধিগত হয়েছিলেন, তার চিহ্ন ছড়ানো আছে তাঁর প্রতিটি কাব্যগ্রন্থে ; হয়তো সেজন্যই তিনি বাংলাদেশের নামে এক অসম্ভব দেশে বাস করে গেছেন যা মানচিত্রে অদৃশ্য। অবশ্য কোনো কবিই মানচিত্রের জগতে অবস্থান করেন না ; তাঁরা মনোজগতের অধিবাসী। যে সর্বাত্মক বিনষ্টির অমর গল্প বেদনাময় রেখায় ধরা পড়েছে তাঁর সূক্ষ্ম তুলির আখরে যে মৃত্যু-চৈতন্যে তিনি সারাজীবন ক্ষয়ে গেছেন ভিতরে-ভিতরে, অবিরল যে ক্লান্তির কথা বলেছেন—তারাই সমবেত হয়ে এসে সাক্ষ্য দিয়ে যায় যে, তিনি একালেরই পতিত ব্যসিন্দা। আমেরু ব্যবধান সত্ত্বেও, জীবনানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথ তিরিশের এই দুজন প্রধান কবির কাব্যের ঋতু হেমন্ত : পশ্চিমে এই ঋতুতে যেমন পাতা ঝরে যায়, পাখি চলে যায় অন্য জীবনে, তেমনি বাংলাদেশেও এই ঋতু বিনষ্টির, হারানোর, শস্য-রিক্ততার, উত্তর ফাল্গুনীর, ধূসর পাণ্ডুলিপির।//

তবে সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন না শুধু ইতিহাসের পুত্তলি, শুধু পারিপার্শ্বিকের দাস, এই দীন, জীর্ণ, গৈরিক সময়ে কবি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উক্তি যিনি করতে পারেন তার অন্বেষণ যে অসীমের খাণ্ডে ভরা তাতে আর কোনো সন্দেহ থাকে না :

'চিরকালের কীর্তিস্তম্ভগুলোকে ভেঙে চুরে সভ্যতার স্টীম রোলার আজ যখন তার অভিমুখে ধাবমান, তখনও দুঃসাহসে ভর করে কবি আছে সৌন্দর্যের দরজা আগলে। তার মনে আশা নেই। সে জানে তার পরাজয় নিশ্চিত। সে বোঝে সে একা ; যাদের জন্য তার বিদ্রোহ তাদের কাছে এই আসুরিক স্পর্ধা যেহেতু পাগলামিরই নামান্তর, তাই তার পরিচিত বিশ্বকে দৈব ছাড়া কেউ বাঁচাতে পারবে না। তবু তার চেষ্টার ত্রুটি নেই, বিরাম নেই তার গানে। সে-গান হয়তো আনন্দের নয়। তার কণ্ঠ হয়তো ক্রোধে ও ক্ষোভে কর্কশ। ভয় ভুলতেই সে হয়তো চেঁচিয়ে সারা, কিন্তু আসন্ন প্রলয়ের প্রখর কোলাহল ছাপিয়ে

উঠেছে একা তারই বাণী। অতএব সে আমাদের নমস্য, রাহুগ্রস্ত হলেও সে আমাদের নমস্য।' (কাব্যের মুক্তি, স্বগত, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।)

মৃত্যু-চেতনার কবিতা হিসেবে জীবনানন্দের 'অন্ধকার' কবিতাটির সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের 'মহানিশা' তুলনীয়; হয়তো দুই কবিই তলায়-তলায় একই বিষাদ ক্লান্তির শিকার হয়েছিলেন বলেই ঐ কবিতা লিখেছিলেন: কিন্তু 'অন্ধকার' কবিতায় জীবনানন্দকে ভরে রেখেছিল অরুচি ও বিবমিষা, জীবনের বিরুদ্ধে প্রতিজ্ঞা ও অভিমান; আর সুধীন্দ্রনাথ যেন অন্তিম দিনের কল্পনায় গলে গেছেন মধুরতম কবিত্বে, মধুরতম নারীত্বে—রবীন্দ্রনাথ বা দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রায় অনুরূপ কবিতা লিখে গেছেন। তবু জীবনানন্দ দাশের হীরকঝটিকা প্রবন্ধসমূহে যে-শব্দটির ব্যবহার নিরন্তর ও অবিরল, 'চেতনা', সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন তারই পরিপূর্ণ অধিকারে। তাঁর অন্বিষ্ট ও গন্তব্য ছিল আত্মপরিচয় ও আত্মসন্ধিৎসা; ঐ গন্তব্যের পরিচ্ছন্ন আঁকাবাঁকা পথ হচ্ছে 'চৈতন্য', আর অভিজ্ঞতা তার মাইলে-মাইলে সঙ্কল্প ও স্টেশনের মতো, ঐ চৈতন্যের পশ্চাদ্ভাবনে যদি ফুটে ওঠে কোন উপলব্ধি, আর তাকে যদি সৎভাবে ও শিল্পিতার সংগে ভক্তির ভিতর নিবিষ্ট করা যায়, তাহলেই নিবিড় সঙ্কট কেটে কবিতা উদ্গত হতে থাকে।

সুধীন্দ্রনাথ বার বার উল্লেখ করেছেন 'উক্তি ও উপলব্ধির অদ্বৈত' কথাটি; তাই হচ্ছে সততা, ধৈর্য আর পরিশ্রম, তাই হচ্ছে উদ্যম, উন্মীলন আর অধ্যবসায়, পরবর্তীযুগের কবিযশোপ্রার্থীদের যার কাছে ফিরে আসতেই হবে।' কবির উক্তি ও উপলব্ধির অবিচ্ছেদ যতই ঘনিষ্ঠ হোক না কেন, তাঁর উপলব্ধির সঙ্গে তাঁর প্রকাশভঙ্গীর একটি অ-সামঞ্জস্য লক্ষ্য না করে আমরা পারি না: যিনি বার বার তুঙ্গী হাহাকার করে উঠেছেন, তিনি কী ভাবে রচনাকর্মে এত সযত্ন ও নিষ্ঠাবান হতে পারলেন? যাঁর মনোরচিত ভুবন ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাচ্ছে বাস্তবের সঙ্কটে, তিনি একবারও ভেঙ্গে পড়েন না কেন? তাঁর জীবনে বা রচনায় কেন সেই নাস্তিকেন্দ্রিক শতদলে পতন বা ছিদ্র পাই না, যার সুবিধায় আমরা নিজেকেই তার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখতুম? এইসব সংগোপন ও রুদ্র জিজ্ঞাসার মোটামুটি একটা উত্তর আমরা নিজেরাই তৈরি করে নিতে পারি: প্রথমত, কবি নিজে যাই হোন না কেন, শিল্প দাবি করে চরম অভিনিবেশ, যুগ বিশৃঙ্খল এই কৈফিয়তের সুযোগে রচনাধারা স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠলে শিল্পকর্মের অপমানই শুধু স্তূপীকৃত হয়ে ওঠে; দ্বিতীয়ত, সুধীন্দ্রনাথের 'অবিশ্বাসে বিশ্বাস' ছিল দৃঢ় ও সম্পন্ন এবং এরকম একটি বিশ্বাস না থাকলে

তুচ্ছতম কাজে কড়ে আঙুলও নড়ানো যায় না ; অবিশ্বাস যখন ধূসর ও নামহীন চরমে উঠে যায়, তখন নিজস্ব সৃষ্টিও এত ফাঁপা ও আত্ম-প্রবঞ্চক মনে হয় যে, তুলিকলম আর চলে না। সত্যিকার অবিশ্বাসের সমাপ্তি মৌনতায় ও বন্ধ্যাত্বে।

আমি মনে করি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত একালের শ্রেষ্ঠ কবি প্রতিনিধি ; দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময় তথা অর্ধ-বিংশ শতক, একজন বাঙালী কবির উপর কি নিরীশ্বর, অবিশ্বাসী, অপ্রেমের শরীর ও মাত্রা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল তাঁর ছয়টি (অনুবাদ কাব্য প্রতিধ্বনি বাদ দিয়ে) পরিপূরক কাব্যগ্রন্থে তার নগ্ন, তুঙ্গ ও মারাত্মক প্রকাশ। আমি বলতে চাচ্ছি : এই কবির ভিতর ভূগোল-ব্যাপ্ত বিষাদ ও নৈরাশ্য পরিপূর্ণ আকৃতি পেয়েছে, আচ্ছাভাবে তাঁকে কামড়ে ধরেছে মরীয়া সমকাল, তাঁর সমকালীন আর সব বাঙালী কবির চেয়ে বেশী করে, আর সেটাই সুধীন্দ্রীয় প্রতিকৃতি।

কোনো লেখকই সম্পূর্ণ মৌলিক বা স্বতন্ত্র নন, কেননা সাহিত্যের অঙ্গনে স্বয়ম্ভুর স্থান নেই। বাংলাভূমিতে উত্তররৈবিক কাব্যবিলোড়নও স্বভাবের নিয়মেই সম্পূর্ণ নতুন নয়, আক্ষরিক অর্থে সর্বাঙ্গে সম্পূর্ণ অভিনব নয়, বস্তুত 'অভিনব' বিশেষণটি আর যেখানেই মানাক সাহিত্যিককে সাজে না। তাই অভিনিবেশ দিলে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যকৃতির পশ্চাতেও দেখা যায় সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সব মহাজন—এক ঐতিহ্য—এক উদ্যমের ধারার উত্তরসাধক তিনি। অন্ততপক্ষে বাংলাদেশের তিনজন কবির ঠাণ্ডা উপস্থিতি তিনি তাঁর কাব্যে স্বীকার করে নিয়েছিলেন : মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মোহিতলাল মজুমদার। সত্য, মাইকেল সেখানে উনিশ-শতকী মনোপ্রাসাদে ধনী, যেখানে তাঁর কবিতা বর্ণনা প্রচুর, যেখানে তিনি মহাকবির চরিত্রে বিশেষিত,—সেখানে এই শতকের সুধীন্দ্রনাথ অন্তর্বিপ্লবের স্বর্গ ও নরকের যাতায়াতে বিক্ষত, অগ্রজের অটল বিশ্বাস লুপ্তিবরণ করেছে তাঁর মন থেকে, সময়-স্বভাবের প্রভাবে তাঁর কবিতায় ব্যঞ্জনাবীথি ছড়ানো এবং ভবঘুরে গীতি কবিতার স্বপ্নদ্রষ্টা। তত্রাচ এই দুই দত্তজ কবিতে কিছু ঐক্য চোখে পড়ে ; বহিরঙ্গ সাযুজ্য : কঠিন সংবৃত, সংস্কৃত শব্দব্যবহারে, যত্নকৃত যতিচিহ্নের উপস্থাপনে ও গঠনের নিবিড় জ্যামিতিতে ; আর গভীরতর অন্তরঙ্গ মিল এইখানে : দুজনই আত্মতাড়িত, মানসিক জর্জরিত দ্বৈরথ সময়ে দুই বিক্ষুব্ধ সন্তান, এক দারুণ অপ্রতিকার্য নিয়তি চৈতন্যের পুত্র ; ব্যক্তি জীবনে মস্ত পার্থক্য, কিন্তু মনোজীবনে বুঝি সন্দেহ আর সংরাগে অনন্য : সুধীন্দ্রনাথ

আধুনিক কুশল মানুষের মতোই, ভদ্রলোকিত্বের ইস্ত্রিকরা পোশাকের তলায় ঢেকে রেখেছিলেন অন্তর্জগতকে—পশুশালাকে, যার দরজা খুলে দিলেই হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসত রবীন্দ্রনাথের ছবি—যেখানে সন্দেহ, অসুখ, বিবেক, অপ্রেম, চিৎকার, স্মৃতিকষ্ট, আর সর্বোপরি সে লোকোত্তর তাড়না, যার দেহ থেকে ঈশ্বরকে কিছুতেই উচ্ছিন্ন করা যায় না। থেকে যান তিনি, হায়, থেকে যান তিনি চৈতন্যের অলিগলির বিপদ-আপদে। ফলত, মাইকেলের প্রাক্তনই সুধীন্দ্রনাথে গুরুতর 'ভবিতব্য' হয়ে দেখা দিয়েছে। এখানে আমার একটি ব্যক্তিগত ধারণা ব্যক্ত করি: মাইকেল ও সুধীন্দ্রনাথের বংশ বাংলাদেশে কোনোদিন একেবারে লোপ পাবে না। কথ্যভাষার একক জয়যাত্রার দিনেও ফিরে ফিরে দেখা দেবে; কেননা এই দুজন এমন একটি প্রসঙ্গের কোলে নিজেদের স্থাপন করেছেন, যেখানে কোনো কোনো সত্যসন্ধিৎসু-কে কালে কালে আসতে হয়, কেননা তা মানবের গভীরতর নীলাভ—শীতল অভিজ্ঞানেরই অবশ্য অংশ। আর সুধীন্দ্রনাথ তো রবীন্দ্রনাথের যুগের মানুষ, একরকম রবীন্দ্রছায়ায় লালিত; রবিশস্যে তাঁর অধিকার খুব স্বাভাবিক। তাঁর কাব্য প্রথমায় রবীন্দ্রানুসরণ শেষ পর্যন্ত অবশ্য টেঁকেনি, এটা সুখেরই বিষয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতার মেজাজকে ব্যবহার না করে তাঁর উপায় ছিল না—বাংলাদেশের উত্তররৈবিক সকল কবিকেই তা করতে হয়েছে। আর রবীন্দ্রনাথ, সর্বগ্রাসী কবি, শুধু খেয়ালী অতিপ্রজ রচনারই জনক নন, তিনি ক্লাসিক গঠনেরই অধিকারী বটে: অন্তত স্তবকগঠনে ও ছন্দোরক্ষায় রবীন্দ্রনাথ কোথাও স্বেচ্ছাচারিতা করেননি, শুধু অপার, অবাধ স্বাধীনতাই মেনে নিয়েছিলেন;—হ্যাঁ 'স্বাধীনতা' অর্থাৎ শুধু নিজের অধীনতা, এবং যে নিজের অধীন নয়, স্বায়ত্ত-শাসক নয়, তার কাব্যচর্চা পণ্ডশ্রমমাত্র। আরো: সুধীন্দ্রনাথ গঠনে ও মনোভাবে ক্লাসিক ঐতিহ্যেরই সাম্প্রতিক উত্তরাধিকারী বটে, তবু রোমান্টিক উজ্জীবন তাঁর মধ্যে স্বতঃপ্রকাশ, কেননা একালে বোধহয় অকৃত্রিম ধ্রুপদের শরীর ও মাত্রার সাধনা অসম্ভব; সারাজীবন যে ব্যক্তিগত তমসা ও আভার উচ্চারণ ও চিৎকার, কাব্যে তাও রোমান্টিকতারই বংশলক্ষণ।

অব্যবহিত অগ্রজ, এবং তিরিশের কবিরা যে তিনজন কবির ভিতরে প্রথম উন্মীলিত হয়েছিলেন তখন মনে হয়েছিল যাঁরা আশু বিধর্মের পারে প্রতিষ্ঠিত, তাঁদেরই অন্যতম মোহিতলাল মজুমদারের কিছু পরোক্ষ প্রভাব আছে কবির উপর—ক্ষীণ ও পরোক্ষ। শব্দব্যবহারে, বাক্যগঠনে, বুদ্ধিবাদে, দেহধর্মিতায়

ও কাব্য-দর্শনের স্বরূপের আরোপে কবির উপর মোহিতলালের প্রভাব—প্রভাব না বলে মিল বলাই উচিত—কিছু আছে। অবশ্য কবির বুদ্ধিবাদ, দেহধর্ম ও কাব্য-দর্শনের স্বরূপের আরোপ মোহিতলাল থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন; মোহিতলালের অর্থে তিনি কোনোদিন দেহবাদী ছিলেন না, গভীরতরভাবে তিনি ছিলেন আধ্যাত্মিক; হয়তো 'বৈনাশিক কালের' দুই কালো হাত থেকে সাময়িক উদ্ধার পাবার জন্য শান্তি ও মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন, দেহের আশ্রয়ে; মোহিতলালের দেহধর্মে আস্থা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়াজাত, আর কবিরে যেহেতু কাল বা স্মৃতি কি ঈশ্বর বা প্রেম কেউ ক্ষমা করে না, তাই দেহের সীমানা মেনে চলা, কিন্তু তাও তিনি কোনোদিন পারেননি; আরো লক্ষণীয় তিনি প্রায় কোনো সময়েই বর্তমানকালের ভোগবাসনার কথা বলেন না, যখনই তিনি দেহসম্ভোগের কথা বলেন তা স্মৃতির ভিতর দিয়ে রচিত এবং তাও অনুতাপের দুর্বার পাহারায়—মোহিতলালের মতো আদৌ বলীয়ান ও উদ্ধত নয়।

তিনি ছিলেন স্তেফান মালার্মের ভীষণ ভক্ত ও অনুরাগী; কিন্তু শুধু মালার্মে নন, তাঁর দুই স্বনামধন্য শিষ্য পোল ভালেরি এবং কবি-ঔপন্যাসিক মার্সেল প্রুস্ত্‌—এই তিন মহাজনকে মিশিয়ে যেন তিনি নিজেকে অটুটভাবে গড়ে তুলেছিলেন, এবং উপযুক্ত ত্রয়ীকে হ্যাঁ ও না এর তুলাদণ্ডে চড়িয়ে দিলে না-এর দিকের পাল্লাই যে বেশী ভারী হবে, তাও সন্দেহাতীত। ধ্রুপদগঠন-ফরাসী কবিতার প্রতি তাঁর ঝোঁক ও আকর্ষণ স্বাভাবিক বলেই মনে হয়। আর টমাস স্টর্নস্‌ এলিঅটের 'পোড়োজমি' তার বিশ্বগ্রাস ক্ষুধা নিয়ে সমকালীন পৃথিবীর বহু কবিকেই অধিগত করেছিল তার প্রভাবের কথা তো উল্লেখ না করলেও চলে। বুঝবার সুবিধার আশায় আমরা শুধু কোনো লেখকের সঙ্গে পূর্ববর্তী ও সমকালীন অন্যান্য লেখকদের ঐক্য ও অনৈক্য খুঁজে ফিরি। সুধীন্দ্রনাথ দেশ-বিদেশের কোন্ কোন্ কবির সঙ্গে কাব্যনির্মাণে ও কাব্য ভাবনায় যুক্ত, তা বললাম; কিন্তু এইসব কবির আপাত ও লুকানো প্রভাব ছাড়িয়ে যেখানে তাঁর মৌলিকতা প্রকাশ পেয়েছে, এবং সে রকম অংশই তাঁর কাব্যাধারে বেশী—সেখানেই তিনি স্বতন্ত্র, একাকী ও উত্তর সাধকের বিস্ময়স্থল।*

---

* 'সুধীন্দ্রনাথ: কালো সূর্যের নিচে বৃহৎসব' নামে দীর্ঘ প্রবন্ধের অংশ বিশেষ সংক্ষিপ্ত করেছেন আলোক সরকার ও নিরঞ্জন হালদার।

জ্যোতির্ময় দত্ত

বাংলা কবিতা ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

ক্ষীণকায় না হোক, এক নিস্তেজ সাহিত্য। গদ্যের তখনো সৃষ্টি হয়নি। একদিকে পয়ার চোদ্দ মাত্রার শেকলে বাঁধা, অন্যদিকে মাত্রাবৃত্তের গড়ন অনির্দিষ্ট। অনুবাদ? অনুবাদ নয়, সংস্কৃত সাহিত্যের বিশ্বচেতনা বাংলা ভাবানুবাদের মধ্যে প্রাদেশিক খণ্ডরূপ ধারণ করেছিল। আছে বটে প্রাত্যহিক জীবনের এক উজ্জ্বল মুকুর—কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল। কিন্তু হাজার বছরের সাহিত্যসৃষ্টির এই কি যথেষ্ট ফল? আর বৈষ্ণব কবিতা? ভবিষ্যৎ গৌরবের সেই প্রথম উদ্ভাস? সত্য বটে, বৈষ্ণব কবিগণ যতগুলি ভালো কবিতা লিখেছিলেন, রবীন্দ্রপূর্ব অর্ধ-সহস্র বছরে অন্যান্য বাঙালী কবিরা সমবেতভাবে ততগুলি উত্তম কবিতা রচনা করেননি। কিন্তু বৈষ্ণব কবিতার রীতি ও বিষয়ে বৈচিত্র্যের অভাব ছিল; এবং যেমন শুধুমাত্র সন্দেশ দিয়ে ভোজ হয় না, তেমনি শুধুমাত্র গীতিকবিতা এবং অতিরঞ্জিত জীবনচরিতের সমষ্টিকে সাবালক সাহিত্য বলা সম্ভব নয়।

এই ভাষায়, এই দরিদ্র বাংলাভাষায়, এক শতকের মধ্যে যে বিপ্লব সাধিত হল তার তুলনীয় ঘটনা বিশ্বসাহিত্যে বিরল। একটি বিপ্লব নয়, বিপ্লবের পর বিপ্লব, পরিবর্তনের তরঙ্গের পর তরঙ্গ বাংলা সাহিত্যের রূপ কয়েক দশকের মধ্যে একেবারে বদলে দিল। এই বিপ্লবী শতকের আদি কবি মধুসূদনকে আমরা বোদলেয়ারের সমকালীন বলে কল্পনা করতে পারি না; তাঁর সনেটে যে-মনের প্রকাশ, তা সারে বা ওয়াটের সমধর্মী। রবীন্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্যে যে-বিপুল পরিবর্তন এনেছিলেন তার অন্যতম ফল এই যে পরবর্তী কবিরা অনায়াসে বিশ শতকে প্রবেশ করলেন. আমাদের বিশ শতক আর য়ুরোপের বিশ শতকের মধ্যে কোনো কালগত ব্যবধান রইল না। জীবনানন্দ, অথবা বুদ্ধদেব বসু, অথবা বিষ্ণু দে, সকল অর্থেই ইয়েটস, কিংবা রিল্কে, কিংবা পোল ভালেরি বা এলুয়ারের সমসাময়িক। অর্থাৎ এই

একশো বছরে বাংলা কবিতা পাঁচশো বছরের পথ অতিক্রম করল, এবং এক-এক পুরুষের অভিজ্ঞতা এক-এক দশকের মধ্যে আত্মস্থ করতে হল বাঙালী কবিকে।

যে-সকল বিপ্লবের দ্বারা আমাদের সাহিত্যের এই রূপান্তর সাধিত হল তার একটির নায়ক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। আজও সেই বিপ্লবের প্রতিধ্বনি আমাদের সাহিত্যে অনুরণিত হচ্ছে। তাছাড়া, আরো কয়েকটি বিপ্লব একই সঙ্গে সংঘটিত হয়েছিল। এদের একটির সঙ্গে অন্যটি এমনভাবে জড়িত হ'য়ে গেছে, এবং এই যৌথ আন্দোলন চারিদিকে এমনই সাড়া তুলেছিল যে, আজও আমরা শুধু বিস্মিতই হতে পারি, বিশ্লেষণ করতে পারি না। অন্য ভাষায় যে-সকল পরিবর্তন পর-পর ঘটে, আমাদের ভাগ্যে তা সাধিত হয়েছিল একযোগে। এত দ্রুত এই সকল পরিবর্তন, এবং এমন বিচিত্র—এমনকী পরস্পরবিরোধী—এদের ফল যে আজকের পাঠক রবীন্দ্রোত্তর কবিদের মধ্যে কোনো সামান্য লক্ষণ আবিষ্কার করতে গিয়ে দিশেহারা হন। ("ক্লাসিসিস্ট" সুধীন্দ্রনাথ ও "মিস্টিক" জীবনানন্দ, "জনসমুদ্রের কবি" বিষ্ণু দে এবং "গজদন্তমিনারবাসী" বুদ্ধদেব বসু, আস্তিক অমিয় চক্রবর্তী ও সংশয়ী সমর সেন—আধুনিকতা-নামক একটিমাত্র বৃক্ষে যেন একই সঙ্গে সর্ব প্রকারের ও সর্ব ঋতুর ফল ফলেছিল।...)

সুধীন্দ্রনাথের দেবতুল্য রূপ আমি দেখেছি। সুধীন্দ্রনাথকে প্রথমবার দেখে —এত আপতিক বৈসাদৃশ্য সত্ত্বেও—বারে-বারে রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়েছিল। আমার এমন মনে হওয়ার একটাই কারণ ভাবতে পারি: যা-কিছু দৈব প্রভায় উজ্জ্বল, শক্তির অনায়াস লীলায় স্ফুরিত, অর্থাৎ যা-কিছুর মধ্যে আপোলোত্ব বা ইন্দ্রত্বের আভাস আছে—বাঙালীজাতির চিত্তে তার প্রতীক রবীন্দ্রনাথ। এবং সুধীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখে চোখে লাগতো আলোকের ঝলক, রোমরাজির উপর বয়ে যেতো স্বাস্থ্যের বাতাস, হৃদয়ে অনুভূত হত অক্লেশ প্রতিভার অনুকম্পন। রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও ছিলেন দৈবানুকূল্যে অভিষিক্ত; যদিও তাঁর কাব্যে তিনি তাঁর ইন্দ্রত্বকে পরিহার করেছিলেন। এবং, যদিও কোনো-কোনো বিরল মুহূর্তে অন্য কোনো দেবতার কালো ছায়া তাঁর মুখের উপর পতিত হতে দেখেছি, অধিকাংশ সময় আপোলোর স্বর্ণচ্ছটা তাঁকে ঘিরে থাকত। জীবনানন্দের যে-একটি ছবি আমি দেখেছি তা এক বিস্মিত এবং ধ্যানস্থ প্রেমিকের, যিনি এই জগৎরূপ নিষ্ঠুরা ও মোহিনী প্রেমিকার দিকে

অপলক নেত্রে তাকিয়ে আছেন। হাসি নয়, বিহ্বলতার আভাস তাঁর অধরে। আর, সুধীন্দ্রনাথের প্রত্যেকটি ছবিতে ধরা পড়েছে এক ইন্দ্রকান্ত সুখী পুরুষ; অধিকাংশ ছবিতেই তাঁর মুখ হাস্যময়, যেন তাঁর উচ্চ আসন থেকে মানুষ নামক এক মর্কটশাবকের দেবানুকারী ক্রীড়াকলাপ দেখে তিনি কৌতুক অনুভব করছেন।

অবশ্য, মানুষ কিংবা পৃথিবী সম্পর্কে তাঁর গোপন ধারণা যা-ই হোক, অপর মানুষের পক্ষে তাঁর সঙ্গ ছিলো পরম প্রীতিকর। এমন অনেক সন্ধ্যা গেছে—তার অনুরূপ কোনো সন্ধ্যা আর আসবে না!—যখন তাঁর সঙ্গের জন্য অহিফেনসেবীর মতো অলঙ্ঘনীয় আকর্ষণ অনুভব করেছি। অন্তত প্রকাশ্যে, তিনি ছিলেন সদাহাস্যময়, এবং তাঁর হাসি এমন সংক্রামক ছিল যে কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের মতো মলিন মুখও ঐ সূর্যের পরিমণ্ডলে প্রবেশ করা মাত্র উদ্ভাসিত হয়ে উঠত। রবীন্দ্রনাথের একমাত্র দৌহিত্রের মৃত্যুসংবাদ যে-দিন পৌছলো, সে-রাত্রে তিনি এক পূর্ব-নিমন্ত্রিত বিদেশী অতিথিকে ভোজ-সভায় সঙ্গদান করেন, কিন্তু মুহূর্তের জন্যেও ভদ্রলোকটি সন্দেহ করতে পারেননি যে সেদিনই রবীন্দ্রনাথের জীবনে কী নিদারুণ বিপর্যয় ঘটে গেছে। সুধীন্দ্রনাথের উচ্চতান সুখকেও, সুখ নয়, সুসভ্য সংযম বলে মনে করি। তিনি যদিও জানতেন যে প্রলয় আসন্ন তবুও ডুবন্ত জাহাজের অধ্যক্ষের মতো স্থিরচিত্তে প্রত্যেকটি আচার-অনুষ্ঠান পালন করাটাকে, উচিত না হোক সুরুচি বলে মনে করতেন। বধ্য-ভূমিতে সংযম ও বীরত্বের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় না, বরং একমাত্র ফাঁসির মঞ্চেই দণ্ডিত ব্যক্তির হাসি অর্থপূর্ণ। কবি সুধীন্দ্রনাথ তো বটেই; মানুষ সুধীন্দ্রনাথও যে-ব্রহ্মাণ্ডকে অর্থহীন ভেবেছিলেন, তার সঙ্গে কোনো সন্ধিস্থাপন তিনি করেননি। তাঁর সামাজিকতা, তাঁর অবিদ্রোহ, তা-ই এই হৃদয়-ও-নিয়মহীন জগতের বিরুদ্ধে প্রচণ্ডতম বিদ্রোহ—প্রচণ্ডতম, কারণ এর মধ্যে মৃত ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা নেই, ক্রন্দন নেই, আছে শুধু এই জগতের অসীমতার সঙ্গে প্রতিযোগিতার উপযোগী সাহস। প্রকৃতির কোথাও কোনো ভব্যতার বালাই নেই; বাঘ যখন হরিণীকে আক্রমণ করে তখন সে বলে না আমায় আপনি ক্ষমা করুন; শুধু মানুষ কৃত্রিম আচারের মধ্যে দিয়ে স্বভাবকে বুদ্ধির বশবর্তী করেছে। জগতে সব-কিছু আসলে বিশৃঙ্খল, বন্ধন আছে, কিন্তু অর্থ নেই, বরফ গলে জল হয় কারো সুচিন্তিত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে বলে নয়, বরফ তার প্রকৃতি অতিক্রম করতে পারে না বলে। প্রথানির্দিষ্ট, সুশৃঙ্খল,

ছন্দোবদ্ধ, মিলযুক্ত, অবিদ্রোহী কবিতা জগতের বিপরীত, কেননা কবিতার নিয়ম উদ্দেশ্যময়। জগতের সব-কিছুই যে আকস্মিক, যেন তারই প্রত্যুত্তরে স্থধীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের সব-কিছুই স্থচিন্তিতভাবে নির্মাণ করেছিলেন।

তাঁর গঠনপ্রতিভা সামান্য এক ভোজসভাকেও এক শিল্পকর্মে পরিণত করতে পারত; যেমন সকারণে পংক্তির পর পংক্তি কবিতায় গ্রথিত করতেন তেমনি স্থকৌশলে তিনি অতিথিদের পংক্তিনির্দেশ করে দিতেন; বিরোধী চিত্রকল্পের মতো ভিন্ন চরিত্রের ব্যক্তিদের একত্র করতেন; এবং কথার সলতে নিবন্ত হলে তাকে উস্কে দিতেন—কবিতায় এক বিস্ময়কর মিলের মতো—এমন কোনো অপ্রত্যাশিত কথা বলে, উপস্থিত ব্যক্তিরা সমস্বরে যার প্রতিবাদ না-করে পারতেন না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাকে যথাযথ বলে স্বীকার করতে বাধ্য হতেন। এবং যে-সাহিত্যিক বিপ্লবের তিনি নায়কত্ব করেন তার গতিও একান্তভাবে তাঁরই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। "পরিচয়"-সম্পাদক স্থধীন্দ্রনাথ বিভিন্নসূত্রে প্রাপ্ত রচনাকে শুধু একত্র করতেন না, আসলে তিনিই ছিলেন রচয়িতা, অপর লেখকেরা এই স্থপতির হাতে মাল-মশলা জুগিয়ে দিয়েছিলেন মাত্র। "কল্লোল" ও "পরিচয়"-এর মধ্যে যে-বৈষম্য বুদ্ধদেব বসু লক্ষ্য করেছেন তারই প্রতিধ্বনি করে বলা যায় "কল্লোল" ছিল তার লেখকবর্গের বাহনমাত্র, আর "পরিচয়" তার লেখকগোষ্ঠীকে সৃষ্টি করেছিল। "কল্লোলে"র সম্পাদক ছিলেন আত্মবিলোপকারী সাহিত্যসেবী, এমন এক সিঁড়ি, যাকে পিষ্ট না-ক'রে উপরে ওঠা যায় না—অপরিহার্য, কিন্তু তার নিজস্ব কোনো মূল্য নেই। অন্য দিকে "পরিচয়ে"র সম্পাদক ছিলেন বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ অহংবাদী, এবং তিনি সাহিত্যসেবী শুধু নন, তিনি সাহিত্যিক, তিনি স্রষ্টা।...

শুধু বাংলাদেশ নয়, সারা চরাচরের প্রতি স্থধীন্দ্রনাথের বিরাগ আসলে তাঁর প্রেমেরই নিদর্শন। মালার্মের এই শিষ্য, অযোগ্য বলে নয়, মহৎ বলেই গুরুমার্গে গমন করেননি। যে-সুস্পষ্ট কয়েকটি লক্ষণ মালার্মে-পন্থীদের চিহ্নিত করে, তার একটিও স্থধীন্দ্রনাথের কাব্যে উপস্থিত নেই। স্থধীন্দ্রনাথ এই জগৎ সম্পর্কেই কবিতা লিখেছিলেন, কবিতা সম্পর্কে নয়। আর আত্মসর্বস্ব ধ্বনিমাত্র নয় তাঁর কবিতার ভাষা, তা জগতের প্রতি আমাদের মনোযোগ-সঞ্চালনকারী প্রতীক। ভাবের যথাযথ প্রকাশকেই তিনি শব্দচয়নের উদ্দেশ্য বলে ভেবেছিলেন; অর্থরূপ সূক্ষ্ম লক্ষ্যকে তাঁর শব্দগুলি নিপুণভাবে ভেদ করে, তাকে কুয়াশায় পরিণত করে না। এবং—হায়, মালার্মে-ভক্তগণকে নিরাশ

করতে আমি বাধ্য হচ্ছি—সুধীন্দ্রনাথের কবিতার প্রধান, প্রায় একমাত্র বিষয় প্রেম; না, ঈডিপসীয়া গূঢ়ৈষণা নয়, প্রেমের মুখোশধারী কোনো কৃষ্ণ অপদেবতার তত্ত্ব নয়, তাঁর কবিতার বিষয় হচ্ছে সেই অতিপরিচিত অনুভূতি, যার নাম প্রেম!

ঐ বাক্যের শেষে বিস্ময়বোধক চিহ্ন দেখে কোনো পাঠক অবাক হবেন না নিশ্চয়। আধুনিক কবিগণ মদনভস্মে জগতের সব-কিছু ঢেকে দিয়েছেন; মানব-মানবীর কল্লোলিত ও জীবনদাত্রী প্রেমস্রোতকে শব্দ ও তত্ত্বের কচুরি-পানার তলায় আত্মগোপন করতে বাধ্য করেছেন; আর এক দিকে মানুষকে যেমন তাঁরা প্রেমের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন, তেমনি অন্য দিকে সকল প্রাণীর মধ্যে আবিষ্কার করেছেন যৌন-গূঢ়ৈষণা, সকল অচেতন বস্তুর মধ্যে যোনিমূলের প্রতীক। ইয়েটস ছাড়া অন্য কোনো আধুনিক য়ুরোপীয়ের কবিতায় প্রেম নেই, আছে কাম—তাও প্রচ্ছন্নভাবে, ছদ্মবেশে। আর সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রেমের প্রকাশ অলজ্জ; এমনকী এও বলা যায় যে তাঁর কবিতায় প্রেমিকেরা আবেগকে "প্রকাশ" করে না, তীব্র আবেগে দীর্ণ হয়ে তারা আর্তনাদ করে ওঠে। "যার ওদিকে অনিশ্চয় আর এদিকে বেদনাপ্রভব কল্পনা"—সেই প্রতীক ব্যবহার করা তো দূরের কথা, এমনকী চিত্রকল্প ও মধুর ধ্বনিকে মনে হয় তাদের আবেগের নগ্নতাকে গোপন করার অলংকার, তাদের মনের কথা ঢাকার আচ্ছাদন। প্রেমের চরম মুহূর্তে কোনো কাব্যকৌশলই সহ্য হয় না তাদের, তখন তারা দ্ব্যর্থতাহীন, খাঁটি, দেশজ বাংলায়—অর্থাৎ তাদের প্রাণের ভাষায়—চীৎকার ক'রে ওঠে, ছিঁড়ে ফেলে চিত্রকল্পের ভারি পর্দা, পাঠকের সামনে উন্মোচিত করে তাদের নগ্ন ও স্পন্দমান আরক্তিম হৃদয়।

মালার্মে-কল্পিত কামগ্রস্ত ফনের সঙ্গে "সংবর্তে"র প্রেমিকের প্রতিতুলনা করার প্রলোভন সামলাতে পারছি না। দুজনেই নিজেদের প্রেমাস্পদের বিরহে কাতর, দিবাস্বপ্ন ছাড়া তাদের গত্যন্তর নেই। "সংবর্তে"র নায়িকা "রেখারিক্ত ভাবচ্ছবি, অবচ্ছিন্ন স্মৃতির উদ্ভাসে লাক্ষণিক"; আর মালার্মের অপ্সরীদ্বয় তো স্বপ্নমাত্র। মালার্মের কবিতার অন্তিম পংক্তিতে অপ্সরীরা মৃত্যুর অনিশ্চিত ও অন্ধকার প্রদেশে প্রত্যাবর্তন করে:

যমলা, বিদায়!
আমাকে সে-ছায়া ডাকে তোমাদের লুপ্তি যে-দ্বিধায়॥

"সংবর্তে"র শেষে একই "প্রতর্ক"ময় রাত্রি নেমে আসে ; মুহূর্তের জন্য সন্দেহ জাগে যে এই নারীও কেবল দিবাস্বপ্ন কিনা :

> মৃত স্পেন, ম্রিয়মাণ চীন,
> কবন্ধ ফরাসীদেশ। সে এখনো বেঁচে আছে কিনা
> তা সুদ্ধ জানি না।

কিন্তু পলকে সে-সন্দেহ ভেঙে যায়। হায়! ফনের অপ্সরীগণের মতো এই নারীও কেন কল্পনার পুতুলমাত্র হলেন না, প্রশ্ন করেন আর্ত পাঠক। যিনি এমন চিহ্নহীনভাবে দূরে সরে গেছেন তিনি শুধু ছায়া হলেই বরং ভাল ছিল। কিন্তু যাঁর স্মৃতিমাত্র দিয়ে এই সংসারী ও সংশয়ী, বিদগ্ধ এবং উত্তরচল্লিশ প্রেমিক জগৎব্যাপী সংবর্তের মধ্যে স্নিগ্ধ এক নিশ্চিন্ততার দ্বীপ রচনা করে নিতে পারেন, সেই নারী এককালে শুধু জীবিত ছিলেন না, জীবনদাত্রীও ছিলেন। তাঁর ঐ জ্বলন্ত বাস্তবতাই শেষ পংক্তিকে পরিণত করে আর্তনাদে।

আর মালার্মের অপ্সরীদের জন্ম ফনের কল্পনায়। তাদের লুপ্তির পরেও অবশিষ্ট থাকে সেই কল্পনা, এবং যেমন প্রাণহীনতাও প্রাণের কারণ হয়, গলিত শব ভক্ষণ করে পুষ্ট হয় কীট, তেমনি শিল্পজ অপ্সরীদের শূন্য স্থানে গজিয়ে ওঠে নতুন প্রেতেরা, ঐ কুমারীদ্বয়ের অভাবে ফনের উদ্ভাবনশক্তি ক্ষয়িত না-হয়ে বরং বৃদ্ধি পায়। হঠাৎ আমরা আবিষ্কার করি যে এই চতুর দেবপশু—প্রেম নয়, প্রেম-প্রেম খেলা খেলছিলেন। কোনো নারী যা পারেন না, এই শিল্পীটি তা-ই পারেন—তাঁর চিদাকাশে একটু বাতাস উঠলেই রং বদলায়, আর তাঁর কামনা তৎক্ষণাৎ নতুন রঙের আরেকটি পুতুল গড়ে। এই অর্থহীন জগৎ অকারণে সারাক্ষণ নানা তরঙ্গ বিকিরণ করছে; ভাগ্যিস এই শিল্পীপ্রবর ছিলেন, তাই এই তরঙ্গগুলি কাজে লাগল, অর্থ পেল, কারণ জড়ত্বের এই সব শিহরণকে সংযুক্ত ও রূপান্তরিত করে শিল্পীশ্রেষ্ঠ ফন কখনো অপ্সরী, কখনো দেবী ভেনাসকে নিজের ইচ্ছা চরিতার্থ করার জন্য রচনা করে নেন। ঐ ফন স্বাধীন চৈতন্যের প্রতীক; "সংবর্তে"র নায়ক আর্ত হৃদয়ের। মালার্মে সারা জগৎকে কবিতার উপকরণ বলে ধারণা করেছেন; এই নিঃস্বতা থেকে যেহেতু কাব্যের মুক্তো তুলে আনা যায় সেহেতু এই শূন্যতা তাঁর পক্ষে বিজয়গর্বের কারণ, কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের কাছে বিলাপের। সুধীন্দ্রনাথ স্বয়ং মালার্মের সঙ্গে তার সম্পর্ক নির্দেশ করে গেছেন দুই

অবিস্মরণীয় পংক্তিতে। তার স্বপ্নভঙ্গের পর ফন পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলে,

প্রতর্ক, প্রাক্তন রাত্রি, সাঙ্গপ্রায়।

আর সুধীন্দ্রনাথের এক নায়ক, কোনো নারী সুধাভাণ্ড হাতে নিয়ে আর আসবে না জেনে, বিলাপ করে,

সমাপ্ত সংরক্ত রাত্রি ; চূর্ণমুষ্টি ধূলিধূসরিত ॥

মালার্মের কবিতা বর্ণহীন, সুধীন্দ্রনাথের কবিতা হার্দ্য ও সংরক্ত। ঈশ্বর নেই? জগৎ স্বপ্নমাত্র? এ-কথাটা মালার্মের বুদ্ধিকে সুড়সুড়ি দেয় বটে কিন্তু তাঁকে চিন্তাকুল করে না। আর, সুধীন্দ্রনাথকে তা শুধু ভাবিতই করে না, বিদীর্ণ করে। তিনি নিজেকে জগতের ভাগ্যের সঙ্গে এমনভাবে যুক্ত করেছিলেন যে হিটলার ও স্টালিনকে উপেক্ষা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি, পারেননি তিনি অন্যায়ের জয়যাত্রায় অবিচলিত থাকতে ; এবং তাই এক নারীর স্মৃতি, সামান্য এক মানবকন্যার স্মৃতি দিয়ে ঈশ্বরের শূন্যস্থান পূরণের চেষ্টা করেছিলেন।

এ-কালের ভদ্রমহিলাকে প্রথম কবিতায় স্থান দিলেন আধুনিক কবিরা ; কবিতার মানচিত্রে বিদিশার পাশে নাটোরের নাম ক্ষোদিত হল। কিন্তু বনলতা সেন নামেই শুধু আধুনিক, আসলে তিনি সর্বকালের। সকল নদীর অন্তে তাঁর অধিষ্ঠান ; সকল মানুষ নাবিকের মতো সমুদ্রে-সমুদ্রে ভ্রমণ করে শেষে তাঁর চোখের নীড়ে প্রত্যাবর্তন করে। জীবনানন্দের নায়িকারা দেহকে উষ্ণ করে না, বরং উষ্ণ হৃদয়কে শীতল করে। জীবনানন্দ যদিও "অশ্লীলতা"র জন্য কর্মচ্যুত হন, তাঁর কবিতার কোথাও এমনকী, চুম্বন শব্দটি ব্যবহার করেননি। এই শব্দটিকে পরিহার করার কারণ নিশ্চয় তাঁর ব্রাহ্মিকতা নয়, তার কারণ তাঁর মানসকন্যাদের চরিত্র। কল্পনার ছায়াদের তো আর চুম্বন কিংবা আলিঙ্গন করা যায় না!

সুধীন্দ্রনাথের কাব্যকন্যারা মানুষ ; মানুষ শুধু নন, তাঁরা এ-যুগের ; এবং এ-যুগের শুধু নন, তাঁরা এক বিশেষ সামাজিক পরিবেশে লালিত। তাঁদের জিবের ডগায়—হয়তো—বিদেশী ভাষা, হাতের আগায়—নিশ্চয়ই—টেলিফোন। এঁরা কেউ-কেউ বিদেশিনী; এবং সকলেই বহুপ্রণয়ে অভিজ্ঞ। কেউই কিশোরী বা অপাপবিদ্ধা নন। এবং নায়কেরা বিগতযৌবন, গলকম্বলের ভাঁজে হারিয়ে গেছে তাঁদের চিবুক, ক্ষীণকেশ ও সুবেশ। অর্থাৎ, সেই সব

উপেক্ষিত মানুষ যাঁরা প্রেম নামক নাটকে শুধু আশীর্বাদ ও সম্প্রদানের জন্য প্রবেশ করতেন, তাঁরা রক্তমাংসের দেহ নিয়ে সুধীন্দ্র-কাব্যের মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। ··

উপরন্তু লক্ষণীয় যে এই মালার্মে-ভক্ত বাঙালী কবির রচনায় ব্যক্তির ও গোষ্ঠীর জীবন এক হয়ে গেছে। ঐতিহাসিক তথ্যে এতদূর পর্যন্ত সমৃদ্ধ কবিতা অন্য কোনো বাঙালী কবি রচনা করেননি। সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় মানুষের অন্তর্জীবন ও সামাজিক অভিজ্ঞতা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হয়ে গেছে; এবং তিনি রাষ্ট্রিক দুর্যোগকে ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডিতে পরিণত করতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁর কোনো কোনো কবিতার প্রধান উপকরণ এমন ঘটনা যা সারা বিশ্বকে স্পর্শ করে, কিন্তু যাতে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার তীব্রতা নেই, যা খবরের কাগজের অধিকাংশটা জুড়ে থাকে কিন্তু আমাদের স্বপ্নে স্থান পায় না, যার সম্পর্কে বক্তৃতা দেওয়া চলে কিন্তু কখনো যা নিয়ে আমরা ফিসফিস করে কথা বলি না। সুধীন্দ্রনাথ নীরস রাজনীতিকে কোমল ও সুপাচ্য করলেন তাকে প্রেমের রসে জারিত করে; তাঁর কবিতারূপ উপাদেয় ব্যঞ্জনে রাজনৈতিক উপাদান আছে প্রচুর, কিন্তু তার লবণ বা লাবণ্য নারী ভিন্ন আর-কিছু নয়। তিনি আবিষ্কার করলেন রাজনীতিতে নীতি নেই, ইতিহাসে নেই নিয়ম, হৃদয় নেই জগতের; এই শূন্যতার মধ্যে নারীই পুরুষের একমাত্র সহচর। হতে পারে যে প্রেম অমর নয় এবং বিচ্ছেদ অনিবার্য। কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য অন্তত নারী ও পুরুষ পরস্পরের শূন্য হৃদয় ভরে দিতে পারে।

> তোমার প্রাণের পরতে পরতে
> যে-অনাম তৃষা গুমরি কাঁদে
> অনুকম্পায়ী জীববীণা মোর
> ঝংকৃত আজ সে অনুনাদে।···
> নিত্য জ্বালার কলুষকালিমা
> জানি; তাই হিয়া দরদে কাঁদে॥ (প্রতিদান)

> হেন কালে
> অমৃতের প্রতিশ্রুতি নিয়ে,
> তুমি এলে অনাহূত প্রেতস্তব্ধ গৃহে,
> চির মোহ-ময়
> তুচ্ছ প্রয়োজনহীন বাক্য-কতিপয়

চুম্বনের অবকাশে মৃদু স্বরে উচ্চারণ করি
দিলে ভরি
নিরিক্ত অন্তরে মোর আকাঙ্ক্ষার সহজ বিস্ময়।...
তব ক্ষুদ্র প্রেমের উপরে
নিশ্চিন্তে নির্ভর পেল অনশ্বর মুহূর্তের তরে
তুলাসাম্যহৃত বিশ্ব প্রলয়ের পথে॥ (পুনর্জন্ম)

সুধীন্দ্রনাথের আদি ও শেষ কবিতার মধ্যে যে-বিপুল ব্যবধান লক্ষিত হয় নারী তার অন্যতম কারণ। আদি রচনাগুলিতে নারীই মঞ্চের সবটুকু জুড়ে থাকে; এবং শেষ রচনায় তার স্মৃতিটুকু পর্যন্ত মুছে গেছে, জগতের অর্থহীনতাই কবিতার একমাত্র বিষয়। প্রথম দিকের কবিতার কৌশল কাঁচা, ভাবনাও হয়তো নতুন নয়। শেষ কবিতাগুলি রচনাগুণে শ্রেষ্ঠ এবং ভাবনাগুণে গভীর। কিন্তু প্রথম দিকের কবিতাগুলিতে যদি আর্দ্রতার আধিক্য থাকে, তবু সরসতার গুণে তাদের জয় অবধারিত। প্রথম দিকের রচনা মধুর ও ঘন; আর তাঁর শেষ রচনায় তাঁর জগৎ নাস্তিময় ও কঠিন। "সংবর্ত"-কবিতায় এই দুই বিপরীত পরস্পারের অভাব পূরণ করেছে, টিনের খাপে কুলপির মতো জগতের শূন্য আধার ভরে দিয়েছে নারী। এই কবিতাটি সকল অর্থে-ই তাই সুধীন্দ্র-কাব্যমালার মধ্যমণি।

জীবনানন্দের কবিতায় সর্বকালের নারী নিতান্ত আধুনিক বেশবাস ধারণ করে, আর সুধীন্দ্রনাথ এমনকী আধুনিক বিদেশিনীকে কালিদাসের অলংকারে সাজান। এছাড়া হয়তো অন্য উপায় ছিল না এই দুই কবির। মুখ যার শ্রাবস্তীর কারুকার্য আর চুল যার বিদিশার নিশা তাকে বিশ্বাস্য করে তোলা কঠিন, নিকট করা প্রায় অসম্ভব। এই অসম্ভবকে জীবনানন্দ সম্ভব করলেন কোলরিজের মতো কল্পনাকে বাস্তবের মুখোশ পরিয়ে, চিরকালকে বর্তমানের কৌটোয় ভরে ফেলে। বিদিশার পর নাটোর? অন্তত্র এই দুটি নামের সংযোগ, নাটোরবাসীদের কাছে ছাড়া, কার না মনে হবে হাস্যকর? অথচ এই দুঃসাহসী কবি বিদিশাকে নাটোরের সঙ্গে এমনভাবে পরিণীত করেছেন যে এখন আমরা স্থির করতে পারি না এই সংযোগের ফলে কে অধিক সম্মানিত হল। এটুকু স্পষ্ট যে বর্তমান নাটোরের সঙ্গে ঘর্ষণে মৃত বিদিশা আমাদের কল্পনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, হয়ে উঠেছে ঘনিষ্ঠ, এবং সেহেতু মর্মস্পর্শী। জীবনানন্দের অধিকাংশ শব্দ দেশজ ও যুক্তাক্ষরবিরল, অর্থাৎ তা আমাদের

হৃদয়নামক অশিক্ষিত ও সরল শিশুটির আপন ভাষা। আর তাঁর চিত্রকল্প কোনো স্বেদমলগন্ধময় প্রাণীর মতোই জীবন্ত। যাকে প্রতীক বলে জানলে আমরা নিরুৎসাহ বোধ করতাম, এখন তার শরীরের দ্বারা আকৃষ্টই শুধু হই না, তার মধ্যে অন্য কিছুর দ্যুতি দেখে পুলকিত হই।

আর অতি ঘনিষ্ঠকে কাব্যের উপযোগী দূরত্ব দান করলেন সুধীন্দ্রনাথ। সংস্কৃত ভাষা থেকে অসংখ্য শব্দ এবং নানা দেশের সাহিত্য থেকে অনেক কৌশল তিনি শিক্ষা করলেন; স্বেদগন্ধ প্রসাধনের তলায় চাপা পড়ল। কবিতা থেকে যে-রস রোমান্টিকেরা বিতাড়িত করেছিলেন, সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় আবার তা সঞ্চালিত হল—ব্যঙ্গ ও বক্রোক্তিকে তিনি গম্ভীরতম কবিতায় স্থান দিলেন। কাব্যে বহুকাল বিষাদ ছিল সম্রাট, এতদিন পরে সভাসদ কবি দরবারে ফিরে এল। কালিদাস ও ফরাসী আঠারো শতকের কবিদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা শুধু মৌখিক ছিল না, তাঁদের তথ্যাশ্রয়িতা ও পৌরুষ সুধীন্দ্রনাথের কবিতায়ও বর্তমান। রোমান্টিক কবিদের নায়িকাদের আকার কৃশ ও বর্ণ পাণ্ডুর; তাঁদের শরীর কুয়াশার মতো আবছায়া। সুধীন্দ্রনাথ কালিদাসের যক্ষের মতো পরিণতবয়স্ক, এবং ইন্দ্রিয়নির্ভর। তিনি প্রসাধন ও অলংকার ভালোবাসেন, কিন্তু তিনি কোনো প্রথম প্রেমবিগলিত বালক নন, তাঁর প্রেমিকা স্বেদ ও রোমরাজিহীন কোনো স্বপ্নপ্রায় নারী নন। "শাশ্বতী" কবিতার কোনো-কোনো পংক্তিতে সংস্কৃত সাহিত্যে যে-প্রতিধ্বনি শোনা যায় তা প্রক্ষিপ্ত নয়, তা তাঁর কবিতার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

কিন্তু তেমনি অবিচ্ছেদ্য তাঁর রোমান্টিক পংক্তিগুলি। "শাশ্বতী"র শেষ স্তবকে প্রকৃতি মানবহৃদয়ের সংবেদী মুকুর হয়ে উঠল; বিরহী রামচন্দ্র যেমন অরণ্যের সর্বত্র সীতার চিহ্ন দেখেছিলেন, এই প্রেমিকও তেমনি তাঁর প্রিয়ার ছায়া দেখেন প্রকৃতির মধ্যে। কিন্তু প্রথম স্তবকে প্রকৃতি কবির মনে বিচ্ছেদের বোধই জাগিয়ে তোলে; বাইরের জগতে কোনো অভাব নেই, প্রকৃতির মিলনোৎসবে সকলেরই প্রবেশাধিকার আছে কিন্তু কবির নেই, কারণ শুধু তাঁরই হৃদয় সেই অন্য উৎসবের স্মৃতি ভুলতে পারেনি। প্রকৃতির দ্বারা পরিবেষ্টিত কবি জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন; এই ধারণাটি কালিদাসে নেই, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বর্তমান, আর, ইংরেজি কাব্যে ডিউক অর্সিনোর আগে কেউ এই কবিতার অর্থে "উদাস" ছিল না।

"মিলনোৎসবে সেও তো পড়েনি বাকি ;
নবান্নে তার আসন রয়েছে পাতা ;
পশ্চাতে চায় আমারই উদাস আঁখি
একবেণী হিয়া ছাড়ে না মলিন কাঁথা।"

আধুনিক কবির যে-ছবি বোদলেয়ার, মালার্মে ও ভালেরি রচনা করেছেন সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার কিছুই মেলে না। ভগ্নপক্ষ আলবাট্রস ও ইকারুস, তুষারহ্রদে বন্দী শ্বেত হংস এবং স্বচ্ছায়াবন্দী নার্সিস্সস—এরা সকলেই নিষ্ক্রিয়তার ও চৈতন্যের ভারে পঙ্গু আত্মার প্রতীক। আর সুধীন্দ্রনাথ সাধনার ও সিদ্ধির প্রতিভূ, তিনি প্রতীক বীরত্বের। তাঁর কাছে প্রতীত হয়েছিল যে এই কোটি-কোটি কণিকায় বিভক্ত জগৎ এবং সেই জগতের কয়েকটি ভগ্নাংশ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানের দ্বারা ভগ্ন মানুষের হৃদয়কে আর কর্মের দ্বারা জোড়া দেওয়া যাবে না। রাজনীতির অশুভ ফল লক্ষ্য করে পিতার সমাজহিতৈষণাকে তাঁর নিজের পক্ষে বরণীয় বলে মনে হল না। ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রের মতো তাই অস্ত্র ত্যাগ করে তিনি আশ্রয় নিলেন মন্ত্রের, জয় করলেন কাব্যদেবীকে, রচনা করলেন রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিকতার অন্তবর্তী এক স্বর্গ। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ত্রিলোকজয়ী—বিজ্ঞান, দর্শন ও শিল্পকলার পরিণয় ঘটানো। যদি এ থেকে প্রথম দুটিকে আহুতি দিতে তিনি রাজি হতেন, তাহলে তিনি মালার্মে-ভক্তদের কাছে অধিকতর আধুনিক বলে গণ্য হতে পারতেন বটে, কিন্তু তাতে তাঁর বীরত্বের হানি হত। তিনি যে আধুনিক কবিতার গুণগ্রাহী হয়েও সর্বলক্ষণসম্পন্ন "আধুনিক কবি" হননি, সে কি তাঁর বিফলতা? এটা সেই সব অজীর্ণরোগীর প্রশ্ন, যাঁরা ভোজসভায় শুধু দধির অন্বেষণ করেন, যাঁদের "আধুনিক কবিতা" নামক অতিশোধিত খাদ্য ছাড়া অন্য কিছু হজম না। হাইনে কেন গেওর্গে হলেন না? গ্যেটে কেন ডুইনো এলিজিস লেখেননি? পূর্বেকার কবিতার কেন আকার বৃহৎ, কেন বুদ্ধির আঁশ থেকে বিশুদ্ধ কবিতাকে নিংড়ে নেওয়া হয়নি? কেন মহাভারত অত বিশাল ও বিচিত্র? কেন তা মালার্মের কবিতার মতো ছোট্ট একশিশি বর্ণহীন বিশুদ্ধ কোহল কিংবা উনগারেত্তির কবিতার মতো খাদ্যপ্রাণে ভরা তিলবৎ একটি বটিকা নয়? এ-সকল প্রশ্ন—যদিও তাঁর প্রবন্ধ পড়লে মনে হয় খুব জরুরী—তাঁর কবিতা পড়ার সুখে কখন যেন হারিয়ে যায়।

অরুণ ভট্টাচার্য

সুধীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তা

অন্যান্য সুকুমার শিল্প ও সাহিত্যের মধ্যে মিলনের ক্ষেত্র যতই প্রশস্ত হোক না কেন, প্রভেদের সীমানাও যে অস্পষ্ট নয়, একথা এক লহমাতেই ধরা পড়ে। প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যের ক্ষেত্র এত ব্যাপ্ত ও বৈচিত্র্যময়, এত বিচিত্র রঙের সমারোহে উজ্জ্বল যে সে-তুলনায় শিল্পচর্চা, এমন কি সঙ্গীতও একদেশদর্শী বলে মনে হয়। সমগ্র জীবনের সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা-ই সাহিত্যের আধার, অন্যপক্ষে শিল্পচর্চায় তা সীমায়িত, সঙ্গীতে সীমাবদ্ধ। অবশ্য অনুভূতির গাঢ়তা ও রসাস্বাদনের তীব্রতা সকল শিল্পসৃষ্টিতে হয়তো বা সমভাবেই উপলব্ধ হতে পারে, কিন্তু সাহিত্যে যে অপরিসীম বিস্তার ও দুরপনেয় পরিধি তা অন্যত্র দুর্লভ। সাহিত্য আলোচনায় যে-পরিমাণ কূটতর্ক উপস্থাপিত হয়েছে এবং সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে কবিতার দুরূহতা সাধারণভাবে পাঠককে যে-পরিমাণে বিভ্রান্ত করেছে সে কারণেই কাব্য আলোচনায় আলংকারিক ও সমালোচকদের উৎসাহ অপরিসীম। 'সহিত'—অর্থে সাহিত্য, এমন বর্ণনায় সাহিত্যের সামাজিক ও লৌকিক দিকটির কথাই সর্বাগ্রে মনে আসে। প্রকৃতপক্ষে এই বর্ণনা এত আদিম এবং সর্বজনীন যে এ নিয়ে বিরোধের আশঙ্কা নেই, কেননা, সাহিত্য যা সকল দেশে প্রাথমিক অবস্থায় কাব্যধর্মী ছিল তা মূলত সামাজিক বা যূথবদ্ধ মানুষের আচরণ বা সার্বিক অভিজ্ঞতার কাহিনী। মধ্যযুগ পর্যন্ত এই দৃষ্টান্ত প্রায় সকল দেশেই নজরে পড়ে। ফরাসী বিপ্লবোত্তর পৃথিবীতে মানুষ যূথবদ্ধতা থেকে মুক্ত হয়ে ব্যক্তি-আশ্রয়ী বিবেকের কাছে আসল জবাব-দিহি করতে শুরু করল। তখন থেকে সাহিত্য অন্তত, ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও দুরূহ জিজ্ঞাসার জটাজালে আচ্ছন্ন হতে থাকল। যদিও বিদেশে সে-সব ঢেউ তরঙ্গিত হতে থাকল অষ্টাদশ শতকের মধ্যপাদ থেকে, বাংলা সাহিত্যে সে সকল চিন্তার ঢেউ উনবিংশ শতাব্দীর আগে জাগেনি এবং যে সকল মুষ্টিমেয় সাহিত্যিক পাশ্চাত্ত্য শিল্প ও সাহিত্য-রীতি, ধর্ম ও বিজ্ঞান-চিন্তাকে এদেশের মাটির সঙ্গে

যোগসূত্রে স্থাপন করিয়ে দেবার প্রয়াস করেছেন তাদের আদিতে যদি থাকেন মাইকেল এবং বঙ্কিমচন্দ্র, বয়ঃকনিষ্ঠদের মধ্যে রয়েছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

এ ধরনের প্রচেষ্টা প্রভূত পরিশ্রমসাপেক্ষ এবং উল্লিখিত তিনজন সাহিত্যিক সময়ের অপব্যবহার করেছেন এমন দুর্নাম তাঁদের শত্রুরাও দেবেন না। যদিও এঁদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথের রচনা, তাঁর চিন্তার তুলনায় যৎসামান্য, তথাপি সাহিত্যবিষয়ক কয়েকটি মূল ভাবনাকে তিনি বাঙালী পাঠকের কাছে উপস্থিত করেছেন। শুধুমাত্র ইংরাজী ফরাসী ও জার্মান সাহিত্যের পরিচয় করিয়ে দেবার দায়িত্বই যে নিয়েছিলেন, তাই নয়, সে সকল সাহিত্যের বিচার ও অন্যদিকে ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্য কীভাবে গতিশীল সাহিত্যকে নতুন সৃষ্টির প্রেরণা যোগায়, সে সম্বন্ধেও 'পরিচয়' পত্রিকার মারফৎ তৎকালীন সুধীসমাজকে অবহিত করতে সচেষ্ট ছিলেন। সুধীন্দ্রনাথের নিজের রচনা সামান্য হলেও বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁর কর্তব্য তিনি সুষ্ঠুভাবেই পালন করে গিয়েছেন, তাতে বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের পরিধি খানিকটা প্রসার লাভ করেছে।

যেহেতু বাংলা ভাষার সৃষ্টির আদিতে সংস্কৃত এবং কাব্যতত্ত্ব বিচারে এখনো আমাদের সংস্কৃত আলংকারিকদের কাছে হাত পাততে হয়, সেহেতু সংস্কৃত সাহিত্যের ভিৎ পাকাপোক্ত না হলে তার পক্ষে এ দুরূহ বিষয়ে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। অন্যদিকে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ যোগাযোগ না থাকলে সে দেশের সাহিত্যের মূল সুরটি চিনে নেওয়া সহজসাধ্য হয় না। সুধীন্দ্রনাথ নিজের পরিশ্রমে সংস্কৃত চর্চায় প্রাগ্রসর হয়েছিলেন, প্রধান য়ুরোপীয় ভাষাগুলিকে আয়ত্ত করেছিলেন। ফলত, অন্যান্য কবিদের মত তাঁকে পরের মুখে ঝাল খেতে হয়নি। এবং আমার তো মনে হয় বিদেশী কাব্য সাহিত্য সম্পর্কে সে কারণেই তাঁর মতামত, মতবিরোধের সম্ভাবনা সত্ত্বেও, যতটা গ্রাহ্য, এমনটি আর কারও নয়।

দ্বিতীয়ত, বর্তমানের কিছু কিছু সমালোচনার ধারায় এমনটি দেখা গেছে যে প্রচলিত ধারণায় কোন মহৎ সাহিত্যসৃষ্টিকে অথবা কবিবিশেষকে নস্যাৎ করে দেবার উগ্র প্রচেষ্টাই আধুনিক মানসিকতার লক্ষণ বলে স্বীকৃত হচ্ছে। কয়েক পাতার নিবন্ধে হাজার বছরের সংস্কৃত কাব্যে শুধুমাত্র কামের চিত্রই কেউ কেউ লক্ষ্য করেছেন, প্রেমের চিত্র দেখেননি; এমন মন্তব্যও সে কারণেই সম্ভব হয়ে থাকে। অর্থাৎ কোন দেশের বর্তমান সাহিত্যের মূল যে বহু দূর-বিস্তৃত একথা ভুললে শুধু নিজের সর্বনাশ ডেকে আনা হয় না, সেকালের সাহিত্য

বিচারে নানা ধাঁধাধন্দের অবতারণা হয়। এমন এক সময় ছিল, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সে-সকল উগ্র আধুনিকরা মাতামাতি করেছিলেন এই বলে যে তিনি যথেষ্ট পরিমাণে আধুনিক নন। সুখের কথা, দীর্ঘ কুড়ি বছর বাদে আজ তাঁরা উঠতে বসতে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করছেন। প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যের ধারায় যে বিরাট একটা ঐতিহ্যবোধ কাজ করে, একথা তাঁরা সেদিন ভুলেছিলেন বলেই সে সময়ে তাঁদের চিন্তার এই বিপত্তি দেখা দিয়েছিল। সুধীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তাতে এমনতর কূপমণ্ডুকতা আশ্রয় লাভ করেনি। সাহিত্য যে বিশাল বনস্পতির মত, এবং লতায় পাতায়, মূলে কাণ্ডে, শাখায় প্রশাখায় একটি বিশিষ্ট চরিত্র ও প্রকৃতিতে একটি নিদারুণ অস্তিত্ব সে-কথা সাহিত্যচিন্তার প্রথম পাঠ। বৃহৎ সমাজ মানসের চিন্তা-ভাবনা, তার ঐতিহ্য সাহিত্যের গতি প্রকৃতির নির্দেশক এবং সুধীন্দ্রনাথ যখন বলেন, 'ব্যক্তিগত মনীষায় জাতীয় মানস ফুটিয়ে তোলাই কবিজীবনের চরম সার্থকতা' তখন সন্দেহ থাকে না যে এই কবি কাব্য সাহিত্যকে, এলিয়টের মতই, বিরাট ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত ও সমন্বয়ধর্মী করতে প্রয়াস পেয়েছেন। এই বিবেক এমন একটি অভিজ্ঞতা থেকে জন্মলাভ করে যাকে ক্ল্যাসিকাল অ্যাখ্যা দেওয়া অসঙ্গত নয়। এক একটি দেশের জাতীয় চরিত্র ও ঐতিহ্য সেই সকল দেশের মহৎ কাব্য সাহিত্যে আশ্রয় লাভ করে। এবং বারংবার ক্ল্যাসিকাল সাহিত্য অধ্যয়নে নিজের মানসিকতায় এমন একটি ঋজু চরিত্র সৃষ্টি হয়ে যায়, যার ফলে সাহিত্য-চিন্তাকে জীবনজিজ্ঞাসার অন্যতম গূঢ় এবং জটিল প্রশ্ন বলে মনে হয়। আমার বিবেচনায়, এমনতর কবিই সাহিত্যের মৌল প্রশ্ন উত্থাপনের অধিকারী। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বর্তমান কালে সেই স্বল্প দু-একজন কবির অন্যতম যাঁর মধ্যে উপরিউক্ত দুটি গুণ সমপরিমাণে উপস্থিত।

অনেকে বলেছেন সাহিত্য দর্পণের মত, তাতে জাতির স্পষ্ট চেহারা ফুটে ওঠে; অনেকে বলেছেন সাহিত্য-সৃষ্টি শিল্পীর কাছে পলায়ন, এখানে সে বাঁচতে পারে। বলা বাহুল্য এ দুটি আপাত পরস্পরবিরোধী উক্তিতে জাতি ও ব্যক্তি সমপরিমাণ মর্যাদা লাভ করেছে। অর্থাৎ যে দিকেই বিচার করি না কেন, সাহিত্য একদিকে ব্যক্তিগত প্রয়াস হলেও অবশেষে জাতীয় চরিত্রের প্রতিফলন হিসেবেই এমত মর্যাদা পায় এবং প্রকৃত প্রস্তাবে এই দুটি উক্তিতে যে সাযুজ্য আছে তা একথাই প্রমাণ করে যে একটি সংজ্ঞা অপরটির বিরোধী নয়, পরিপূরক। সমালোচকের অন্যতম প্রধান প্রয়োজন হবে, এমনতর সংজ্ঞাগুলি

থেকে অন্বয়ী সূত্র সন্ধান। এ পরিশ্রমের জন্ত যে মানসিকতা ও প্রস্তুতিপর্ব প্রয়োজন, পূর্বেই বলেছি সুধীন্দ্রনাথে তা বর্তমান ছিল। 'কুলায়, ও কালপুরুষ'-এর অন্তর্গত প্রবন্ধগুলি পাঠে তার চিন্তার জগৎ যে কত দূর বিস্তৃত ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। সাহিত্যের প্রাথমিক বিচারে, অন্তত সুধীন্দ্রনাথ যে বিচারকে একান্ত করে ভাবতেন, এ বিস্তৃতি কতটা কার্যকর সে বিষয়ে সন্দেহ থাকলেও, দর্শন, বিজ্ঞান বা আধুনিক জীববিত্যার নানা পরীক্ষার সঙ্গে এর যে আত্মিক সম্পর্ক নাড়ির যোগের মতই, সে কথা তিনি নিজেই স্বীকার করে গেছেন। অবশ্য কাব্য বিচারের ক্ষেত্র পৃথক; কিন্তু সে পার্থক্যও অবশেষে বৃহত্তর পটভূমিতে এসে অভেদ হয়েছে। কেননা কাব্য আদিতে থাকলেও এমন কিছু ভুঁইফোড় নয়, এবং মনুষ্য সমাজের চলমান প্রগতির সঙ্গে তার সম্পর্ক যখন ভাশুর ভাদ্রবউ-এর নয়, তখন কাব্য বিচারকে বৃহত্তর সমস্যাবলী থেকে পৃথক করে রাখবার প্রচেষ্টা নিরর্থক।

সমালোচনার নানাবিধ দায় এবং দায়িত্ব রয়েছে। দায় নিজের কাছে এবং দায়িত্ব একাধারে লেখকবর্গ ও পাঠকবর্গের কাছে। সে কারণে কোন কবি যখন সাহিত্য চিন্তায় মনোনিবেশ করেন, তখন তাকে নিশ্চিন্ত সড়ক বেছে নিতে হয়, যেখানে অন্তত সহজভাবে পাঠকসমাজের সম্মুখে তিনি বৈজ্ঞানিকের মতো বিশ্লেষণী চিন্তা নিয়ে দাঁড়াতে পারবেন (কবিতা রচনায় কবির এ দায়িত্ব ততটা নেই—কেননা আনন্দ ও সৌন্দর্য চর্চায় তার যে অপরিসীম স্বাধীনতা রয়েছে তাতে পাঠক বিব্রত বা বিমূঢ় হলেও কবি অন্তত নিরুপায়)। সুধীন্দ্রনাথ সমালোচক হবার জন্য কলম ধরেননি, যেমন ধরেছিলেন মোহিতলাল মজুমদার। কাব্য রচনার বিভিন্ন সময়ে যে সকল অনুভবে তিনি ক্লিষ্ট হয়েছেন, যেমন যেমন চিন্তায় কাব্য শরীরে নতুন নতুন অর্থ আরোপ করতে পেরেছেন, এমত বিশ্লেষণে কবিতার অপার সম্ভাবনার চিত্র দেখতে পেরেছেন, তখনই তাঁকে বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে লিপিবদ্ধ করেছেন। এ-বিষয়ে তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যতটা দূরত্ব, জীবনানন্দের সঙ্গে নৈকট্য ততটাই। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-চিন্তায় আড়ষ্ট না থাকলেও তিনি বিজ্ঞানীর বিশ্লেষণকে সমালোচনার প্রধান আশ্রয় করেননি, প্রতিভা বিশ্লেষণে কাব্যসাহিত্যের উৎস, আবেগ ও অনুভবকে বেশী মূল্য দিয়েছেন। অন্যপক্ষে জীবনানন্দ যখন কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তখন কাব্যগত অনুভবকেই একান্ত মনে করেছেন, সমালোচক হবার দুর্বার বাসনা কখনোই দেখা যায়নি। যুক্তির আশ্রয়েই নিরাভরণ গদ্য তাঁর

সমালোচনার ভাষা। চিন্তা তাঁর স্থির নির্ণেয়। এবং আরো মিল এইখানে, বহু অমিল সত্ত্বেও, যে উভয়েই সাহিত্যের কয়েকটি প্রথম প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। জীবনানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথ বাংলা কাব্যের দুই বিপরীত মেরুতে থাকলেও, মৌলিক কতকগুলি বিষয়ে তাঁরা সমন্বয়ী চিন্তার প্রতিভূ ছিলেন।

সুধীন্দ্রনাথের সমালোচনা সাহিত্যে দেখা যাবে যে সাধারণ ভাবে বিশ্লেষণী রীতিতে তিনি আস্থাবান ছিলেন। দর্শন এবং বিজ্ঞানের আকর্ষণ তাঁর জীবনে সক্রিয় থাকবার ফলে যুক্তিবাদকে সকল বিচারের মূল সূত্র মনে করতেন। আবেগ মানবজীবনের আবশ্যকীয় অঙ্গ হলেও তাকে যথোচিত শাসন করাই মনুষ্যধর্ম—এমন চিন্তায় যিনি দিনযাপন করেছেন তাঁর পক্ষে সমালোচনার আড়ালে নিছক রসসৃষ্টি করা সম্ভব ছিল না। সে কারণে তাঁর সাহিত্য চিন্তাকে তিনি স্পষ্টতই বিবিধ জ্ঞানের প্রেক্ষিতে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনজিজ্ঞাসার অংশ বলে ধরে নিয়েছেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি একাধারে দুটি কাজ করেছেন। প্রথমত, সাহিত্যের মূল্যবিচার, দ্বিতীয়ত, কাব্যের উৎসমূল নির্ণয়। তার সমসাময়িক অনেক বাঙালী সাহিত্যিকের সম্পর্কে যেমন তিনি অকপট ছিলেন তেমনি রবীন্দ্র আলোচনাতেও তিনি অক্লান্ত ছিলেন। অন্যপক্ষে, কবিতা সৃষ্টির অনুকূল কারণগুলি, তার ভাষা ও ব্যঞ্জনা ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে তিনি গভীর মনোনিবেশ করেছিলেন। যে সকল স্থানে য়ুরোপীয় সাহিত্যের বিচারে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করেছেন, সেখানেও সাহিত্যের কতকগুলি মূল নীতিকে আশ্রয় করে ক্রমশঃ পূর্ণাবয়ব বিশ্লেষণে অগ্রসর হয়েছেন।

সুধীন্দ্রনাথের নিজস্ব কাব্যগ্রন্থে প্রথম সংস্করণগুলিতে কোন ভূমিকা ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে অর্থাৎ বিগত দশ পনেরো বৎসরে তাঁর যে সকল নূতন বই প্রকাশিত হয়েছে অথবা পুরোনো বইয়ের নতুন সংস্করণ হয়েছে তাতে তাঁর স্বরচিত মুখবন্ধ সংযোজিত হয়। এর কারণ খুব স্বাভাবিক। তিনি এ যাবৎ-কাল শুধু কাব্যচর্চাই করেননি, কবিতা রচনা সম্পর্কে বহু চিন্তাভাবনা করেছেন। গোড়ায় তাঁর যে সকল প্রবন্ধ বা পুস্তক সমালোচনা আমরা দেখতে পাই, 'পরিচয়' পত্রে নিয়মিত যা বেরুত, সেগুলি অবজেকটিভ রচনা, অন্যদিকে নিজের রচনা সম্পর্কে যখন তিনি চিন্তা ভাবনা করতে বসলেন, তখনকার সাব-জেকটিভ রচনায় শুধু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই থাকল না, কবিতা রচনার মূল সূত্র নিয়ে তিনি চিন্তাগ্রস্ত হলেন। অনুপ্রেরণা, বিশ্বাস, অভিজ্ঞতা বা ভাবনা, আনন্দ বা বেদনা এমনতর অনুভবের কথা তিনি নূতন করে কাব্য বিচারে আনলেন।

কাব্যের রীতি প্রকৃতি সম্পর্কে বিশদ করে না হোক্, কবির চরিত্রে যে সকল মৌলিক উপাদান কাব্য রচনার সহায়ক হতে পারে সে সম্পর্কে তিনি নানারূপ প্রশ্ন উত্থাপন করলেন। অনেক স্থানে প্রচলিত কাব্যবোধ বা বিশ্বাসের মূলে আঘাত করলেন, কোথাও প্রাচীন সাহিত্যচিন্তারই পুনরুক্তি করলেন, কখনও বা পাশ্চাত্ত্য কবির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে কাব্য চর্চা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন সম্পর্কে, শব্দ ও ভাষা বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার সূত্রপাত করলেন অর্থাৎ সুধীন্দ্রনাথ যেমন সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে জীবনের নানা অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছেন, সমালোচকের আসনে বসেও তেমনি, নানাদেশের সাহিত্য থেকে তাঁর চিন্তার জগৎকে সমৃদ্ধ করেছেন, কোন রকম কূপমণ্ডুকতাকে কখনও অযথা প্রশ্রয় দেননি। সে কারণে তাঁর চিন্তা শুধু যে মার্জিতরুচি শুভবুদ্ধির পরিচায়ক হয়েছে তাই নয়, বর্তমান শতকে বৈশ্বিক পটভূমিতে সর্বজনীন সাহিত্যের ভূমিকা হিসেবে তাঁর আলোচ্য রচনাবলী পাঠে আমরা উপকৃত। সুধীন্দ্রনাথের পক্ষপাত, পাশ্চাত্য কবি ও সমালোচকদের মধ্যে মালার্মে ও ক্রোচের প্রতি,— একথা কারও অজানা নয়। 'মালার্মে প্রবর্তিত কাব্যাদর্শই আমার অম্বিষ্ট, আমিও মানি যে কবিতার মুখ্য উপাদান শব্দ'; এবং 'সংবর্ত' গ্রন্থের কবিতাগুলি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে নিজেই বলেছেন, 'উপস্থিত রচনাসমূহ শব্দ প্রয়োগের পরীক্ষা-রূপেই বিবেচ্য। ছন্দে শৈথিল্যের প্রশ্রয় না দিয়ে লঘু গুরু, দেশী বিদেশী, এমন কি পারিভাষিক শব্দও আদরণীয় কি না, সে অনুসন্ধানও হয়তো কোন কোন কবিতায় রয়েছে; এবং শব্দ ও ছন্দ উভয়ই যেহেতু পরজীবী, তাই বর্তমান শব্দবিন্যাস ও ছন্দ ব্যবহারের ভূমিকা লেখকের ভাবনাবেদনা যার বহিরাশ্রয় আবার ইদানীন্তন ঘটনাঘটন।' 'সংবর্তে'র কবিতাগুলিতে সুধীন্দ্রনাথ যে পরীক্ষার কথা বলেছেন, বস্তুত সেটা তাঁর পক্ষে কিছু নূতন নয়। 'তন্বী' কাব্যগ্রন্থ বাদ দিলে 'অর্কেস্ট্রা' থেকেই ধরা যেতে পারে যে, শব্দের অন্তর্নিহিত ছন্দ ও ব্যঞ্জনার দিকে তাঁর লক্ষ্য অপরিসীম, প্রযত্ন অনুকরণীয় এবং চিন্তায় যেমন পরিচ্ছন্ন, ভাষার সুষ্ঠু ব্যবহারেও তেমন তিনি অক্লান্ত কর্মী। এবং শুধুমাত্র সঠিক শব্দ প্রয়োগের জন্যই যিনি এতটা পরিশ্রমী, তিনি যে অযথা ভাবাবেগকে বরদাস্ত করবেন না অথবা চিন্তায় জড়তার অপক্ষপাতী সে কথাও সহজে অনুমেয়। 'সংবর্ত' কবিতাটি ধরা যাক, ধূর্জটিপ্রসাদ যে কবিতাটিকে ওঁর অন্যতম বিশিষ্ট কবিতা বলে মনে করেছেন,—প্রথম কয় পঙ্‌ক্তিকে সুধীন্দ্রনাথের পরীক্ষা মুখ্যতঃ গদ্য পদ্যের প্রভেদ ঘোচানাকে কেন্দ্র করেই।

অবশ্য এই প্রভেদ ঘোচানোর সঙ্গে ওয়ার্ডস্বার্থ-এর কাব্যতত্ত্বের কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। ওয়ার্ডস্বার্থ যেখানে মনে করতেন কবিতার ভাষাকে সহজ করে আনতে হবে, কেননা আসলে গদ্য ও পদ্যে কোন মৌল পার্থক্য নেই, মানুষের হৃদয়াবেগকে প্রকাশ করাই যেখানে উভয় রীতির আসল প্রশ্ন : There is no essential difference between the language of poetry and the language of prose. অন্যপক্ষে সুধীন্দ্রনাথ যেহেতু কবিতার ক্ষেত্রেও আবেগের মতই যুক্তিকে আশ্রয় করেছেন, বরং বলা যায় তাঁর চিন্তায় আবেগ ও যুক্তি পরস্পর প্রতিপক্ষ নয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই তিনি কাব্যকে গদ্যের ঋজুতায়, যুক্তির সারল্যে দৃঢ়ভঙ্গিম ও বলিষ্ঠ রেখায় স্থপতির মত কারুকার্যে মণ্ডিত করেছেন।

এখনও বৃষ্টির দিনে মনে পড়ে তাকে।
প্রাদেশিক শ্যামলিমা সেই পাংশু, সাধারণ্যে ঢাকে,
অমনই সে আসে,
রেখারিক্ত ভাবচ্ছবি, অবচ্ছিন্ন স্মৃতির উদ্ভাসে
লাক্ষণিক,—নেত্রসার, কপোল প্রধান
প্রাক্‌প্রচ্ছদ নটী যেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘোচে ব্যবধান
দৃশ্য ও দ্রষ্টার মধ্যে : ভুলে যাই
উত্তরচল্লিশ আমি ;

উপরের উদ্ধৃতি থেকে কি মনে হবে সুধীন্দ্রনাথ কাব্য সাহিত্য সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করতেন তাঁর কবিতায় তা সঠিক চিত্রিত হয়নি? অথবা অনেকে যে ভাবেন সুধীন্দ্রনাথের কবিতা আবেগবর্জিত সে কথাও কি ঠিক? প্রথম পঙ্‌ক্তিটির মতো সুন্দর গীতিকাব্য যা মূলত আবেগ-নির্ভর, বাংলা কাব্যে কি যত্রতত্র মেলে? এবং পয়ারে সুগঠিত হলেও, কবিতা কী করে বিশুদ্ধ গদ্য ছন্দের সঙ্গে মিলেছে—হ্রস্ব দীর্ঘ চরণে একটা তরঙ্গের উত্থান পতনের শব্দ যেন মনে মনে শোনা যাচ্ছে। এখানে লক্ষ্যণীয় মাত্র দুটি জায়গায় তিনি ক্রিয়াপদকে এগিয়ে দিয়েছেন, তা ছাড়া টানা সাজালে নিছক গদ্য ছাড়া একে কি বলব? এবং সুধীন্দ্রনাথের কবিতাকে তাঁর সাহিত্যচিন্তারই প্রতিফলন মনে করলে, এ রকম অজস্র পঙ্‌ক্তি উদ্ধার করে দেখানো যেতে পারে যেখানে বস্তুত আবেগকে বর্জন করতে চাননি, বরং বাংলাদেশের কবিতায় সাধারণভাবে অত্যন্ত ঢিলেঢালা ক্রিয়াপদ ব্যবহারকে, শব্দ চয়নের অসংযমকে বরদাস্ত করেননি। তিনি প্রত্যাশা

করেছেন, কবির মতো পাঠকও পরিশ্রমী হবেন, কাব্যের মুখ্য উপাদান যদি শব্দ হয়, তবে প্রতিটি শব্দের যথাযথ অর্থ আবিষ্কার করতে তাঁকেও যত্নবান হতে হবে। শব্দের ধাতুগত মূল অর্থ ব্যতিরেকে, কবির কাছে তার আরও বিভিন্ন অর্থ আছে এবং নানারকম অলংকারে ভূষিত হয়ে তার ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য সম্পাদিত হয় বলেই কবিতায় আমরা একদিকে রসের ঘনীভূত ভাবকে পেয়ে থাকি, অন্যদিকে বিস্ময় ও রহস্যময়তার সন্ধান লাভ করি। একটি শব্দ অন্য শব্দের সহযোগে হয়তো অন্য এক অচিন্ত্যপূর্ব ভাবের দুয়ার উন্মুক্ত করে দিতে পারে। এ সকলই সম্ভব এবং যে কবি এ বিষয়ে যথেষ্ট ভাবনা চিন্তা করছেন (সুধীন্দ্রনাথ একে ভাবনা বেদনা আখ্যা দিয়েছেন) তিনি সার্থক না হোন, সক্রিয় হতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথ যে অর্থে আধুনিকসাহিত্যকে একই সঙ্গে কালধর্ম ও যুগধর্মের অব্যাহত গতিতে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চেয়েছেন, সে অর্থে সুধীন্দ্রনাথও আধুনিক। 'আমার লেখায় আধুনিক যুগের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট' এমন স্বীকারোক্তি তাঁর কাছে অপ্রত্যাশিত নয়; যদিও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি সুধীন্দ্রনাথের নিদারুণ পক্ষপাত ছিল, শব্দচয়নে তিনি অনবরতই তার দ্বারস্থ হয়েছেন, তথাপি তিনি মনে করতেন, ভাষা চলে তার নিজস্ব স্বকীয় গতিতে ও স্বধর্মের অনুবর্তী হয়ে। সাধুভাষার সঙ্গে চলিত-ভাষার মিশ্রণ তিনি নিজেই বহু স্থানে ঘটিয়েছেন, এমন কী লঘুগুরু শব্দ ব্যবহারকে ক্ষেত্র বিশেষে, দোষ বলে মানতে তিনি রাজী থাকেননি। এমন উদাহরণ 'কুলায় ও কালপুরুষ' গ্রন্থ থেকে দেখানো যেতে পারে। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ যে দুটি প্রধান গুণকে প্রত্যেক কবির মুখ্য সম্পদ মনে করতেন তা হল অভিজ্ঞতা ও অনুশীলন। বস্তুতঃ কবির ক্ষেত্রে নয়, সাহিত্য কর্মেই যিনি নিযুক্ত থাকবেন, তাঁকে প্রথমত এই দুটি কর্তব্য স্মরণ রাখতে হবে। কবির কাছেও যেমন, ঔপন্যাসিকের ক্ষেত্রেও সমপরিমাণ এ দুটি মৌল প্রয়োজনকে স্বীকার করে নিতে হবে। অভিজ্ঞতা বস্তুত স্মৃতিচারণ ছাড়া আর কি? এবং সে সকল স্মৃতিতেই কবিতা বা উপন্যাসের জন্মরহস্য প্রকট থাকে যা মানসচিন্তার অদ্বৈত। অনুশীলনের কথা কেই বা অস্বীকার করেছেন। তবু সুধীন্দ্রনাথ যে সে-কথার পর জোর দিয়েছেন, তার একটি প্রধান কারণ বাংলাদেশের অনেক প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক মনে করেন, অভিজ্ঞতাই প্রকৃত সাহিত্য। সমকালীন সাহিত্যে এমন নজীর দুষ্প্রাপ্য নয়। বাংলাদেশের সমাজচিত্র যাঁর হুবহু জানা আছে, অথবা গাছপালা পশুপাখির সহস্রাধিক নাম

যাঁর কণ্ঠস্থ, জেলেদের ঘরে চাষীর সঙ্গে যিনি নৌকো করে দুরন্ত নদী পাড়ি দিয়েছেন অথবা পাটকলে মজুরদের সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন, তিনিই সাহিত্যচর্চার অধিকারী। সে কারণেই বাংলাদেশের অনেক প্রথিতযশা সাহিত্যিকের অনেক সময়েই এমন রচনা বেরোয়, যা আর যাই হোক্, তাঁদের ব্যক্তিগত সুনাম বাংলা সাহিত্যের মর্যাদা বৃদ্ধি করে না। সে কারণেই সুধীন্দ্রনাথ বিশেষ করে বলেছেন অনুশীলনের কথা। অসংযত কথোপকথন, বর্ণনাবাহুল্য, চরিত্রচিত্রণে বা ঘটনা-সংস্থাপনে অতি নাটকীয় সংঘাত, শব্দ ব্যবহারে নিদারুণ শৈথিল্য (যার ভূরি ভূরি উদাহরণ অনেক প্রতিষ্ঠিত কবি ঔপন্যাসিকের রচনা থেকে উদ্ধার করা যেতে পারে) ইত্যাদিতে বহু শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তির সম্মান অবলুপ্ত। এই পরিপ্রেক্ষিতেই বিশেষ করে সুধীন্দ্রনাথ সৃষ্টির ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের এত মূল্য দিয়েছেন।

সুধীন্দ্রনাথের আরো একটি মন্তব্য বিশেষ স্মরণীয়। কাব্যের উৎপত্তি বিষয়ে তিনি বলেছেন: "ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আর কাব্যগত অভিজ্ঞতা এক নয়, প্রথম যেখানেই সারা, সেখানেই দ্বিতীয়ের শুরু",—অর্থাৎ নিছক অভিজ্ঞতাই শেষ নয়, লেখকের পক্ষে। অভিজ্ঞতা নামক বস্তুটিও অবশেষে অভিজ্ঞায় রূপান্তরিত হলে, কাব্য রচনা সম্ভব, এবং রচনাপদ্ধতি কী রকম হবে, সে প্রসঙ্গে অবশেষে বলেছেন, "স্বরচিত নিয়মের অঙ্গীকারেই আমার মুক্তি।" মনে হয়, সুধীন্দ্রনাথ ইনটুইটিভ জ্ঞানে অবিশ্বাসী ছিলেন না। বরং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার স্তর পেরিয়েই ক্রমশঃ সেই অভিজ্ঞতায় পৌঁছুতে হয় এরূপ ধারণার বশবর্তী ছিলেন, অর্থাৎ শুধুমাত্র কলাকৌশলকে মূল্য দিলে এমন চিন্তা কখনও সম্ভব নয়। 'অর্কেস্ট্রা' বা তৎকালীন বহু রচনা পড়ে বুদ্ধদেব বসু বহুকাল পূর্বে সম্ভবত এমন মন্তব্য করেছিলেন, ভাষাকে তিনি ব্যবহার করেন, মিস্ত্রী যেমন করে ইট ব্যবহার করে ("কালের পুতুল", প্রথম সংস্করণ)। অবশ্য প্রত্যেক লেখক পরিশ্রমী ও নিষ্ঠাবান হবেন। 'কিন্তু শুধুমাত্র ঐটুকুতেই যে কাব্য রচনা কখনও উৎকর্ষ লাভ করে না, সে কথা কি সুধীন্দ্রনাথ জানতেন না? অথবা তাঁর উৎকৃষ্ট কবিতাগুলিও কি প্রমাণ করে যে তিনি শুধুমাত্র শব্দের পর শব্দ ব্যবহার করেছেন—ব্যঞ্জনার দিকে তাঁর এক তিলও আগ্রহ জন্মায় নি? বস্তুত সুধীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তায় এমন কথার কোন নজীর নেই যে কাব্যচর্চা শুধুমাত্র ইটের পর ইট সাজানো। এবং এক সময় সমাজতান্ত্রিকতার পথ ধরে

যাঁরা সাহিত্য বিচারে নেমেছিলেন, তাঁরাও এমন মন্তব্য করতে দ্বিধা করেন নি যে, "সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কোন কোন কবিতায় পলায়নী মনোবৃত্তি ধরা পড়ে" (আধুনিক বাংলা কবিতা-র ভূমিকা, আবু সয়ীদ আইয়ুব)। এই অপবাদে আখ্যা দিলে বিশ্বের সকল শ্রেষ্ঠ কবিকেই পলায়নী আখ্যা দিতে হয়, এমন কী রবীন্দ্রনাথকে, প্রথম যুদ্ধ-পূর্ব ইয়েট্স্-এর রচনাবলীকে, সম্ভবত এলিয়টকেও। কিসের থেকে পলায়ন? আমার থেকে, না জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে? আমার তো ধারণা, সুধীন্দ্রনাথ জীবনের সমালোচনাকেই কবিতা মনে করতেন। যদিচ ম্যাথ্যু আর্নল্ড-এর সংজ্ঞার চেয়ে তা কিছু পৃথক ছিল, "অন্তর্দিকে অভিজ্ঞতাকে সম্বল করেই যে কাব্যচর্চার প্রথম পাঠ", সে কথা তিনি বহুবার ব্যক্ত করেছেন একথা নিশ্চয়ই স্বীকার্য। সকল মানুষের জীবনের পরিধি ও পরিবেশ যেমন এক হতে পারে না, অভিজ্ঞতার কেন্দ্রও তেমনি বিভিন্ন হতে বাধ্য। সুধীন্দ্রনাথ ও সমর সেনের জীবনের অভিজ্ঞতা যদি একমুখী না হয় তবে দোষ দেব কাকে? না কি সেই প্রভেদের জন্য সাহিত্যে অসত্য ও ফাঁকি রয়ে গেছে? এ সকল বলার সূত্র এই কারণে যে সুধীন্দ্রনাথের কবিতা, এমন কী তাঁর সাহিত্যচিন্তাকে বাংলাদেশের কবি সমালোচকেরা কোন একদিন ভুল বুঝেছিলেন। হয়তো তিনি পাঠকদের কাছে যে সামান্যতম অভিনিবেশ দাবি করেছিলেন, তাও তিনি পাননি। আমার তো মনে হয়, সুধীন্দ্রনাথের কবিতা ও মননচিন্তাকে মনের মধ্যে গ্রহণ করবার পক্ষে তৎকালীন উগ্র আধুনিকতার পন্থা ও সমাজবাদী চিন্তায় প্রভাবান্বিত যুগ থেকে বর্তমান সময় অনেক শ্রেয়। আধুনিকতার মোহ এখন সম্পূর্ণ অবলুপ্ত। দীর্ঘ দিনের ব্যবধান আমাদের কাছে সেই সুযোগ এনে দিয়েছে যার ফলে তখনকার সাহিত্য কর্মকে আজ আমরা নানা বিষয়ে স্রোতের মধ্যে থেকেও সঠিক চিনে নিতে পারব।

একথা আর অবাস্তব নয় যে সুধীন্দ্রনাথ বরাবরই কাব্যে বা সাহিত্যে একটি মধ্যমান নির্ণয়ে সচেষ্ট ছিলেন। সমন্বয়ী চিন্তার প্রয়াসী ছিলেন এবং সর্বশেষে এমনতর চিন্তায় পৌঁছেছিলেন যে, "কাব্য উক্তি ও উপলব্ধির অদ্বৈত", এবং কবির একমাত্র কর্তব্য "ভাব ও ভাষার অবিচ্ছেদ্য সমীকরণ।" রিচার্ডস তাঁর প্রবন্ধাবলীতে যে সকল নিগূঢ় চিন্তার সূত্রগুলিকে একটি বৃহৎ পটভূমিতে এনে দাঁড় করিয়েছেন, সুধীন্দ্রনাথও সে সকল মৌলিক চিন্তাগুলিকে আশ্রয় করে কাব্য সমালোচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। এবং মনে হয় বর্তমান কালে

বিজ্ঞান-আশ্রিত দর্শন, জড়বাদ বা জীববাদ যে সাহিত্যের মৌলতত্ত্বের কারণ অনুসন্ধানে প্রাথমিক অঙ্গ হিসাবে স্বীকৃত হবে, সে কথা তিনি আজ থেকে দুই যুগ পূর্বেই যেমন বুঝেছিলেন তেমনি আর সম্প্রতি নজরে পড়েনি। অবশ্য রিচার্ডস্-এর মতে কাব্য শরীরকে নানারূপ অবজেকটিভ বিশ্লেষণ দ্বারা কাব্যের কাঠামোকে নগ্ন চিত্রে সমুপস্থিত করে অ্যানাটমিক্যাল পর্যবেক্ষণ সুধীন্দ্রনাথের মেজাজে সম্ভব ছিল না। কবি যেমন করে দার্শনিক ব্যুৎপত্তি বলে চিন্তা করতে পারেন, তিনি তাই করেছেন, দার্শনিক যেমন করে কবিতাকে জগৎ সংসারের অন্বয়ী সূত্র স্বরূপ মনে করতে পারেন তিনি পুনরায় সে কাজও করেছেন। "কাব্যের মুক্তি" নামক অসাধারণ প্রবন্ধটি ভালো করে পড়লে নিতান্ত নিরুদ্বিগ্ন পাঠকেরও চোখ এড়ায় না যে, সুধীন্দ্রনাথ প্রথমাবধি কাব্য সাহিত্যকে হাই সিরিয়াসনেস্-এর মুণ্ড থেকে বিচার বিশ্লেষণে প্রয়াসী। এরকম মেজাজ বস্তুত বাংলা সাহিত্যে মাইকেল বঙ্কিমচন্দ্র এবং পরবর্তীকালে একমাত্র মোহিতলাল মজুমদারের মধ্যে দেখা গিয়ে থাকবে। একটা বিশেষ সাহিত্যবোধকে প্রমাণ করবার জন্য যেখানে শেষোক্ত দুই সমালোচক পূর্ব-পরিকল্পিত ধারণার আশ্রয়ে সাহিত্যকে বিচার করতে চেয়েছেন, সুধীন্দ্রনাথ সেখানে কবিতার স্বধর্মের উপর আস্থা রেখেছেন এবং নৈর্ব্যক্তিক নির্মোহ দৃষ্টিতে, সত্য অনুসন্ধানের জন্যই অগ্রসর হয়েছেন। পরন্তু, সাহিত্য বিষয়ক নানারূপ মন্তব্য থাকলেও কখনও "চরম রায়" নির্দেশ করেন নি। সুধীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে যখন কাব্য জীবনের সমালোচনা বলেছি, তখন তাকে একটি বৃহৎ পটভূমিতে জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন রূপেই আমরা জেনেছি। "কবির বক্তব্য, তার প্রতিদিনের বিশৃঙ্খলা অভিজ্ঞতায় একটি পরম উপলব্ধির মাল্য রচনা। কবির উদ্দেশ্য তার চারপাশের অবচ্ছিন্ন জীবনের সঙ্গে প্রবহমান জীবনের সমীকরণ। কবির ব্রত তার স্বকীয় চৈতন্যের রসায়নে শুদ্ধ চৈতন্যের উদ্ভাবন।" স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, তিনি কবিকে এমন স্তরে নিয়ে গেছেন যেখানে তাঁর সাহিত্যকে আমরা ব্রহ্মাস্বাদসহোদর বলে কল্পনা করতে পারি। উপরিউক্ত প্রস্তাবকে যদি অকপট বলে মেনে নেওয়া যায়, তা হলে অন্তত সুধীন্দ্রনাথকে পলায়নী মনোবৃত্তির পোষক এমন অপবাদ দেওয়া কখনই সম্ভব নয়। কাব্যের নিগূঢ় আনন্দ আস্বাদনের কথা, সংস্কৃত আলংকারিকদের মতো করে না বললেও তাঁর বক্তব্যের ফলশ্রুতি যে এমন সিদ্ধান্তের পরিপূরক, তা সহজেই অনুমেয়। কেননা উক্ত প্রবন্ধেরই অন্যত্র তিনি যে অনির্বচনীয়তার কথা বলেছেন, বস্তুত ভারতীয়

চিন্তাধারা ও কাব্যের রসতত্ত্বের পূর্ণ সমর্থন তাতে মেলে। টেনিশন, রবীন্দ্রনাথ, এজ্রা পাউণ্ড, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ওয়ালাস, ষ্টিভেনস্-এর কয়েকটি অনবদ্য পঙ্‌ক্তি উদ্ধার করে তিনি দেখিয়েছেন যে, এর ভাবানুষঙ্গ অভিধানের সাহায্যে স্পষ্ট হয় না। কারণ এদের অনির্বচনীয়তার মূলে শব্দার্থ নেই, "আছে শব্দ অন্তঃশীল আবেশ, সমাবেশ ও ধ্বনি বৈচিত্র্য এবং ছন্দের শোভনতা। এই গুণসমষ্টির নাম রূপ; এবং রূপের প্রত্যেক অঙ্গ অপরিহার্য। রূপ আর প্রসঙ্গের পরিপূর্ণ সংগমে কাব্যের জন্ম।" প্রকৃতপক্ষে, এর পর কবিতা সম্পর্কে আমাদের কি জিজ্ঞাস্য থাকে? কবিতার ধর্ম সঠিক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি সবশেষে নন্দনতত্ত্বের দরজায় আশ্রয় নিয়েছেন এবং রূপের ব্যাখ্যাতা হিসেবে তিনি তেমন অভিজ্ঞতাকেও অগোচর রাখতে চান নি। 'সহিত'—অর্থে সাহিত্য এমত প্রস্তাবকে তিনি নিজের দৃষ্টির আলোকে নতুন মূল্যে শোভিত করেছেন এবং জীবন ও জগৎ সম্পর্কে নিটোল অভিজ্ঞতাকে অযথা ধূসরতার প্রলেপ না দিয়ে, বিজ্ঞান বা দর্শনের নিরঞ্জন সত্তায় ভাব ও রূপের অদ্বৈতে পৌঁছবার চেষ্টায় দিন রজনী অতিবাহিত করেছেন। বস্তুত সুধীন্দ্রনাথের কাব্য জিজ্ঞাসার যা কিছু বর্ণনা তা একাধারে যেমনই প্রাচীন ও ঐতিহ্যানুসারী, অন্যদিকে তেমনি নূতন ভাবরূপে সমৃদ্ধ। সে কারণে তাঁর সাহিত্য চিন্তায় এক নির্মল প্রতিভাসের সাক্ষাৎ মেলে, দেশ কাল গণ্ডির উর্ধ্বে বিশুদ্ধ শিল্পচর্চার প্রতীক হিসেবে যার স্থান চিরকাল স্বীকৃত হবে।

শামসুর রাহমান

বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত হৈ হৈ করে উপস্থিত হননি বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে, এসেই তিনি পাঠকসমাজের মন দখল করতে পারেন নি। এই কবির আবির্ভাবের মুহূর্তটি চিহ্নিত ছিল না তাঁর অন্যান্য সমকালীনের মতো ঝাঁঝালো রবীন্দ্রদ্রোহিতায়। কোনো বিপ্লবের নিশেন তিনি ওড়ান নি, উচ্চারণ করেননি কোনো বিদ্রোহের ভাষা ; মোট কথা, তাঁর আবির্ভাবের মধ্যে ছিল না কোনো চমক। অবশ্য এক হিশেবে তিনি নিঃসন্দেহে ছিলেন বিদ্রোহী ; বহুরূপী ভক্তিবাদে ভরপুর বাংলা কাব্যে তাঁর অবদান একজন সনাতন প্রথা-বিরোধী বিদ্রোহীরই স্বাক্ষর বলে বিবেচিত হবে। তিনি বাংলা কাব্যের আসরে এসেছিলেন সৌম্য, প্রায় নিঃশব্দ ভঙ্গীতে, রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে। সুধীন্দ্র-নাথ দত্তের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'তন্বী' পাঠ করলে অমনোযোগী পাঠকেরও বুঝতে দেরি হয় না যে, উক্ত গ্রন্থপ্রণেতা আর যাই হোন না কেন রবীন্দ্রনাথকে এড়িয়ে চলার পক্ষপাতী নন। এই কবি এমনি বিনয়ী যে, কবিজীবনের সূচনায় তিনি প্রাতিস্বিকতা জাহির করবার লোভ সংবরণ তো করলেনই, এমন কী বাগ্দেবীর আরাধনা করলেন কবিগুরুর অসীম বাগান থেকে পুষ্প চয়ন করে। কিন্তু তা বলে তিনি কবি সার্বভৌমের ভুবনভোলানো সুরে মজে নিজের স্বাতন্ত্র্য জলাঞ্জলি দেন নি। তাঁর স্বাতন্ত্র্য ছিল চারিত্র্য তেজের মতোই অন্তর্গত বিচ্ছুরণ এক, আরোপিত কিছু নয়। সুধীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'অর্কেস্ট্রা' প্রকাশিত হওয়ার পরে রসজ্ঞ পাঠক সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন একজন প্রকৃতই নতুন কবির উপস্থিতি, এই কবিতাবলীতে লক্ষ্য করলেন এমন কিছু লক্ষণ যা' এতদিন বাংলা কাব্যে অনুপস্থিত ছিল। কাব্য রসিকদের এটা বুঝতে বাকী রইলো না যে, এই কবির সুর ঐকতানে বিলীন হওয়ার নয়, বরং একক ঝংকারে প্রবল। অবশ্য তখনও সুধীন্দ্রনাথের কবিতার অনুরাগী পাঠকের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না, এমন কী বুদ্ধদেব বসুর মতো বিদগ্ধ, অনুকম্পায়ী

সমালোচকও তখনকার সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর বক্তব্যে ভালো লাগার মোহন উত্তাপ তেমন সঞ্চার করতে পারেননি। সেই আলোচনায় প্রচুর প্রশংসার কথা ছিল সত্য, সত্য সুধীন্দ্রনাথের কোনো কোনো বৈশিষ্ট্যের কথা বুদ্ধদেব বেশ জোরালো কণ্ঠেই উচ্চারণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর পক্ষপাত যে জীবনানন্দ দাশের প্রতিই বেশি, একথা সেকালে বুঝতে কারুও ভুল হয়নি। পরবর্তীকালে, আমরা জানি, তিনি সুধীন্দ্রনাথের কবিতার অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছিলেন অধিকতর অনুরাগ নিয়ে, পেয়েছিলেন তাঁর সখ্যতা। শেষের দিকে এই দুই কবির মধ্যে একটা নিবিড় ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল।

'পরিচয়ের' আড্ডার আদি পর্বে বুদ্ধদেব বসু উপস্থিত থাকতেন মাঝে মাঝে; তাঁর ভালো লেগেছিলো গোষ্ঠীপতি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'চোখে পড়ার মতো সজ্জা-বিলাস···সুস্বন কণ্ঠ ও সুস্পষ্ট বাচনভঙ্গি। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের এই আকর্ষণ সত্ত্বেও তিনি সরে এসেছিলেন 'পরিচয়ের' আড্ডা থেকে। বুদ্ধদেব তাঁর 'আমার যৌবন' শীর্ষক আত্মজীবনীমূলক রচনাটিতে লিখেছেন, "পরিচয়ের প্রথম সংখ্যায় আমার কবিতা ছিলো, দ্বিতীয় সংখ্যায় ছিলো 'বন্দীর বন্দনা' ও 'অভিনয়, অভিনয় নয়', এই দুটোর সহৃদয় ও সাধু সমালোচনা, আমি জেনেছি এঁরা আমার প্রতি অনুকূল; তবু এঁদের মজলিসে ঠিক মানসিক স্বাচ্ছন্দ পাইনি সেকথা আমাকে মানতেই হবে। যেন একটু অধিক মাত্রায় সুচারু ও সমৃদ্ধ ও শোভমান; যেন আড্ডা নয়, আয়োজিত একটি অধিবেশন—এমনি মনে হয়েছিলো আমার। আরো অস্বস্তি এইজন্য যে সকলেই যেন বড়ো বেশি বিদ্বান ও পরিপক্ক, তত্ত্বালোচনায় এঁদের যতটা দক্ষতা, সাহিত্য রচনায় ততটা নয়—এঁদের মধ্যে সৃষ্টিশীল লেখক দু'জন মাত্র; সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে। তখনও 'কল্লোল' 'প্রগতি' আমার মনের সন্নিকট; তাই সেই প্রথম ধাক্কায় আমি বুঝিনি যে তরুণ কণ্ঠের কলরোল মুখর উচ্ছ্বাসের পর, প্রয়োজন ছিলো আত্মপরীক্ষার ও নবমূল্যায়নের, আর সুধীন্দ্রনাথ, তাঁর সমালোচনাপ্রধান বুদ্ধিজীবী-নির্ভর 'পরিচয়' পত্রিকায় তা-ই সাধন করেছিলেন। আমার স্বভাব এবং সেই মুহূর্তের প্রয়োজন আমাকে 'পরিচয়' থেকে দূরে সরিয়ে নিলো—সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে সম্পৃক্ত রইলাম শুধু সাহিত্যের ক্ষেত্রে, ব্যক্তিগতভাবে নয়। তাঁর সঙ্গে আমার হৃদ্যতা জমে অনেক পরে, আর তা' যখন ফুলে-ফলে পূর্ণবিকশিত, ঠিক তখনই তাঁর মৃত্যু ঘটলো।"

বুদ্ধদেব বসু যথার্থই বলেছেন, সুধীন্দ্রনাথ-কেন্দ্রিক সারস্বত সভায় যাঁরা আসতেন তাঁরা নানা বিদ্যায় পারদর্শী হতে পারেন, হতে পারেন মনস্বিতায় প্রখর, কিন্তু সৃষ্টিশীল ক্ষমতা থেকে তাঁদের অধিকাংশই বঞ্চিত ছিলেন। সুধীন্দ্রনাথ ছাড়া বিষ্ণু দে-র কথা বুদ্ধদেব উল্লেখ করেছেন সেই মজলিশের একমাত্র ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব হিসেবে। বুদ্ধদেব বসু প্রসঙ্গতঃ আরো একজনের কথা বলতে পারতেন যাঁর প্রতি কাব্যদেবী কিছুটা ঔৎসুক্য দেখিয়েছিলেন। শাহেদ সোহ্‌রাওয়র্দী, 'পরিচয়ের' আড্ডার এক প্রধান সদস্য এবং সুধীন্দ্রনাথের সুহৃদ, ইংরেজী ভাষায় কাব্যচর্চা করতেন। অবশ্য জাঁদরেল বুদ্ধিজীবী ও চিত্রকলার রসজ্ঞ সমালোচক হিসেবেই তিনি বিশিষ্টতা অর্জন করেছিলেন, লাভ করেছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি। সৃষ্টিশীলতার শ্রীক্ষেত্র থেকে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কেও নির্বাসিত করা যায় না। বাংলা উপন্যাসে মননশীলতা ও চৈতন্য-প্রবাহ রীতির প্রবর্তক তিনি; তাঁর এই সৃষ্টিশীল ভূমিকা সাহিত্য-রসপিপাসুদের সাধুবাদ কুড়াবে চিরদিন।

যাই হোক, সুধীন্দ্রনাথ যে মজলিশের গোষ্ঠীপতি সেখানে সৃষ্টিশীল লেখকেরা অনুপস্থিত—এটা একটা অস্বস্তিকর তথ্য আমাদের পক্ষে। তবে কি তিনি নিঃস্পৃহ কিংবা বিরূপ ছিলেন তাঁর সমকালীন কবিসাহিত্যিকদের প্রতি? সুধীন্দ্রনাথের উদার আতিথেয়তা ও অসামান্য সৌজন্যের কথা যখন শুনি, তখন স্বাভাবিকভাবেই এ-কথা মানতে আমাদের বাধে যে তিনি তাঁর সমকালীন সৃষ্টিশীল লেখকদের সঙ্গ পছন্দ করতেন না। তা হলে বিষ্ণু দে কী করে অবিরাম গ্রহণ করেছেন 'পরিচয়ের' শুক্রবাসরীয় সন্ধ্যার স্বাদ? কী করে তিনি হতে পেরেছিলেন সুধীন্দ্রনাথের সুহৃদ? বুদ্ধদেব বসুর জন্যেও উন্মুক্ত ছিল সেই মজলিশের প্রবেশপথ। তিনি নিজেই যে সেখান থেকে সরে এসেছিলেন এটা তো আমরা তাঁর জবানিতেই জেনেছি।

এ বিষয়ে এত বাক্য ব্যয় করেছি এজন্যে যে, 'পরিচয়ের' আড্ডায় সৃষ্টিশীল লেখকদের অনুপস্থিতি সেকালের একটি সাহিত্যিক প্রবণতাকে সুস্পষ্ট করে তোলে। সেই প্রবণতা বর্তমানে স্তিমিত, এ কথা বলতে পারলে খুশি হতাম। কী সেই প্রবণতা? উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য এবং আবেগের বাধাবন্ধহীন তুরঙ্গ-গতি। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এবং অন্যান্য রবীন্দ্রানুসারী কবি তাঁদের কাব্যে সযত্নে লালন করেছেন উচ্ছ্বাস ও ভাবালুতা। গুরুদেবের কাছ থেকে তাঁরা ভুল শিক্ষা নিয়েছিলেন নিজেদেরই স্বভাবদোষে, তাই তাঁদের ঝিমানো ঐকতানে যে

সুরটি বাজলো, তা প্রকৃত রাবীন্দ্রিকও নয়। কাজী নজরুল ইসলাম, যিনি বাংলাকাব্যে কিছু নতুন জমি-জিরেত সংযোজন করলেন, সুবিশাল রবীন্দ্রবলয় থেকে মুক্ত রইলেন বটে, কিন্তু উচ্ছ্বাস ও আবেগের তোড়ে নিজে তো ভাসলেনই অগণিত পাঠককেও ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন। কবিতার পক্ষে আবেগ খারাপ কিছু নয়। কে না জানে, আবেগের স্পন্দন অনুভব না করলে কাব্যলক্ষ্মী কখনো কবির চৌকাঠ মাড়ান না। কিন্তু আবেগের তুর্কী-নাচন বাগ্দেবীকে একেবারে আলুথালু করে দেয় এবং এই দারুণ দশা তার না-পছন্দ।

অধিকাংশ বাঙালী লেখক উচ্ছ্বাসপ্রবণ এবং মনন-লাজুক বলেই হয়তো তাঁরা 'পরিচয়ের' পাণ্ডিত্যপূর্ণ, তর্কমুখর, মনস্বিতা-জাগর পরিবেশ এড়িয়ে চলতেন। বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি বঙ্গীয় পাঠক সমাজের সীমাহীন ঔদাসীন্যের কথা সুবিদিত, এমন কী বঙ্গভাষী লেখকগোষ্ঠীর অনেকেই বুদ্ধির চেয়ে আবেগ দ্বারাই চালিত হন বেশি। এবং যেহেতু মাত্রাজ্ঞানের অভাব বাঙালি জাতির পরিচয়-পত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য, তাই আবেগের ক্ষেত্রেও আমরা প্রায়ই বেসামাল হয়ে পড়ি। যাঁরা প্রখর মননশীলতায় ঋদ্ধ বাঙালী কবি কিংবা গদ্য লেখকের ভাগ্যে পাঠকদের তো বটেই, এমন কী সচরাচর খোদ লেখকদেরও অনুকম্পা জোটে না। এজন্যেই সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, যিনি প্রধানতঃ বুদ্ধিবৃত্তির উপর ভরসা করে তাঁর কাব্যশরীর গঠন করেছেন, যিনি উত্তররৈবিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি, পাঠক সম্প্রদায়ের মনোযোগ আকর্ষণে প্রায় ব্যর্থ! এখনো তাঁর অনুরক্ত ভক্ত পাঠকের সংখ্যা তেমন বাড়েনি এবং এটা, আমার বিবেচনায়, আমাদের মানসিক দৈন্যেরই পরিচায়ক। এতে সুধীন্দ্রনাথের কিছু এসে যায় না, শুধু তাদেরই লোকসানের পাল্লা ভারি হয় যারা তাঁর কাব্য সংগ্রহের পাতা ওল্টাতে আলস্য বোধ করেন। সত্য, সুধীন্দ্রনাথের কাব্যজগত দুষ্প্রবেশ্য; কিন্তু একবার সেখানকার ছাড়পত্র পেলে যে কোনো অনুসন্ধিৎসু যাত্রীই পুরস্কৃত হবেন অসামান্য দৃশ্যাবলি দেখে। তার দৃষ্টিপথে চকিতে জেগে উঠবে মোহন ভাস্কর্য, কান্তিমান স্থাপত্য। (দেগার ব্যালে নর্তকীদের মতো স্বাস্থ্যল, কিন্তু নির্মেদ, নৈপুণ্যে ভরপুর, লীলায়িত তার পংক্তিমালা পাঠকের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে, মনকে করে বয়স্ক।) আমাদের পরম সৌভাগ্য, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ভাটিয়ালী কিংবা কীর্তনের সুরে বঙ্গীয় পাঠক সমাজকে ভজাতে চান নি, আজীবন ভেঁজেছেন ধ্রুপদী সুর। বুদ্ধিবৃত্তিকে আবেগমণ্ডিত করে তিনি এক নতুন কাব্যরীতির জন্ম দিলেন বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে; তাঁর এই স্বরচিত ক্ষেতের ফসলের জাত

আলাদা। এ ব্যাপারে তিনি প্রায় নিঃসঙ্গ পুরুষ; একমাত্র বিষ্ণু দে তাঁর যোগ্য সহযাত্রী।

বস্তুত সুধীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর জনপ্রিয়তার পথে প্রধান অন্তরায়। আমার এই মন্তব্য ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্যের খ্যাতি এক পরাক্রান্ত প্রবাদের মতো; দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, কান্তিবিদ্যা, ইতিহাস ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞানের কথা এতই প্রচারিত যে সাধারণ পাঠক তাঁর কাব্যের ত্রিসীমানায় ঘেঁষার সাহসই সঞ্চয় করতে পারেন না। তাঁর কবিতার কাছে সাধারণ পাঠকদের বোধশক্তি শোচনীয়ভাবে পরাভূত হবে ভেবে তাঁরা দোরগোড়া থেকেই সরে পড়েন, সুধীন্দ্রনাথের কাব্যের ভিতর মহলে ঢুকতে ভরসা পান না। অথচ প্রাথমিক বাধা উজিয়ে গেলেই তাঁরা বিলক্ষণ বুঝতে পারবেন যে, সুধীন্দ্রনাথের কবিতা যে কোনো সং কবিতার মতোই মনকে রসাপ্লুত করে তোলে, বোধের কপাটে টোকা দেওয়ার আগেই।

আমি কবিদের গায়ে লেবেল এঁটে দেওয়ার পক্ষপাতী নই। কবিদের শ্রেণীভুক্ত করতে পারলে সমালোচকদের সুবিধা হয় বটে, কিন্তু এর ফলে অনেক সময় কোনো কোনো কবির পরিচয় সীমিত হয়ে পড়ে। তাই সুধীন্দ্রনাথকে আমি নাস্তিক্যবাদী, নৈরাশ্যবাদী কিংবা ক্ষণবাদী বলে চিহ্নিত করতে উৎসাহিত বোধ করি না, যদিও এর প্রত্যেকটিই তাঁর সম্পর্কে প্রযোজ্য। আমি মনে করি, এ ধরনের চিন্তা সুধীন্দ্রনাথের কবিসত্তার ব্যাপকতাকে খর্ব করে। আমি তাঁর কাব্যের একটি প্রধান সুর সম্পর্কে কিছু বলার চেষ্টা করব। এই সুর নিঃসঙ্গতার। নিঃসঙ্গতা আধুনিক সাহিত্যের কুললক্ষণ বলা যেতে পারে। সুধীন্দ্রনাথের মতো আধুনিক মানুষের অস্মিতায় এই সুর প্রবল বেজে উঠবে, এটা খুবই স্বাভাবিক। তিনি তাঁর 'কাব্যের মুক্তি' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন, "......এমন অভিমত পোষণীয় নয় যে এই অবশ্যম্ভাবী অধঃপতনের জন্যে দায়ী আধুনিক কবি। সে তো দূরের কথা, বরং আমার মনে হয় যে সাহিত্যের ইতিহাসে কবি আর কখনও এত শ্রদ্ধেয়রূপে দেখা দেয়নি। এতদিন ধরে স্থানে-অস্থানে তার অতিমানুষিকতার যে-ঘোষণা শোনা গেছে, সে-দাবির প্রথম প্রমাণ এই বার হয়তো মিললো। কারণ চিরকালের কীর্তিস্তম্ভগুলোকে ভেঙেচুরে সভ্যতার স্টীম্ রোলার আজ যখন তার অভিমুখে ধাবমান, তখনও দুঃসাহসে ভর ক'রে, কবি আছে সৌন্দর্যের দরজা আগলে। তার মনে আশা নেই। সে জানে তার পরাজয় নিশ্চিত। সে বোঝে সে একা; যাদের জন্যে

তার বিদ্রোহ, তাদের কাছে এই আসুরিক স্পর্ধা যেহেতু পাগলামিরই নামান্তর; তাই তার পরিচিত বিশ্বকে দৈব ছাড়া কেউ বাঁচাতে পারবে না। তবু তার চেষ্টায় ত্রুটি নেই, বিরাম নেই তার গানে। সে-গান হয়তো আনন্দের নয়। তার কণ্ঠ হয়তো ক্রোধে ও ক্ষোভে কর্কশ! ভয় ভুলতেই সে হয়তো চেঁচিয়ে সারা। কিন্তু আসন্ন প্রলয়ের প্রখর কোলাহল ছাপিয়ে উঠেছে একা তারই বাণী। অতএব সে আমাদের নমস্য; রাহুগ্রস্ত হ'লেও, সে আমাদের নমস্য।" এই প্রাজ্ঞ উক্তি যে স্বয়ং সুধীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও প্রযোজ্য, তা' অবশ্যস্বীকার্য।

সুধীন্দ্রনাথের নৈঃসঙ্গ্যবোধ বিষয়ে কিছু বলতে গেলে প্রথমেই বিশ শতকের আধুনিক চৈতন্যের স্বরূপটি উপলব্ধি করা দরকার। আধুনিক ধনতন্ত্র এমন এক ধরনের মানুষের জন্ম দিয়েছে যাদের মনোবিজ্ঞানী এরিক ফ্রম বলেছেন 'the automation, the alienated man—অর্থাৎ এ যুগের অনেকেই বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি-বুদ্বুদ। এই পরিস্থিতিকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছেন, আধুনিক ধনতন্ত্রের সন্তানের ক্রিয়াকাণ্ড এবং শক্তি তার নিজেরই আয়ত্তের বাইরে অপসৃত; সেগুলো যে আর তার শাসনাধীন থাকছে না শুধু তা-ই নয়, এমন কী তার বিরুদ্ধাচরণ পর্যন্ত করছে। বস্তুত তারা শাসিতের ভূমিকা ছেড়ে খোদ শাসকের সিংহাসন আগলে রয়েছে। ধনতন্ত্রের সন্তানের জীবনধারা মূলতঃ বস্তু ও প্রতিষ্ঠানের দিকেই প্রবাহিত। এবং এসব বস্তুর উপাচার তার কাছে অধিষ্ঠিত দেবতার মতোই পরাক্রমশালী। সেগুলো নিজের বিলাসের প্রসূন হয়ে তার অভিজ্ঞতায় সঞ্জাত হচ্ছে না, বরং মানবিক সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো বস্তু হিশেবে প্রতিভাত হচ্ছে মাত্র। একে সে পুজো করে, আত্মসমর্পণ করে এরই কাছে। এই বিচ্ছিন্ন মানুষ তার স্বহস্তে তৈরি বস্তুর সামনেই মাথা নত করতে বাধ্য হয় শেষ পর্যন্ত। এ্যালিনিয়েটড্‌ অর্থাৎ বিচ্ছিন্নতা স্পৃষ্ট মানুষের কাছে প্রেমও অর্থহীন। কেননা, যন্ত্রচালিত মানুষ ভালবাসতে পারে না, বিচ্ছিন্ন মানুষের কিছুতেই কিছু এসে যায় না। এই পরিবর্তমান বিশ্বে এখন প্রেম, বিয়ে ইত্যাদি সুবিধাজনক ব্যবসায়ে রূপান্তরিত, হয়তো নৈঃসঙ্গ্যের থাবা থেকে নিস্তার পাওয়ার অন্যতম উপায়মাত্র।

পরিবর্ধমান উৎপাদন শক্তি ও জীবন উপভোগের রকমারি উপকরণ থাকা সত্ত্বেও মানুষ আত্মচেতনা হারিয়ে ফেলছে। বুঝি তাই গোটা জীবনটাই তার কাছে ঠেকে অর্থহীন। অবশ্য এ ধরনের অনুভব অনেকাংশেই আনাগোনা করে অচেতনতার অন্ধকার পথে। উনিশ শতকের অন্যতম সমস্যা ছিল

ঈশ্বরের মৃত্যু, কিন্তু বিশ শতকের সমস্যা আরো মারাত্মক; কেননা, এই শতক ঈশ্বর নয়, মানুষেরই মৃত্যুবার্তা ঘোষণা করল। উনিশ শতকে অমানুষিকতা ছিল নির্দয়তার নামান্তর। অন্যপথে, বিশ শতকে-এর অর্থ দাঁড়াল আত্মবিনাশী উন্মত্ততা। সে ক্রীতদাস হয়ে যাবে, অতীতে এমন শংকা দানা বেঁধেছিল মানুষের মনে। ভবিষ্যতে মানুষ হয়তো যন্ত্রমানবে পরিণত হবে, এই আশংকার ছায়া বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মানুষেরই মনে নেমে এসেছে গাঢ় হয়ে। যন্ত্রমানবের মধ্যে বিদ্রোহের বীজ নেই সত্য, কিন্তু তাদের যান্ত্রিক সত্তায় যদি দৈবক্রমে মানব-প্রকৃতির ছোঁয়া লাগে, তাহলে তারা আর সুস্থ মস্তিষ্কে বাঁচতে পারবে না; তারা রূপান্তরিত হবে বিপজ্জনক দানবে। তখন তারা তাদের পৃথিবীকে ধ্বংস করে দুহাতে ওড়াবে ভস্মরাশি, মেতে উঠবে আত্মসংহারে। কারণ, ফাঁপা, অর্থহীন জীবনের একঘেয়েমি তাদের কাছে দারুণ অসহনীয় ঠেকতে বাধ্য। আমরা জানি, আদিম মানুষ খেয়ালী প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় লীলাক্ষেত্রে নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে করত, ঠিক তেমনি আধুনিক মানুষও তার নিজের গড়া সামাজিক ও অর্থনৈতিক শক্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সমপরিমাণ অসহায় বোধ করে। স্বহস্তে গড়া বস্তুকেই অর্ঘ্য দেয় সে, সূর্য ও বৃক্ষ বন্দনার প্রাক্তন অভ্যাস ছেড়ে নতুন দেবমণ্ডলীর নিকট নত করে মাথা।

এই নিরীশ্বর, বিপন্ন, নিঃসঙ্গ মানুষ প্রায় এই প্রথমবারের মতো হতাশায় এলিয়ে যেতে যেতে দেখল যে তার জীবন প্রকৃতপ্রস্তাবে ক্রম-বিচ্ছিন্নতার দীর্ঘ প্রক্রিয়া বৈ আর কিছু নয়। জন্মলগ্নে যে শিশু মাতৃগর্ভ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভূমিষ্ঠ হয় তার সমগ্র জীবনই এক ক্রমিক বিচ্ছিন্নতার ইতিহাস। শৈশবে অচেনা জগতের সঙ্গে পরিচয় লাভের বাসনা এবং ভয় তাকে তার চেনা জগতের ক্ষুদ্র পরিসর থেকে বিচ্ছিন্ন করে আনে। বয়স বাড়লে সে দ্যাখে, যে আত্মলোপী প্রতিবেশীকে এতদিন সে বড়ো একটা লক্ষ্য করে নি, জীবিকার ক্ষেত্রে হয়তো সে-ই তার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। স্বার্থের সংঘাতে, সেই তীব্র প্রতিযোগিতার মুহূর্তে বাইবেলের বিখ্যাত অনুজ্ঞা 'লভ দাই নেবার' অসহ্য ও উপহাস্য মনে হয়। জীবিকার পেছনে জিভ বের করে ছুটতে ছুটতে সে এক সময় বার্ধক্যের বুড়ি ছোঁয়, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে পুত্রকন্যার জীবন থেকে। বার্ধক্যের নৈঃসঙ্গ্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে অতীত জীবনের জাবর কাটে এবং এই সঙ্গে ভাবে মৃত্যুর শূন্যতার কথা। মৃত্যুকে সে তার সৌভাগ্যবান পূর্বপুরুষের

মতো নতুন এক জীবনের দ্বার ভেবে সান্ত্বনার কণা কুড়িয়ে বেড়ায় না। কেননা, ইতিমধ্যে এই বিরূপ বিশ্বে তার পায়ের তলা থেকে নিশ্চিন্ত বিশ্বাসের ভূমি অপসৃত। তাই নিরীশ্বর, নৈঃসঙ্গ্যভারাতুর সুধীন্দ্রনাথ দত্তের এই আর্তনাদ আমাদের অস্তিত্বসুদ্ধ কাঁপিয়ে দেয় :

অতএব কারো পথ চেয়ে লাভ নেই,
অমোঘ নিধন শ্রেয় তো স্ব-ধর্মেই,
বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী।

এখানে স্মরণীয় এলিয়টের 'দি ককটেল পার্টি'-র সেই চরিত্রটির উক্তি যাতে ধ্বনিত হয়েছে নিঃসঙ্গতারই স্বর :

"...What has happened has made me aware
That I've always been alone.
That one always is alone.
...it isn't that I want to be alone,
But that every one's alone—or so it seems to me.
They make noises and think they are talking to each other ;
They make faces, and think they understood each other
And I'm sure that they don't......"

এই পরিপ্রেক্ষিতে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের নৈঃসঙ্গ্যবোধ আমাদের চেতনায় মুকুলিত হয়, আমরা উপলব্ধি করতে পারি কেন তিনি নিখিল নাস্তির মৌনে নিমগ্ন, কেন তিনি উচ্চারণ করেন নৈরাশ্যের পদাবলী, যা' স্বর্গচ্যুতির আর্তনাদের মতোই সুতীব্র গভীর। প্রশ্ন উঠতে পারে, যেকালে অন্যান্য বাঙালী কবির রচনাতেও নিঃসঙ্গতার পরিচয় রয়েছে, তখন বিশেষ করে সুধীন্দ্রনাথের কথা বলা হচ্ছে কেন? অন্যান্য বাঙালী কবির কবিতায় নিঃসঙ্গতার ছাপ নেই, এ-কথা বলি না; কিন্তু নিঃসঙ্গতার ধ্বনি সবচেয়ে প্রবল এবং ব্যাপক সুধীন্দ্রনাথ দত্তেরই কাব্যে, আর কারও কবিতায় নয়।

ব্যক্তিজীবনে সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন নিঃসঙ্গ। তিনি নির্বান্ধব ছিলেন না, কিন্তু ছিলেন নিঃসন্তান। সামাজিকতায় সুচারু দক্ষতার অধিকারী ছিলেন বলে তাঁর সঙ্গীর অভাব হওয়ার কথা নয়, কিন্তু তবু তিনি সত্তায় আজীবন

বয়ে বেড়িয়েছেন নিঃসঙ্গতার জরুল। তাঁর অসামান্য মনীষা, পরিশীলিত রুচি ও মানসিক আভিজাত্যই তাঁকে উপহার দিয়েছিল এই নৈঃসঙ্গ্যবোধ। উপরন্তু তিনি ছিলেন স্বাধীন মতাবলম্বী এবং নিজস্ব মতামত প্রকাশ করতে কখনো পেছপা হননি। যে-কালে বহু মনস্বী লেখকও স্বমত বিসর্জন দিয়ে প্রতিষ্ঠিত মতবাদে সায় দিয়েছেন সানন্দে, তখন এভাবে নিজের ধ্যানধারণার এলাকায় অটল দাঁড়িয়ে থাকা সহজ নয়। এটা সুধীন্দ্রনাথের ব্যক্তিস্বরূপের এক অসাধারণ গুণ, সন্দেহ নেই। এক্ষেত্রেও তিনি নিঃসঙ্গ। যূথচারিতায় কখনো মজেন নি তিনি, তাই অপবাদের ঝুঁকি নিয়েও অকম্পিত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন,

'সহেনা সহেনা আর জনতার জঘন্য মিতালি।' কারণ তিনি ইতিহাসের একনিষ্ঠ পাঠক হিশেবে নানাযুগের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত থেকে এই শিক্ষাই পেয়েছেন যে,

'কেবল আদিম জাড্য প্রাথমিক মাৎস্যন্যায়ে মিলে
সমষ্টির অভিসন্ধি নিঃসহায় ব্যষ্টিরে সংহারে।'

নৈঃসঙ্গ্য-করলিত এই কবি বারবার নৈরাশ্যময় উক্তি করেছেন। ইচ্ছে করলেই তিনি সহজিয়া আশাবাদের সুললিত স্তবে পাঠকদের তুষ্ট করতে পারতেন, পারতেন পাঠকের সনাতন অভ্যাসকে পরিতৃপ্ত করে বিশ্বাসের ধরতাই বুলি আওড়াতে। তাহলে হয়তো তাঁর ভক্তের সংখ্যা অতিক্রত বেড়ে যেত, কিন্তু অসম্মান হত তাঁর কবিসত্তার। যাঁরা মার্কসবাদে সমর্পিত, যাঁরা জনগণের উত্থান এবং বিজয়ের পথেই ইতিহাসের সার্থকতা খোঁজেন, যাঁদের বিবেচনায় সমষ্টির হাতে ব্যষ্টি নিগৃহীত হলেও ক্ষতি নেই—তাঁরা সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঝগড়া করতে পারেন, সমালোচনায় জর্জরিত করতে পারেন তাঁকে। তার যথেষ্ট অবকাশও রয়েছে, কিন্তু তাঁরাও এই কবির সততা স্বীকার করতে বাধ্য। সুধীন্দ্রনাথ নিজস্ব অভিজ্ঞতার প্রতি বিশ্বস্ত এবং স্বমত প্রকাশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সৎ ছিলেন বলেই তিনি শূন্যকুম্ভের মতো বেজে ওঠেননি যত্রতত্র। বরং তিনি বেছে নিয়েছিলেন সেই নিঃসঙ্গ পথ, যার ধুলো গায়ে মাখতে হলে চাই অসমসাহস। সরলীকরণের প্রলোভন তিনি বরাবরই এড়িয়ে গেছেন; মানুষের অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব, মানবজাতির নিয়তি তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে জটিল থেকে জটিলতর সূত্রের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে। এসব সমস্যার কোনো সহজ সমাধানে তাঁর আস্থা ছিল না। সরলীকরণ মানুষকে প্রায়শ অপসিদ্ধান্তে

পৌঁছুতে প্ররোচিত করে, এই ধারণাই তাঁর অনুসন্ধিৎসাকে উজ্জীবিত করেছে সব সময়। তিনি লিখেছেন,

'কোথায় লুকাবে? ধূ ধূ করে মরুভূমি;
ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে ছায়া ম'রে গেছে পদতলে।
আজ দিগন্তে মরীচিকাও যে নেই;
নির্বাক, নীল, নির্মম মহাকাশ।
নিষাদের মন মায়ামৃগে ম'জে নেই;
তুমি বিনা তার সমূহ সর্বনাশ।
কোথায় পালাবে? ছুটবে বা আর কত,
উদাসীন বালি ঢাকবে না পদরেখা।
প্রাক্‌পুরাণিক বাল্যবন্ধু যত
বিগত সবাই, তুমি অসহায় একা।'

কিংবা অন্যত্র এই কবিকণ্ঠ ধ্বনিত হয়েছে এভাবে :—

'অতল শূন্যের শেষে পড়ে আছি আমি নিরাশ্রয়
দেখিতেছি ভ্রমি ভ্রান্ত চোখে
গতাসু আলোয় প্রেত বিচরিছে স্তবকে স্তবকে
নিরালম্ব নৈরাশ্যের নিঃসঙ্গ আঁধারে।'

এই বোধই সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে দিয়েছে ট্রাজিক নায়কের মহিমা। ট্রাজিক নায়ক জানে যে তার ধ্বংস অনিবার্য; পারিপার্শ্বিক দুর্বিপাকে এবং তার নিজেরই অন্তর্গত কোনো ত্রুটির দরুন সে এগিয়ে যাচ্ছে লুপ্তির দিকে; কিন্তু তা'বলে সে কোনো সান্ত্বনার ভাষা খোঁজে না, অসমসাহসে দাঁড়ায় অনিবার্যতার মুখোমুখি। এই সাহসের অধিকারী ছিলেন বাংলা কাব্যের নিঃসঙ্গ পুরুষ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

সুধীন্দ্রকাব্য প্রসঙ্গে

এমন একদিন ছিল যখন মানুষের জীবনে কোনও সমস্যা দেখা দিলে তার সমাধান সে নিজে না করে যেত পুরোহিত বা রাজার কাছে। পুরোহিত কিংবা রাজা যে বিধান দিত সেটাকে সে মেনে নিত নির্বিচারে। সেই পুরোহিত বা রাজার আসনে আজ রাজনৈতিক নেতা বসলেও আধুনিক মানুষ কোনও দলীয় নেতার নির্দেশকে এক কথায় চূড়ান্ত বলে মেনে নেয় না, সেটাকে সে তার বিচার-বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করতে চায়। সেকালের পরনির্ভরতার মধ্যে ছিল একটা নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্তি। একালের মানুষ আত্মনির্ভর হবার সঙ্গে সঙ্গে যেমন বেড়ে গেছে তার দায়িত্ব তেমনই সেই নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্তি হারিয়েছে। কিন্তু মানুষ যখন কোনও সমস্যা থেকে একটা বিশেষ সিদ্ধান্তের দিকে এগোতে থাকে তখন তার নিজস্ব যুক্তি-বুদ্ধি সত্যিই কি তার একমাত্র অথবা মুখ্য পাথেয়?

সভ্যতার শুরুতে মানুষ চালিত হত প্রবৃত্তির প্ররোচনায়। তারপরে এল ধর্মের বিধান। কিন্তু একদা ধর্মের মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে মানুষ অবলম্বন করল তার আপন যুক্তি-বুদ্ধিকে। ইতিমধ্যে হাজির হলো যন্ত্রযুগ; এই যন্ত্র হল মানুষের অন্তঃস্থিত আকাঙ্ক্ষারই প্রতীক; প্রকৃতির রহস্য ভেদ করবার ও প্রকৃতিকে জয় করবার যে-আকাঙ্ক্ষা এ-যাবৎ মানুষের মনে সুপ্ত ছিল, এতদিনে তা খুঁজে পেল পরিতৃপ্তির পথ। একটু তলিয়ে ভাবলেই মানতে হয় যে মানুষের দুর্মর আকাঙ্ক্ষা-ই একালের বিজ্ঞানের উদ্বেলিত উন্নতির ভিত্তি, শুদ্ধ জ্যামিতিক যুক্তিবৃত্তি নয়; বরং একালে যুক্তি ও আকাঙ্ক্ষা যে কেবল বিশ্লিষ্ট হয়ে গেছে তা-ই নয়, আকাঙ্ক্ষা-ই হয়েছে যুক্তির নিয়ামক। আগেকার দিনে রাজা যখন কাউকে খুন করত তখন তার জন্যে যুক্তি দেখানো বা কৈফিয়ৎ দেওয়ার কোনও প্রশ্নই ছিল না। অথচ বর্তমান যুগে নিন্দে না রটালে কুকুরকেও ফাঁসি দেওয়া অসাধ্য।

একালের যুক্তি বলতে মাত্র একটি চিন্তাকে বোঝায়; সে-চিন্তা হল এই যে সোহংবাদীমাত্রেই আপন আকাঙ্ক্ষাকে চরাচরের পক্ষে শুভঙ্কর মনে করে থাকেন। কিন্তু অমন অটল আত্মবিশ্বাস থেকে বঞ্চিত হতভাগ্যগণ জানেন যে শুভাশুভ বিচারের কোনও সোনার তৈরি মানদণ্ড আপাতত মানুষের হাতে নেই। মার্কস্ বা মহাত্মাজীর মধ্যে কোন্ জন যথার্থ তা কে বলতে পারে? সুভাষচন্দ্র গত মহাযুদ্ধে জাপানের সাহায্য নিয়ে কি উচিত-কর্ম করেছেন? সতীর কাছে পিতা বড়ো কি পতি বড়ো? নিরামিষ ও আমিষ ভোজনের মধ্যে কোন্‌টা ভালো? বিভিন্ন ব্যক্তি এ-সমস্ত প্রশ্নের যে বিভিন্ন উত্তর দেবেন সেটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু সেসব প্রতিবাক্যের মূল যতখানি যুক্তিতে থাকবে তার চেয়ে অনেক বেশি থাকবে উত্তরদাতাদের স্ব-স্ব রুচিতে; এবং স্বীয় রুচির ছাঁচে যুক্তিকে ঢালাই করবার প্রয়াসই সেখানে প্রাধান্য পাবে। আধুনিক মানুষের পক্ষে আপন প্রতিবাক্যগুলির অভ্রান্তি সম্বন্ধে নিশ্চিতিও অসম্ভব। এই অনিশ্চয়তা কি দেশ-কাল-পাত্র সম্বন্ধে মানুষের অজ্ঞানতারই অন্য-এক রূপ নয়? যে-অজ্ঞানতার সম্মুখে মানুষ অসহায়: অক্ষম: অশক্ত। অতএব আশুচেতন আধুনিক ব্যক্তির এ-কথা মনে হওয়াই হয়তো স্বাভাবিক যে,—

বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী।

এবং নিদেন আমার মতো দুর্ভাগারা অগত্যা এ ধরনের উক্তিতে আপন আর্তির অব্যর্থ অভিব্যক্তি খুঁজে পান তথা লাভ করেন চিত্তশুদ্ধির অভিজ্ঞতা।

বস্তুজগতের অনেক রহস্য বিজ্ঞান জানতে পেরেছে এবং বুঝেছে যে, ঈশ্বর-বিশ্বাসী পূর্বপুরুষেরা ব্রহ্মাণ্ডকে যত বৃহৎ ও যত জটিল বলে কল্পনা করেছিলেন তার চেয়ে তা বহুগুণে বৃহৎ ও জটিল এবং যা জানা হয়েছে তার তুলনায় না-জানার জগৎ অকল্পনীয়। না-জানার জগৎ সম্বন্ধে আধুনিক মানুষের এই সচেতনতা তার বিভীষিকাবোধকে বিয়োগের দিকে নিয়ে যাওয়া দূরে থাক, তাকে আরও তীব্র তীক্ষ্ণ করে চক্রবৃদ্ধিহারে বাড়িয়ে তুলেছে। পক্ষান্তরে ঈশ্বরে সংশয়ও নিতান্ত অনর্থক নয়। জীবসৃষ্টি সম্বন্ধে প্রাচীন শাস্ত্রে ও পুরাণে প্রচারিত অলৌকিক তত্ত্বগুলি ডারুইন খণ্ডন করবার পরেই নীটশে ঘোষণা করেন যে স্বর্গের বুড়ো ভগবান মরে গেছেন। চার্বাক দর্শন মোটেই অভিনব বা অশ্রুতপূর্ব নয়। কিন্তু নাস্তিকতা পূর্বে কখনও এরূপ প্রচণ্ড ও অপ্রতিরোধ্য রূপে দেখা দেয়নি; অবশ্য এর কারণ, যে-সব সত্যের উপরে ঈশ্বর এতকাল

অধিষ্ঠিত ছিলেন সে-সব সত্য বিজ্ঞানের হাতে পড়ে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। অথচ বিজ্ঞানের হাতেও তো কোন যাদুদণ্ড নেই।

বিজ্ঞানের সত্য বিশেষরূপে অস্থির ও পরিবর্তনশীল—ক্রমান্বয়ে সংশোধনের পথেই বিজ্ঞানের সত্যসন্ধান প্রাগ্রসর; চূড়ান্ত সত্যকে মানুষের হাতে তুলে দিতে পারবে এমন প্রতিশ্রুতিও বিজ্ঞান দেয় না। অর্থাৎ বিজ্ঞান যতই জ্ঞানের সীমাকে বিস্তৃত করুক-না কেন, অজ্ঞানতাকে সে কখনও পুরোপুরি জয় করতে পারবে না, জানার ওপারে অজানার জগৎ অজেয় থেকেই যাবে। যে-সব বিজ্ঞানবাদী ঈশ্বরকে সরিয়ে বিজ্ঞানকে সর্বশক্তিমান বলে ভাবেন তাঁরাও ঈশ্বরবাদী; তাঁদের ঈশ্বর হল বিজ্ঞান। প্রকৃতপক্ষে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই এ-কথা স্পষ্ট হবে যে সর্বশক্তিমান বলে কিছুই নেই: না ঈশ্বর, না বিজ্ঞান। এবং সত্যিই যদি সর্বশক্তিমান কিছু থেকে থাকে তবে তা হল অজানার জগৎ। মানুষের বোধ-ও-ব্যাখ্যা-শক্তির একটা সীমা আছে; এই শক্তি কেবল তার জ্ঞাত জগতের মধ্যেই ক্রিয়াশীল ও সার্থক। সেই সীমা আমাদের প্রায়ই লঙ্ঘন করে যেতে হয়, তখন নিজেকে অসহায় লাগে, আমাদের যুক্তি নিরবলম্ব হয়ে পড়ে। যখন "কেন এমন হলো" প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাই না, তখন সমস্তই অর্থহীন ঠেকে, নিজেকে উদ্‌ভ্রান্ত দিশাহারা বোধ হয়, "ভগবানের ইচ্ছে" কিংবা "নিয়তির লিখন" বলে সান্ত্বনা পেতে চাই।

যখনই আমরা যুক্তির অতীত জগতে প্রবেশ করি তখনই আমরা ভগবান অথবা নিয়তির দোহাই দিয়ে সান্ত্বনা খুঁজি—এখানে আমি "সান্ত্বনা দেওয়া"-র উপরে জোর দিতে চাই। কেননা অজানা জগৎকে, অজ্ঞানতাকে ভয় পাই। ওই ভয় তাড়াবার জন্যে সান্ত্বনার প্রয়োজন হয়। কিন্তু সান্ত্বনার প্রকৃত তাৎপর্য কি এই নয় যে সত্যের অবিকল রূপটাকে প্রত্যাখ্যানপূর্বক তাকে অন্য-রূপে গ্রহণ করা, অন্য-কিছু অর্থাৎ একটা নকল সত্য-রূপে বানিয়ে তোলা? তাই যখন কোনও প্রচণ্ড অতর্কিত আঘাতে নকল সত্যটা ভেঙে পড়ে, খোলসটা ফেটে যায় তখন সান্ত্বনা খুঁজে পাওয়া যায় না। তারপর সে আবার সেই সান্ত্বনাকে ধীরে ধীরে বানিয়ে তুলতে থাকে, তার শোক প্রশমিত হয়। তখন আবার সেই প্রকৃত সত্যটা আড়ালে পড়ে যায়। এখানে যুক্তি-বুদ্ধির অনধিগম্য ব্যাখ্যাতীত যে-জগৎকে প্রকৃত সত্য বলে অভিহিত করছি তা কি এক মহাশূন্য নয়? ইয়াস্পার্সের মতো ঈশ্বর-ভক্তকেও আধুনিক মানুষের মর্মান্তিক-

অভিজ্ঞতাকে বর্ণনা করতে হয়েছে "জাহাজডুবি" বলে; এবং একই কারণে একালের কবিকে বলতে হয়,

> অতীতের অলীক, আত্মীয় ভগবান,
> অভিব্যাপ্ত আবির্ভাবে আজ
> আমার স্বতন্ত্র শূন্যে করো তুমি আবার বিরাজ।

বলা বাহুল্য "লুপ্তবংশ কুলীনের কল্পিত ঈশান" অমন প্রার্থনাতে পুনরুজ্জীবিত হয়ে সাড়া দেন না। "অর্থাৎ কৃতান্ত আজ ব্যক্ত সর্ব ঘটে; এবং, প্রৌঢ়ের কেন, সকলেরই কর্তব্য যেমন অরণ্যে রোদন, তেমনই সম্প্রতি সাধ্য লোকালয়ে সে-বৃথা বিলাপ।" এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কোন কোন কবিতা যে শুধুই বিলাপ একথাও অনস্বীকার্য। তাঁর বিলাপের উৎস যদিও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি, তথাপি তা একালে নিজের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে মানুষের শোচনীয় সচেতনারই মূর্ত অভিব্যক্তি। কোনও সন্দেহ নেই যে, আধুনিকতার বেদনা ও যন্ত্রণাকে সুধীন্দ্রনাথ অনবদ্য রূপেই ব্যক্ত করেছেন। তিনি স্বয়ং বলেছেন, "নাটকী নায়ক-রূপে আজীবন দেখেছি নিজেকে"; কিন্তু শেষ পর্যন্ত বুঝেছেন যে তা কেবলই ভ্রান্তি-বিলাস, কেননা তাঁর স্থান নেপথ্যে নির্দিষ্ট, এবং কদাচ দৈবাৎ রঙ্গমঞ্চে ঢুকতে পেলেও সাজতে হয় ঘুমন্ত কঞ্চুকী। প্রকৃত পক্ষে আধুনিক বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের আত্মরতি যে কত করুণ সে বিষয়ে তিনি সম্যক্ অবহিত ছিলেন বলেই তাঁর রসনায় এমন উক্তি জুগিয়েছিল :

> তাই অসহ্য লাগে ও আত্মরতি!
> অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?
> আমাকে এড়িয়ে বাড়াও নিজেরই ক্ষতি।
> ভ্রান্তিবিলাস সাজে না দুর্বিপাকে।

সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় নিসর্গ বর্ণনার বিশেষ অভাব: "দশমী" নামক পুস্তিকাটিতে সংকলিত কবিতাগুলিতে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন নিসর্গ-দৃশ্য আছে বটে, কিন্তু কবির বিশেষ বক্তব্যই হল সেই দৃশ্যগুলির মধ্যকার যোগসূত্র, অর্থাৎ কবির ইন্দ্রিয়ানুভূতি নয়। নিসর্গ-সম্বন্ধে তাঁর এই নিঃস্পৃহতাকে দেশ-সম্বন্ধে অনীহার প্রকারভেদ বললে হয়তো ভুল হবে না; এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে কাল-সম্বন্ধে সুধীন্দ্রকাব্যের অতিপ্রসঙ্গ বিবেচ্য। কেবল তাঁর কবিতায় নয়, অপেক্ষাকৃত অগ্রবর্তী কবি যেমন র‍্যাবো বা এলিয়ট-এর কবিতাতেও বর্ণিত নিসর্গ-দৃশ্যগুলির একমাত্র সার্থকতা কবির অনুব্যবসায়ের

প্রতীক-রূপে, এবং যে-অধ্যবসায়ের নিরপেক্ষ কেন্দ্র হল কাল, সালভাডো ডালি অঙ্কিত "ল্যাণ্ড্‌স্কেপ : দি পার্‌সিস্টেন্স অব্‌ মেমরি" যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অবশ্য বর্তমান-ই আধুনিকদের অঙ্গীকৃত কাল। সুধীন্দ্রনাথের অম্বিষ্ট ছিল ত্রিকালকে জীবন্ত ও সমৃদ্ধরূপে আপন তৎকালীন উপলব্ধিতে ধারণ করা; হয়তো এই মহৎ ধারণের সাক্ষ্য পেয়েই তিনি মার্সেল প্রুস্ত-এর অমন ভক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাবলে তিনি বুঝেছিলেন যে, সাধারণের জন্যে বিগতকাল যেমন অপরিচয়ে বিলুপ্ত, ভবিষ্যৎ তেমনই ভবিতব্যভারাতুর; পরিণামে একালের জাতীয় মানস বর্তমান-সর্বস্ব, "অধুনায় নিশ্চিহ্ন অতীত আগামী," তাই একালের কবিও ক্ষণবাদী—উপরন্তু এই বর্তমান প্রতিটি মুহূর্তের তীক্ষ্ন উৎকণ্ঠায় কণ্টকিত। এই দুঃসহ পরিস্থিতি থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যেই বুঝি-বা মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় আত্মরতি ও ভ্রান্তিবিলাস তথা দিবাস্বপ্নে বিভোর; অথচ সৎকবির পক্ষে এইরূপ অনির্বচনীয় অব্যাহতি সন্ধান করা সম্ভব নয়, অন্তত সুধীন্দ্রনাথ আমাদের কোন মিথ্যা সান্ত্বনা দিতে গররাজি।

দরজার চাবি-গর্তে যে-ব্যক্তির বর্ণনা সার্ত্রে করেছেন, কিঞ্চিৎ ভিন্ন অর্থে আমরা অধিকাংশই তো সেই একই ব্যক্তি। সেই লোকটি যতক্ষণ চাবি-গর্তে উৎকর্ণ হয়ে ঘরের ভিতরের কথাবার্তা শোনে ততক্ষণ শ্রুতি বহির্ভূত তার কোনও অস্তিত্ব নেই, বলা যেতে পারে যে, শ্রুতিটাই ততক্ষণ তার অস্তিত্ব; কিন্তু যে মুহূর্তে পেছনের সিঁড়িতে সে কারও পায়ের শব্দ শোনে তখনই ফিরে আসে নিজের মধ্যে, সচেতন হয়ে ওঠে আপন অস্তিত্ব সম্পর্কে। আমাদের জীবন দৈনন্দিনকার অন্তহীন চক্র পরিক্রমায় অবসন্ন, অনস্তিত্বে অবলীন। সুধীন্দ্রনাথের কবিতা সিঁড়িতে সেই পায়ের শব্দ; যেমন বক্তব্য দিয়ে তেমনই ভঙ্গি দিয়েও তিনি চেয়েছেন আমাদের প্রাত্যহিকতার জাড্য, শৈত্য ও স্বাচ্ছন্দ্যকে ভাঙতে, তার অন্তঃস্থিত শূন্যতা সম্বন্ধে আমাদের অবহিত ও মিথ্যা সান্ত্বনা হতে সংবিৎকে জাগ্রত করে তুলতে। এবং তাঁর এই প্রয়াসের উদ্দেশ্য হল আধুনিক-কালে ব্যক্তির সংকীর্ণ জীবনের সীমা সম্বন্ধে সমসাময়িক ও অনাগত প্রত্যেককে সচেতন করে তোলা—যে সীমার ওপারে প্রাগুক্ত শূন্যের বা অজ্ঞানের জগৎ।

আত্মজ্ঞান, স্বীয় ক্ষমতা ও অক্ষমতা সম্বন্ধে গভীর আত্মজ্ঞানই সুধীন্দ্রনাথের পরিণত রচনাবলীর অদ্বিতীয় প্রসঙ্গ। একদা সম্যক্‌ আত্মজ্ঞানের অভাবে কৈশোরিক উচ্ছ্বাসে তিনি মরণের সন্নিধানে যেতে অপ্রস্তুত ছিলেন:

উজ্জীবনের যদিও অনেক দেরি,
তবু প্রতিমার কাঠামো হয়েছে শেষ।
ঘটুক মিলন সাধ্যে এবং সাধে ;
তারপর দিও দীক্ষা শূন্যবাদে,
তার পরে মুখে তাকায়ো নির্নিমেষ।

কিন্তু কাল দুর্বার ও দুরন্ত ; তাই উজ্জীবনের স্বপ্ন শূন্যে মিলিয়ে গেল, ধরা পড়ল প্রতিমার খড়-কাঠ দিয়ে তৈরি কাঠামোই অমোঘ ও অপ্রধৃষ্য সত্য। কৈশোরিক স্বপ্নভঙ্গের নিদারুণ অভিজ্ঞতায় "অর্কেস্ট্রা"র উচ্চকিত উত্তাল হাহাকার, এবং সেই অশান্ত শোকের সাগরকে সংযত করা হয়েছে আধারের কঠিন প্রাকার তুলে। "ক্রন্দসী"তে এসে ব্যক্তিগত শোকোচ্ছ্বাস হয়ে উঠেছে সর্বজনীন তথা লৌকিক আবেগের অলৌকিক প্রতিবিম্ব ; বুঝেছেন যে এ-যন্ত্রণাবোধ তাঁর একার নয়, যদিও যন্ত্রণার মূলে রয়েছে একাকীত্বের অভিশাপ, এবং কোথা হতে এই অভিশাপ বর্তেছে তাঁর উপরে তা অনুধাবনে তিনি বলেছেন,

শত্রু শুধু নিরপেক্ষ কাল,
মহাকাল,
ভয়াল, বিশাল।

সুধীন্দ্রনাথের এই স্বচ্ছ সম্মতি সত্ত্বেও একটু ধাঁধা থেকে যায় এজন্যে যে কাল বলতে তিনি সঠিক কী বোঝাতে চেয়েছেন তা আমাদের নাগালের বাইরে ; কাল যেন গ্রীক ট্র্যাজেডির নিয়তি, যার দোর্দণ্ড আঘাতে ব্যক্তির নৌকো মাঝদরিয়ায় বানচাল হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে সুধীন্দ্রকাব্যের আধেয়ই হলো অনন্ত অন্ধ অশান্ত সমুদ্রের মতো এক শূন্যের মধ্যে ব্যক্তির অনন্যোপায় আতঙ্কিত আতুর অস্তিত্ব ; অন্তত আপন অস্তিত্বকে তিনি অমনভাবেই অনুভব করেছিলেন ও সেই অনুভূতিকেই বাঙ্ময় করে তুলেছিলেন কাব্যে ; কারণ তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, "ব্যক্তিগত মনীষায় জাতীয় মানস ফুটিয়ে তোলাই কবিজীবনের পরম সার্থকতা।" আর যেহেতু সুধীন্দ্রনাথ আজীবন প্রতিস্বিকতার পূজারী তাই একালে ব্যক্তির ব্যর্থতাই তাঁকে করেছিল আর্ত্যাপ্লুত। এবং প্রত্যাশার মধ্যে কী বিপুল ফাঁকি ছিল তা বুঝতে পেরেই "উত্তরফাল্গুনী"তে এসে মরণের সকাশে তাঁর স্বীকৃতি :

এসেছিলে তুমি প্রথমে যে-বার,
ভারী ছিল মোর বোঝা ;
বুঝিনি তখনও জীবনের সার
কেবল তোমারে খোঁজা ;

* * *

জানি নি তখনও কত নিষ্ফল
ছায়ার সঙ্গে যোঝা ;
জীবনযাত্রার সধূম অনল
জ্বালে নি মানের বোঝা।

অতএব তাঁর নিবেদন,

শুধেছে বিধাতা চিরজীবনের ঋণ
এসো, হে মরণ, এসো আজ দ্রুত বেগে॥

"উত্তরফাল্গুনী"-ও প্রেমের কাব্য বটে, কিন্তু এতে নেই"অর্কেস্ট্রা"-র উচ্ছ্বাস ও বিলাপ, স্বপ্নভঙ্গজনিত প্রথম বিহ্বলতা কাটিয়ে এখানে তিনি স্থিত হয়েছেন বাস্তব-সত্যে, প্রকৃত পরিস্থিতিকে মেনে নিয়েছেন স্থিরচিত্তে: ধৈর্যসহকারে ; যে-অভিজ্ঞতার বিড়ম্বনা "অর্কেস্ট্রা"-র পর্যায়ে তাঁকে দগ্ধ করেছে, তারই প্রসাদে "উত্তরফাল্গুনী"তে তিনি বিদগ্ধ। কিন্তু আরও কিছু বকেয়া পাওনা ছিল ; বুঝি-বা তা-ই একদা সুধীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বর্তমানের সব ক্লেদ ও গ্লানি ধুয়ে পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে ; অবশ্য এই প্রত্যাশাটুকুও কাল অচিরেই হরণ করেছে। এইভাবে একে একে সব খোয়াব-স্বপ্ন খুইয়ে, সব আশা ও বিশ্বাস জলাঞ্জলি দিয়ে সর্বঃস্বান্ত হৃদয়ের নিপট বেদনাকে তিনি রূপ দিয়েছেন "সংবর্ত পর্যায়ের কবিতাগুলিতে ; এখানে এমন কোনও আড়াল নেই এমন কোনও সান্ত্বনা নেই যার "ক্রমাগত অভিভাবে আত্মোপলব্ধির অভাব লুকিয়ে" রাখা যায় ; সুতরাং "অপ্রতর্ক অসীমের ব্যূহ" মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

সুধীন্দ্রনাথের সদাজাগ্রত সংবিতে ব্যক্তির ক্ষুদ্রতা ও সীমাবদ্ধতা তথা প্রপঞ্চ যে-শূন্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিধৃত তাকে হয়তো কেউ কেউ বর্ণনা করবেন ধনতন্ত্রের সেই পরাব্যক্তিক শক্তির সঙ্গে যার দৌরাত্ম্যে আজকের স্বরাট উৎপাদক সম্প্রদায়ও মুনাফার জন্যে পুঁজি বিনিয়োগ ও পুঁজিবৃদ্ধির জন্যে মুনাফা অর্জনের নাগরদোলায় চড়ে কেবলই নিরুপায়ভাবে ঘুরপাক খাচ্ছে, এই

নাগরদোলা হতে নেমে পড়বার সাধ্য তাদের কারও নেই, যদি-বা সাধ থেকেও থাকে। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের শূন্য অনেকান্ত ; উপরন্তু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হতে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, জানি কি না-জানি আমরা সকলে কানামাছির মতোই শূন্যের মধ্যে হাৎড়ে বেড়াচ্ছি, এবং বামাচারও শেষ পর্যন্ত মরীচিকার পেছনেই ছোটা। শূন্যকে তিনি যতদিন অন্তরের সঙ্গে স্বীকার করে নিতে পারেননি ততদিনই শূন্যের আবির্ভাব ও সংস্পর্শ তাঁকে উত্তেজিত ও বিক্ষুব্ধ করেছে, কিন্তু যেদিন থেকে বুঝেছেন যে, ওই সার্বভৌম সত্যকে এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব, তার সঙ্গে সংগ্রাম অনর্থক, তাকে মেনে নিয়ে, তার ছন্দে ও নিয়মে পা মেলানোই বুদ্ধিমানের কাজ সেদিন হতে তাঁর লেখনীতে অনতিক্রম্য অমোঘ মহাশূন্য বিভিন্ন চিত্রকল্পের মাধ্যমে পেয়েছে স্বস্থ স্বাভাবিক স্ফূর্তি ; একটা অমূর্ত অনুভব হতে তা পেয়েছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবয়ব, নির্বস্তুকতা উত্তীর্ণ হয়েছে প্রতিমায় ; "দশমী" পর্যায়ে সুধীন্দ্রনাথের শূন্যবাদ পরিণত হয়েছে এক বিশ্বদ্ধর ভাবসম্বে। শূন্য যেহেতু এখানে একটি বিরোধী-শক্তি নয়, তাই, এই দশটি কবিতায় অন্তত, শূন্যের ভয়াল রূপ অনুপস্থিত।

সুধীন্দ্রকাব্যের বিবর্তন বরাবরই যেমন দৃঢ় তেমনই মৌল ; এবং এই বিবর্তনের ধারা অনুসরণ করলে বোঝা যাবে যে জীবনের সার কথা পিশাচের উপজীব্য হওয়া নয় ; কোনও একটি বিশেষ পর্যায়ে ও-কথা তাঁর মনে হয়ে থাকলেও, ক্রমাগত আত্মান্বেষণে তাঁর মনে হয়েছে, ইতিহাসের যে চক্রে মানুষ আবর্তিত হচ্ছে তাতে পতন ও অভ্যুদয়, নিপাত ও উদ্ধার, উভয়ই স্বাভাবিক ; সুতরাং ব্যক্তির সঙ্কল্প ও সাধনা শেষ পর্যন্ত বৃথা ; এবং এই আত্মোপলব্ধি হলে আপাতচোখে যে-পরাব্যক্তিক শক্তিকে পিশাচ বলে মনে হয় তার রূপ পালটে যায়, তার বিভীষিকা ঘুচে যায়, তাকে আর শত্রু বলে মনে হয় না, অবশ্য তা বলে তা সুন্দর হয়ে ওঠে না, তা মিত্র হয়ে যায় না, কেননা সে-শূন্য প্রকৃতপক্ষে সদা নির্বিকার, তা শুভাশুভের অতীত। এই শূন্যের মধ্যেই আমাদের অবস্থান ও অস্তিত্ব—এ-কথা যদি মনে রাখি তাহলে স্বপ্ন দেখব না, আশা করব না, কেননা তাহলেই স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা হতে, আশাভঙ্গের তিক্ততা হতে মিলবে পরিত্রাণ। মানুষকে এ-রকম পরামর্শ যে কবি দিতে পারেন তাঁর উক্তির গূঢ়তর তাৎপর্য সহজেই পিছলে যেতে পারে, তাঁর কাব্যের অপব্যাখ্যা হবার শঙ্কা অনর্থক নয়, কিন্তু একটু তলিয়ে ভাবলেই হৃদয়ঙ্গম করা যাবে যে সভ্যতা ও ইতিহাস সম্বন্ধে আশা ও স্বপ্ন অতিরিক্ত ছিল বলেই তা ভেঙে

যাবার অভিজ্ঞতা সুধীন্দ্রনাথের পক্ষে অমন উগ্ররূপে দুঃসহ, অভিমান অমন দুর্মর ও দুর্জয়, সেজন্যেই তিনি স্বস্থিতি বর্ণনা করেছেন এই ভাবে,

সুদূরে আর চোখ চলে না ; এখন আমি
শুদ্ধ কৃতাঞ্জলি ; বর্তমানের প্রত্যাদেশে দিন সঁপেছি
যাতে ভূতের বেগার খাটতে না হয় রাতে।

রচনাকাল ১৯৬০।

আলোক সরকার

সুধীন্দ্রনাথের মৃত্যুভাবনা

জীবনানন্দ যে-ভাবে মৃত্যুকে দেখেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ ঠিক সেইভাবে দেখেননি, তবু, কয়েকটি কবিতা, বিশেষ করে 'আট বছর আগের একদিন' আর 'উত্তর ফাল্গুনী'র 'দ্বন্দ্ব' পাশাপাশি পড়া যেতে পারে। 'আট বছর আগের একদিন'-র মানুষটি জীবনের সব আস্বাদন ভুলে মৃত্যুর ভিতরে বিশ্রাম খুঁজেছিল, ইতর প্রাণিজগতের চৈতন্যরিক্ত বাসনাময় জীবন-অভিলাষ তার জন্যে ছিল না, মানুষ হিশেবে যে চেতনার অধিকারী সে হয়েছিল তার-ই অভিশাপ তাকে পৃথক করেছিল সাকল্যিক প্রাণিজগতের সাধারণিক প্রবণতা থেকে ; অর্থের ভিতরে নয়, কীর্তির ভিতরে নয়, প্রেমের সফলতার ভিতরে নয়, কোনো ভোগময় উৎসবের ভিতরেই সে জীবনের তাৎপর্য খুঁজে পায়নি। 'যে-জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের—মানুষের সাথে তার হয়নাকো দেখা',—দোয়েল-ফড়িং, সব ইতর প্রাণীদের জীবন চৈতন্যহীনতার জীবন, মানুষ চৈতন্যময় প্রাণ সে বারবার অনিবার্যভাবে জানে সেই 'বিপন্ন বিস্ময়'কে অর্থাৎ নিশ্চিত বিনাশকে, শূন্যতাকে—এই জানা, এই অপরিসীম ক্লান্তি, এই অহরহ এবং অবধারিত মৃত্যু-চেতনার কাছ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে 'আট বছর আগের একদিন'-র মানুষটি মৃত্যুর ভিতরেই আশ্রয় খুঁজল, মৃত্যু অর্থাৎ চৈতন্যহীনতার ভিতরে। যতদিন চৈতন্যময় জীবন ততদিন নিঘুর্মতা ('অথবা হয়নি ঘুম বহুকাল—লাশকাটা ঘরে শুয়ে ঘুমায় এবার'), ততদিন বিপন্ন বিস্ময়ের রক্তের ভিতরে খেলা, ততদিন নিশ্চিত বিনাশের ধ্রুবতার বোধ তাকে ক্লান্ত আর ক্লান্ত করেছিল, মৃত্যুর ভিতরে, চৈতন্যহীনতার ভিতরে সেই ক্লান্তি নেই, তাই মৃত্যুর কাছেই আত্মসমর্পণ।

'আট বছর আগের একদিন'-র শেষদিকে চেতনা নয়, বন্য জীবনোৎসবের প্রতি-ই জীবনানন্দ তার সমর্থন উচ্চারণ করেছেন। যে বন্য জীবনোৎসবে মেতে পেঁচা তার শিকার ধরে, মাছি উড়ে বসে রক্ত ক্লেদ বসার উপর তারপর

ফিরে যার রৌদ্রের ভিতর, জীবনের ভিতর, মশারির চারদিকে উন্মুখ জীবনতৃষ্ণা নিয়ে জেগে থাকে মশা, লুট করে নিতে চায় ভোগ্য যা-কিছু, নিজেকে সেই জীবনোৎসবের ভিতরেই প্রতিষ্ঠিত দেখতে চেয়েছিলেন তিনি। চৈতন্যহীন জীবনোৎসব, কেবল দেহময়তা শরীরময়তা তার ভিতরেই আবহমান জীবনপ্রবাহ। 'উত্তর ফাল্গুনী'র 'দ্বন্দ্ব' কবিতাতেও সুধীন্দ্রনাথ মৃত্যুর এক-ই রকম অনিবার্য স্বরূপকে চিনেছেন। চিনেছেন প্রজ্ঞার ভিতর দিয়ে, যুক্তির ভিতর দিয়ে। প্রজ্ঞা, যুক্তির মাধ্যমে সুধীন্দ্রনাথ এ-কথাই মনকে বোঝাতে চান যে একমাত্র মৃত্যুই এই পৃথিবীতে নিশ্চিত, বিশ্বজগতের সর্বত্রই সতত চলেছে মৃত্যুলীলা। এই মৃত্যু তরঙ্গের ভিতর সালোক্য সাযুজ্য সঙ্গ সবকিছুই অর্থহীন, আত্মঘাতী আবর্তের স্রোতে মর্তচর সম্মোহিত মানুষ কেবল-ই ছুটে চলেছে লুব্ধকেন্দ্র নাস্তির শোষণের ভিতর। কিন্তু 'দ্বন্দ্ব' নামক সনেটটিতে মৃত্যুর এই অনিবার্য আধিপত্যকে মন স্বীকার করে নিলেও দেহ মেনে নিতে রাজী হয়নি। দেহ তার নিজের ধর্ম, বন্য জীবনোৎসবের ধর্ম পালন করবে। প্রজ্ঞা এবং যুক্তির ভিতর দিয়ে যে-সত্য উপলব্ধ হয় তাকে অতিক্রম করে দেহ তার প্রাকৃতিক প্রবণতায়, বন্য জীবনোৎসবের ভিতরেই মুক্তি খোঁজে, সন্দেহ জাগে হয়তো বা এই বন্যতা, এই চৈতন্যহীনতার ভিতরেই পরম সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায়:

> 'আজিকে দেহের পালা, রিক্ত শেজে শুয়ে তাই ভাবি
> হয়তো বা তারই কাছে প'ড়ে আছে অমরার চাবি।'
>
> ('দ্বন্দ্ব', 'উত্তরফাল্গুনী')

দেহ এবং মন, চৈতন্য এবং ইন্দ্রিয়ের এই দ্বন্দ্ব উভয় কবিরই দ্বন্দ্ব। মানুষের চেতনা অর্থহীনতা, বিপন্নতা, সর্বব্যাপী বিলুপ্তিকেই অনিবার্য মনে করে কিন্তু দেহের কাছে ইন্দ্রিয়-উন্মুখতাই চরম। চৈতন্য অথবা প্রজ্ঞা বারবার আমাদের সেই অন্ধকারের সামনে দাঁড় করায়, যে-অন্ধকারে অবলুপ্তিই একমাত্র সত্য। এই সর্বব্যাপ্ত তমসা, এই মৃত্যুচেতনা এর ভিতর থেকে মানুষকে জীবনানন্দ মুক্তি দিতে চেয়েছেন চৈতন্যরিক্ত ভোগময় উৎসবের ভিতর, সুধীন্দ্রনাথ দোলাচলে আহত হয়েছেন—হয়তো বা মৃত্যুর সামগ্রিক বোধের ভিতরে নয়, ইন্দ্রিয়-উৎসবের ভিতরেই জীবনের সার্থকতা।

হয়তো বা চার্বাক দর্শনের কথা সুধীন্দ্রনাথের এই প্রসঙ্গে মনে ছিল। চরমপন্থী বা ধূর্তচার্বাকদের মতো তিনি ইন্দ্রিয়নির্ভরতাকে অমরা অর্থাৎ পরম

বলে ভাবতে চেয়েছিলেন, যে চার্বাকরা মনে করতেন অঙ্গনাদির আলিঙ্গন জনিত সুখই পুরুষার্থ। চার্বাকদের মতো তিনিও সুখকে মৃত্যুচিহ্নিত ক্ষণিক বা স্বল্পকালীন বলে পরিত্যাগ করতে চাননি। মীনকেতুর লীলার ভিতর জন্ম-মরণ সবই একীভূত, মৃত্যুর কথা ভেবে, ক্ষণস্থায়িত্বের কথা ভেবে সুখ পরিত্যাজ্য নয়—মালতীফুলের আয়ু পলাশের তুলনায় অল্পস্থায়ী কিন্তু সেই কারণেই তা ত্যাগযোগ্য হতে পারে না।

কিন্তু কেবল বস্তুবাদী চার্বাকরা নয়, ইন্দ্রিয়-উন্মুখতা এবং ইন্দ্রিয়উর্ধ্ব এক বিশুদ্ধ চিত্তাবস্থাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা সুধীন্দ্রনাথের মনে একই সঙ্গে কাজ করেছে। মৃত্যুকে কখনো তিনি মনে করেছেন সেই বিশুদ্ধতাকে আস্বাদন করার উপায়, মৃত্যু নিখিল নাস্তির সমার্থক। কিন্তু মৃত্যু বাস্তবত কোনো বিশুদ্ধ অবস্থা নয়, মৃত্যুও বাসনাময়, লালসার মূর্ত বিভীষিকায় ক্লিষ্ট। জ্বলন্ত হৃদয়ধর্ম মৃত্যুকেও অতিক্রম করে; মানুষের মৃত্যু হয় কিন্তু তার বৃত্তি অমর, এক জন্ম থেকে অন্য জন্মে তা সংক্রমিত :

> 'নাই নাই মৌন নাই, সর্বব্যাপী বাঙ্ময় জগৎ ;
> নির্বাণ বুদ্ধির স্বপ্ন, মৃত্যুঞ্জয় জ্বলন্ত হৃদয় ;
> হয়তো মানুষ মরে, কিন্তু তার বৃত্তি বেঁচে রয় ;
> জন্ম হতে জন্মান্তরে সংক্রমিত প্রত্ন মনোরথ।'

(সৃষ্টিরহস্য : ক্রন্দসী)

বৌদ্ধদের মতো সুধীন্দ্রনাথও মৃত্যুকে এক সর্বাস্তিক বিনাশ বলে ভাবতে পারেন নি, মানুষের বৃত্তি, তার কর্ম অবিনশ্বর, দেহের অবলুপ্তির সঙ্গে-সঙ্গেই তার অবলুপ্তি হয় না। কর্ম এক অসীম শক্তি, নিঃশেষিত না-হওয়া পর্যন্ত সেই শক্তি কার্যক্ষম। মানুষের বাসনা যদি কোনো কাজের সম্পূর্ণতা চায়, তার মৃত্যুর পরেও সেই বাসনা জাগ্রত থাকবে এবং তার সম্পূর্ণতার জন্য কাজ করে চলবে। কর্মের তীব্র প্রবহমান শক্তি মৃত ব্যক্তির চৈতন্যকে পুনর্জন্ম দেবে নতুন জীবনে, নতুন দেহে, নতুন চৈতন্যে। মানুষের মৃত্যু হতে পারে কিন্তু তার বৃত্তি অমর, মৃত্যুর ভিতরেও তাই কোনো মুক্তির সম্ভাবনা নেই। মৃত্যুর প্রশান্তি যখন দক্ষিণে এবং বামে অর্থাৎ মৃত্যুর প্রশান্তির ভিতর যখন অবগাহন, সামনে যখন নিখিল নাস্তি, শূন্যতা, পিছনে অবচ্ছিন্ন নীরবতা, যখন অন্তর এবং বাহির জনহীন তখনও শরীর কণ্টকিত করে তোলে অবচেতনার নিম্নভূমিতে জাতিস্মর চৈতন্য :

সম্মুখে নিখিল নাস্তি ; পৃষ্ঠদেশে মৌন নীরবতা ;
প্রশান্তি দক্ষিণে, বামে ; জনহীন অন্তর, বাহির।
তবু কার আবির্ভাবে কণ্টকিত আমার শরীর
অবচেতনার তলে গুমরে কী জাতিস্মর কথা ?

(সৃষ্টিরহস্য : ক্রন্দসী)

মৃত্যুর ভিতরে মুক্তি তাই কপোল কল্পনা মাত্র এবং আসক্তির পরিবর্জনও অসাধ্য কর্ম যেহেতু কর্মস্রোত অনতিক্রমণীয়। মৃত্যুর ভিতরে মুক্তি নেই ; সৃষ্টি, বিশ্বসংসার কামের পরিতৃপ্তি অর্থাৎ আদিম বন্য শরীরধর্মের ভিতরেই আবর্তিত, ইন্দ্রিয়ের অলঙ্ঘনীয় প্রতাপই একমাত্র : 'সৃষ্টির রহস্য মাত্র আলিঙ্গন, পুনরালিঙ্গন'।

এমনকী নির্বাণেও মুক্তি নেই, নির্বাণ কেবল 'বুদ্ধির স্বপ্ন', অর্থাৎ নির্বাণের কল্পনা কেবল প্রজ্ঞার ভিতর দিয়েই উপলব্ধ হতে পারে, বাস্তবত তাকে লাভ করা যায় না, হৃদয়ধর্ম, ইন্দ্রিয়ধর্মই শাশ্বত। নির্বাণ—চৈতন্যের মুক্ত অবস্থা, মানুষের অন্তঃপ্রকৃতির প্রশান্তি, আধ্যাত্মিক জ্যোতির্ময়তার পরম আবেগী উদ্ভাস সবকিছুই অলভ্য, স্বপ্নের মতোই অলীক। মৃত্যু নয়, নির্বাণ নয়, মানুষের সহজাত ইন্দ্রিয়বৃত্তির ভিতরেই সৃষ্টির প্রকৃত রহস্য।

'সৃষ্টিরহস্য' রচনার দেড়বছরের মতো সময় আগে সুধীন্দ্রনাথ অবশ্য নির্বাণের ভিতর মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন। মৃত্যু যে স্বপ্নগর্ভ, সখার সংসর্গে দুঃস্থ অর্থাৎ অনুষঙ্গময়, আত্মীয়ের বিলাপে বিহ্বল অর্থাৎ বাসনাময় তা তিনি বুঝেছিলেন। 'নিগু'ণ নির্বাণ', চৈতন্যের সেই মুক্তাবস্থা তিনি কামনা করেছিলেন যে মুক্তাবস্থায় ব্যক্তিসত্তা সমষ্টির কলুষ মুছে নিজের কেন্দ্রে ভারমুক্ত একক স্বাধীন অপ্রভাবিত বিশুদ্ধতায় প্রতিষ্ঠ হতে পারবে ; সেই বিশুদ্ধতাকে অর্জনের জন্য প্রয়োজন বৈরিতা, প্রয়োজন ঘৃণা, প্রয়োজন সেই সর্বনাশের যা আবহমান সংস্কারলাঞ্ছিত সমষ্টিকেন্দ্রিক স্থিতাবস্থাকে খানখান করবে :

চাহি না মৃত্যুরে আমি ; স্বপ্নগর্ভ সেও নিদ্রাসম,
সখার সংসর্গে দুঃস্থ, আত্মীয়ের বিলাপে বিহ্বল।
হানো তীক্ষ্ণ সর্বনাশ, তীব্র ক্ষতি, বৈরিতা নির্মম ;
জুগুপ্সার শক্তি দাও, দাও মোরে নিগু'ণ নির্বাণ।

(প্রত্যাখ্যান : ক্রন্দসী)

'প্রত্যাখ্যান' কবিতায় অসহায় ব্যক্তি-মানুষ অনুভব করেছিল তার যাবতীয় প্রবণতা, ইন্দ্রিয়াকর্ষণ, সৌন্দর্যবোধ, সামাজিক মূল্যবোধ সবকিছুই পূর্বনির্ধারিত যান্ত্রিকতা। ব্যক্তিমানুষের কোনো স্বতন্ত্র উজ্জীবন নেই, সবকিছুই সমষ্টিগত প্রবণতার ভিতর অন্ধ সমর্পিত :

সহে না সহে না আর জনতার জঘন্য মিতালি।
প্রণয়ের মমত্ববন্ধনে,
পতঙ্গের সাম্যবাদে, কৃপাজীবী ক্লীবের ক্রন্দনে,
হে ভৈরব জীবন দুঃসহ। (প্রত্যাখ্যান : ক্রন্দসী)

ব্যক্তিসত্তার মুক্তি কোনোখানে নেই। প্রকৃতি, সমাজ সবকিছুই সমষ্টির যান্ত্রিক যৌথ রীতিনিয়ন্ত্রিত জঘন্যতায় আবিল। নির্গুণ নির্বাণের ভিতরে, অনুসঙ্গহীন স্মৃতিহীন চৈতন্যের ভিতরেই হয়তো ব্যক্তিসত্তা তার স্বাভাবিক প্রকাশকে লাভ করতে পারবে, 'প্রত্যাখ্যান' কবিতায় সুধীন্দ্রনাথ এইরকম ভেবেছিলেন, তাই ঘৃণা এবং বিক্ষোভের ভিতর সবকিছুকেই প্রত্যাখ্যান, এমনকী মৃত্যুকেও।

'সৃষ্টিরহস্য' কবিতায় 'সৃষ্টির রহস্য মাত্র আলিঙ্গন, পুনরালিঙ্গন', এই ঘোষণা মনে হয় অসহায়ের হাহাকার। ব্যক্তিসত্তার দেশ-কাল-পাত্রহীন নিরালম্ব জাগরণ মৃত্যুর ভিতরে খুঁজে পেতে চাওয়া এবং সেখানে ব্যর্থতা, নির্বাণও 'বুদ্ধির স্বপ্ন'—পতঙ্গের সাম্যবাদ থেকে, সমষ্টির চৈতন্যহীন যান্ত্রিক যূথবদ্ধতা থেকে মুক্তি কোথাও নেই। সংসারের নির্বোধ সংঘাতে চীর্ণ দীর্ণ হৃদয় মৃত্যুর ঘনান্ধকারে উদার নির্বাণ খুঁজে পেতে চায় কিন্তু তাকে প্রলোভিত করে প্রথাগত সৌন্দর্যসম্ভার। সেইখানে আনন্দ কিন্তু সেই আনন্দিত অনুভবের ভিতরে 'পলে পলে, প্রহরে প্রহরে' 'অশরীরী মানুষের দল' অনুপ্রবেশ করে। 'অশরীরী মানুষের দল' অর্থাৎ ঐতিহ্যানুসারী মানুষের অভ্যাস, তার সাম্যময় অনুভব ব্যক্তি মানুষের আনন্দ-অনুভবের শিকড় একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে। ব্যক্তির আনন্দ সমষ্টির আনন্দের সঙ্গে একীভূত হয়। ব্যক্তির মুক্তি কোথাও নেই, মৃত্যুর ভিতরেও নেই—মৃত্যুর একপারে প্রেতগণ অর্থাৎ অতীত জটলা পাকায়, অন্যদিকে কর্মস্রোতের ভিতর দিয়ে মৃত্যুর সঙ্গে জীবনের, ভবিষ্যতের সেতুবন্ধ রচনা করার কাজ চলতে থাকে :

প্রেতগণ
জটলা পাকায় হেথা বৈতরণীতীরে ;

জন্মান্তরের খেয়া ঘাটে ভিড়ে ;

পরপারে কপিসেনা করে সেতুবন্ধের সূচনা।

(মৃত্যু : ক্রন্দসী)

কর্মের গতি অব্যাহত। নির্বাপিত হবার আগে যেমন একটি প্রদীপ শিখা নতুন প্রদীপ শিখাকে জ্বালিয়ে দেয়, মুমূর্ষু চৈতন্য তার সমস্ত অতীত কর্মভার নিয়ে সেইরকম জন্ম নেয় নতুন চৈতন্যের ভিতর। মুমূর্ষু চৈতন্য অতীত-অতিক্রমী কোনো বিশুদ্ধ সত্তা নয়, তার ভিতরে অতীত কর্মক্রিয়ার সংস্কার কাজ করে, নবজাত চৈতন্যের ভিতরেও সঞ্চারিত হবে মুমূর্ষু অতীত। মুক্তি কোথাও নেই, নেই বিশুদ্ধতা, নেই ব্যক্তিসত্তার অন্যনিরপেক্ষ উজ্জীবন।

'মৃত্যু' কবিতায় 'বামনের এ-সমষ্টিবাদ' থেকে সুধীন্দ্রনাথ মুক্তি খুঁজেছেন প্রকৃতির মৌল শুভ্র বিস্তীর্ণতায়। মৃত্যু বা নির্বাণ নয়, অকলুষ বিশুদ্ধতাই তাঁর অন্বিষ্ট, স্মৃতিহীন, অনুষঙ্গহীন, বাসনাহীন, ঘাতপ্রতিঘাতরিক্ত জগৎ-ই তাঁর আকাঙ্ক্ষার। এ প্রায় আদিম উৎসে ফিরে যাওয়ারই সংকল্প। মৃত্যু নয়, মৃত্যু স্বপ্নগর্ভ, অনুসঙ্গপীড়িত, বাসনাবিহ্বল ; নির্বাণ নয়, নির্বাণ অসাধ্য-প্রয়াস, প্রজ্ঞার কপোল কল্পনা—প্রকৃতির আদিমতার ভিতর মানুষ হয়তো তার বিশুদ্ধ জাগরণকে খুঁজে পাবে :

তোমার প্রমাদে, *

হে বসুধা, আবার ফিরায়ে লও মোরে।

হয়তো সেখানে আজও স্বতন্ত্রতা মিলে মাঝে মাঝে :”

(মৃত্যু : ক্রন্দসী)

'সোনার তরী'র 'বসুন্ধরা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাবর্তন মাতৃগর্ভে প্রত্যাবর্তনেরই সমার্থক ; বসুন্ধরা, তার মৃত্তিকাই আদিম উৎস :

'আমারে ফিরায়ে লহ অয়ি বসুন্ধরে,

কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে

বিপুল অঞ্চল-তলে। ওগো মা মৃন্ময়ী,

তোমার মৃত্তিকা-মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই ;

(বসুন্ধরা : সোনার তরী)

* 'প্রমাদ' সভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রমাদ। সভ্যতা বসুধার আদিম প্রাণোৎসবকে প্রমাদ বা ভ্রান্তি বলেই মনে করবে, কিন্তু সেই প্রমাদই চাওয়ার।

'মৃত্যু' কবিতাটি রচনার সময় সুধীন্দ্রনাথের 'বসুন্ধরা' কবিতাটির কথা মনে ছিল; মৃত্যু বা নির্বাণ নয়, মুক্তির প্রয়োজনে আদিম প্রাণোৎসবেরই তিনি শরণ নিয়েছিলেন।

মৃত্যু-চেতনা সুধীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্যজীবন ব্যাপ্ত ক'রে ছিল। প্রথম জীবনে, কৈশোরে রচিত 'অসময়ে আহ্বান' কবিতায় তিনি মৃত্যুকে দূরে রাখতে চেয়েছিলেন—তখন স্বপ্ন ছিল, আশা ছিল। মৃত্যু নয়, তখন শূন্যবাদে দীক্ষা গ্রহণ নয়, তখনও ধ্যানে মানসীর নিয়ত আগমন। অত্যাচারের বিরুদ্ধে, অপ্রতিহত মিথ্যার বিস্তারের বিরুদ্ধে তখনও কর্তব্য সমাপন বাকি, তাই মৃতুর কাছে প্রার্থনা 'অনুমতি দাও আরও কিছুকাল থাকি'। প্রথম জীবনে রচিত 'তন্বী'র কবিতাতেও জীবহ-যৌবন-প্রেম মৃত্যুর তুলনায় অনেক বেশী কাম্য। মৃত্যু অজ্ঞাত, অন্ধ, অসুন্দর, ক্রূর, তাকে কাম্য মনে করা ভ্রান্তিজনক সিদ্ধান্তেরই ফল (অপলাপ : তন্বী)। 'অসময়ে আহ্বান' কবিতায় জীবন আসক্তিময়, যেমন 'অর্কেস্ট্রা'য় জীবন মূলত স্বপ্নময়, প্রত্যাশাউন্মুখ। 'অর্কেস্ট্রা'র 'নাম' কবিতায় 'কাম্য শুধু স্থবির মরণ', কিংবা 'অর্কেস্ট্রা' নামের কবিতায় 'মৃত্যু, কেবল মৃত্যুই ধ্রুব সখা' প্রেমের তীব্রতা এবং ব্যর্থতার ফেনিলতা থেকে জাত। মৃত্যু সেখানে সাকল্যিক অর্থেই মৃত্যু, তার আর অন্য কোন তাৎপর্য নেই। 'উত্তর ফাল্গুনী'র 'মরণতরণী' এবং 'মহানিশা'তেও মৃত্যুকে সাধারণিক অর্থেই গ্রহণ করা হয়েছে। 'মহানিশা' কবিতায় ক্ষণিক ভোগকেই তিনি মৃত্যুর প্রসাদে চিরস্থায়িত্ব দিতে চেয়েছেন। 'মরণ' এখানে একটি উপায় মাত্র যার সহযোগে তিনি তাঁর ভোগনিবিড় নিশীথিনীকে শাশ্বত করবেন, পুরূরবাদেব মতো ক্ষণিক ভোগের পর পলাতক উর্বশীর জন্য হাহাকার নয়, মৃত্যুর ভিতর দিয়েই তিনি উর্বশীর আলিঙ্গনকে চিরস্থায়ী করতে চান। 'মহানিশা' কবিতায় মৃত্যুচেতনা বড়ো কথা নয়, প্রথম কথা ভোগ, ইন্দ্রিয়াসক্তি; মৃত্যু ভোগবিহ্বল রাত্রির উপর যবনিকা টেনে তাকে তার ক্ষণস্থায়িত্ব থেকে মুক্ত করুক এটাই চাওয়ার।

'মরণতরণী' কবিতা মর্তমানুষের একাকিত্বের কবিতা। 'অপার দ্বৈপসাগরে মর্তমানুষ একা বাস করে', এরই প্রতিধ্বনি শোনা যাবে 'দশমী'র 'প্রতীক্ষা' কবিতায় 'বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী'। মানুষ জন্মসূত্রেই একাকী, একক অস্তিত্ব; দ্বৈপসাগরের অধিবাসী মানুষ অপর মানুষের সঙ্গে সংযোগহীন তাদের পরস্পরের মধ্যে নেই কোনো হৃদয়-বিনিময় :

আমার প্রেমের অর্ঘ্যপ্রদানে
অপারগ সেও, জানি ;
আমিও বুঝি না সে-মূক নয়নে
লিখিত কী গূঢ় বাণী।
বাহিরে তাকায়ে সে যে দেখে শুধু
চারিপাশে মোর মরু করে ধু-ধু ;
আমি অবলোকি তার করপুটে
দলহীন মালাখানি। (মরণতরণী : উত্তর ফাল্গুনী)

মানুষের সঞ্চয়, যখন বিনিময়হীন, তখন তার কোনো মূল্য নেই, একমাত্র মৃত্যুর ভিতরে, নিরুদ্দেশ অমার ভিতরে অবলুপ্তিতেই তার পরিণতি। একাকিত্বের বেদনা, বিনিময়হীন হৃদয়ের ভার লাঘব করার জন্যই মৃত্যুর শরণ নেওয়া।

মৃত্যু-চেতনা সুধীন্দ্রনাথের সমস্ত জীবন ব্যাপ্ত করে ছিল। এই মৃত্যু-চেতনার পটভূমিতে কাজ করেছে কখনো ব্যক্তিমানুষের একাকিত্ব, সমষ্টি চেতনার সংকট, ইন্দ্রিয় আর চৈতন্যের দ্বন্দ্ব, অলঙ্ঘনীয় কর্মস্রোত ও বিশুদ্ধ চৈতন্য-অর্জনের বিরোধ। কবিতা-রচনার শেষ পর্যায়ে 'দশমী'র কয়েকটি কবিতায় সুধীন্দ্রনাথ মৃত্যুর অন্য তাৎপর্যের কথা ভেবেছিলেন। ("আমার বিশ্বাস জীবন মরণে পূর্ণ এবং মৃত্যুর সামনে না আসা পর্যন্ত ব্যক্তি আপনার স্বরূপ চেনে না" *) সুধীন্দ্রনাথের এই মনোভাব, তাঁর ভাষায়, 'অতিযুক্তিক' হলেও দশমীর প্রসঙ্গে তা নিশ্চিত অর্থবহ। 'জীবন মরণে পূর্ণ' বলতে সুধীন্দ্রনাথ যা বলতে চেয়েছেন তা মনে হয় তাঁর ক্ষণবাদেরই রকমফের :

আমি ক্ষণবাদী : অর্থাৎ আমার মতে হয়ে যায়
নিমেষে তামাদী আমাদের ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ, তথা
তাতে যার জের, সে-সংসারও। (উপস্থাপন : দশমী)

রবীন্দ্রনাথ 'প্রভাতসংগীতে'র 'অনন্ত মরণ' কবিতায় মৃত্যুকে একইরকমভাবে বুঝেছিলেন :

কোটি কোটি ছোটো ছোটো মরণেরে লয়ে
বসুন্ধরা ছুটিছে আকাশে।

* সুধীন্দ্রনাথের পত্র। শতভিষা : পঞ্চত্রিংশ সংকলন

হাসে খেলে মৃত্যু চারিপাশে।
এ ধরণী মরণের পথ।
এ জগৎ মৃত্যুর জগৎ। (অনন্ত মরণ : প্রভাত সংগীত)

রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন যে জীবন এবং মরণ সমার্থক, 'জীবন যাহারে বলে মরণ তাহারি নাম', প্রতিমুহূর্তের মৃত্যুর ভিতর দিয়ে অতীতের হাত ধরে ধরে জীবন এগিয়ে চলে। 'দশমী'তে সুধীন্দ্রনাথ এক চির মুহূর্তের কথা বলেছেন যেখানে 'যা কিছু প্রত্যক্ষ, তা তো আছেই, যা দূর, যা অনাগত, যা অতীত তাও অন্তত ভাবচ্ছবিরূপে উপস্থিত।'* মানুষ ক্ষণস্থায়ী, নাস্তিরই অংশভাক্ তবুও সে চির মুহূর্তের ভিতর অনন্ত বর্তমান। বর্তমানের ভিতর মিলেছে নাস্তি, বর্তমানের স্মৃতির ভিতর অতীত এবং বর্তমানের স্বপ্নের ভিতর ভবিষ্যৎ। ক্ষণস্থায়ী, মৃত্যুনির্দিষ্ট. নাস্তির অংশভাক্, হলেও মানুষের এই চির মুহূর্তে আটকে থাকতে আপত্তি কি?

পরিপূর্ণ বর্তমান : নাস্তি সুদ্ধ তার অংশভাক্;
ভূত অধুনার স্মৃতি, উপস্থিত স্বপ্ন ভবিষ্যৎ;
(ভূমা : দশমী)

মনে পড়তে পারে 'কল্পনা'র 'বসন্ত' করিতাটির কথা, যেখানে অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথ এক অখণ্ড সময়কে উপলব্ধি করেছেন। 'কল্পনা'র 'বর্ষামঙ্গল' 'স্বপ্ন' ও 'বসন্ত' কবিতা তিনটি এক বৃত্তের মধ্যে নিয়ে এলে রবীন্দ্রনাথের এই অখণ্ড সময়চেতনার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাবে। 'প্রভাত সংগীতে'র 'অনন্ত মরণ' কবিতায় বর্তমান যে অতীতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী তা রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন :

যতটুকু বর্তমান তারেই কি বল প্রাণ?
সে তো শুধু পলক নিমেষ।
অতীতের মৃত ভার পৃষ্ঠেতে রয়েছে তার,
না জানি কোথায় তার শেষ।
(অনন্ত মরণ : প্রভাত সংগীত)

অতীতের মৃত ভার পিঠে বহন করে এই বর্তমান যে ভবিষ্যতের দিকে চলেছে তার ঘোষণা আছে কল্পনার 'বসন্ত' কবিতায়।

শতভিষা : পঞ্চত্রিংশ সংকলন

এই অখণ্ড সময়চেতনা, 'দশমীর' 'প্রতীক্ষা" কবিতার বেষ্টনী বিরহিত অসীম বিবিক্তি, নির্লিপ্ততার ভিতর সুধীন্দ্রনাথ একে চিনেছিলেন। মহাশূন্যের নিস্তব্ধতার ভিতর থাকে কেবল বর্তমান, যে বর্তমানের ভিতর অতীত এবং আগামী নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ('অধুনায় নিশ্চিহ্ন অতীত, আগামী')। সেই অখণ্ড সময়ের ভিতর সবকিছুই অর্থহীন, নাস্তিও সেখানে হয়ে যায় নেতিবাচক, মনোরথ, মন সেখানে কাজ করে না—মৃত্যু নেই, মন, সংস্কার-চিহ্নিত চিন্তা-ভাবনা সেখানে বিশুদ্ধ চৈতন্যের উপর আসে না আধিপত্য করতে। এই চির মুহূর্ত, মৃত্যুহীন চির মুহূর্ত, এরই ভিতর মানুষ আশ্রয় পেতে পারে কিনা, 'দশমী'র, 'ভূমা' কবিতায় সুধীন্দ্রনাথ সেই জিজ্ঞাসায় মেতেছিলেন।

'মৃত্যুর সামনে না আসা পর্যন্ত ব্যক্তি আপনার স্বরূপ চেনে না' এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যাবে 'দশমী'র 'নৌকাডুবি' কবিতায়:

তথাচ অভাবে যবে তলাবে নাবিক,
তখনই তো স্মৃতির বিদ্যুতে
পাবে সে নিজের দেখা, তার পরে মিশে আদিভূতে,
হবে স্বাভাবিক।

(নৌকাডুবি: দশমী)

মৃত্যুলগ্নে, জলমগ্ন হবার পূর্বমুহূর্তে স্মৃতির বিদ্যুৎ উদ্ভাসিত হবে, পান্থ লাভ করবে আত্মপরিচয়। প্রসিদ্ধি এই যে, জলমগ্ন মানুষ মৃত্যুর ঠিক আগের মুহূর্তে তার সমগ্র জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়, অন্যভাবে সে তার স্বরূপকে চেনে। মৃত্যুর আগের মুহূর্তের নিরাসক্তি উদ্ভাসিত করে তোলে স্বরূপকে। 'মৃত্যুর আগে' কবিতায় জীবনানন্দ এক-ই অনুভবআশ্রিত। মৃত্যুর আগে সমগ্র জীবন বিশ্বপ্রকৃতি তার অন্তরালের বিচিত্র তাৎপর্য নিয়ে উপস্থিত; স্মৃতিময় মৃত্যু, চিত্রময় মৃত্যু; টুকরো টুকরো বিচিত্র বর্ণ-দৃশ্য যা জীবনকে ঘিরে রচিত হয়েছিল সবই মৃত্যুর প্রাক্‌মুহূর্তে উদ্ভাসিত, সেইখানে আপন স্বরূপকে চেনা, এই স্বাভাবিক অনুভব যে সমস্ত রক্তিম আকাঙ্ক্ষার উপরই মৃত্যুর স্পর্শ অবাধ এবং অনিবার্য।

'নৌকাডুবি' কবিতায় স্বপ্ন এবং স্মৃতি নিয়ে যে পান্থ শান্তি, শান্ততার ভিতর পথ চলছিল তার সামনে সহসা মৃত্যুময় তামস রজনী এসে উপস্থিত হয়। সেই অন্ধকারে আর কিছুই থাকে না, একমাত্র সম্বল 'মজ্জমান সাধের তরণী'

অর্থাৎ মৃত্যু অভিমুখী সত্তা, যার কোনো দিশা নেই, যার কাছে ধ্রুবতারা এবং চুম্বক উভয়ই নিরর্থক। মৃত্যু নিশ্চিত কিন্তু সাধের তরণী ডুবে যাবার পর অর্থাৎ সত্তা বিনষ্ট হবার পূর্বমুহূর্তে নিজের স্বরূপকে উপলব্ধি করবে, নিজেকে জানবে এবং এই জানার ভিতর দিয়ে সে অর্জন করবে তার স্বাভাবিকতাকে। এই আত্মপোলব্ধি, মৃত্যুর কাছে এসেই মানুষ একে অর্জন করতে পারে, এটাই মৃত্যুর উপহার।

চির মুহূর্তের কল্পনার ভিতর সুধীন্দ্রনাথ মানুষের ক্ষণস্থায়িত্বের, মৃত্যুর অন্ত তাৎপর্য উপলব্ধি করেছিলেন। আত্মোপলব্ধি, যা মৃত্যুর উপহার, তার ভিতর দিয়েই মানুষ অর্জন করবে তার স্বাভাবিকতাকে, স্ব-ভাবকে, সুধীন্দ্রনাথ এই কথা উপলব্ধি করেছিলেন। এই অখণ্ড অনন্ত সময়চেতনা এবং আত্মোপলব্ধির উদ্ভাস এর ভিতর দিয়েই অগ্রসর হয়েছে তাঁর তরী।

'ভ্রষ্টতরী' কবিতায় নিরবলম্ব নিখিলে একা ভেসে যায় যে নৌকা, সে নিরুদ্দেশের যাত্রী, বাসনাহীন স্বপ্নহীন তার অভিযাত্রা, কোনো প্রলোভনই তার কাছে আকাঙ্ক্ষনীয় নয়, তার যাত্রার আদি নেই, অন্ত নেই, সে কেবল বাঁধা রয়েছে অধুনা অর্থাৎ বর্তমানে। এই যাত্রা, এই তরঙ্গহীন কোলাহলহীন যাত্রা, এই মৃত্যু-অভিসার, এই-ই সেই শূন্যতা, সুধীন্দ্রনাথ যাকে আজীবন অন্বেষণ করেছেন। অনুষঙ্গহীন এই অভিযাত্রা, স্বপ্ন ও স্মৃতিরিক্ত এই অভিযাত্রা :

> একদা কত কী ভর করেছিল তাতে—
> স্বপ্ন ও স্মৃতি, পর্বত পরিমাণ ;
> মহার্ণবের দারুণ ঝঞ্ঝাবাতে
> কিঞ্চিৎও শেষে পায়নি পরিত্রাণ॥ (ভ্রষ্ট তরী : দশমী)

'ভ্রষ্ট তরী'তে সুধীন্দ্রনাথ কি মৃত্যুর কথা বলেছেন, না কি নির্বাণের কথা? যাকে 'নির্গুণ নির্বাণ' ভেবে লাভ করার জন্য আকুল হয়েছিলেন, 'সৃষ্টিরহস্য' কবিতায় যাকে 'বুদ্ধির স্বপ্ন' বলে পরিত্যাগ করেছিলেন, শেষজীবনে 'দশমী'র কবিতায় তাকেই কি অর্জন করতে পেরেছিলেন তিনি? লক্ষ্য করতে হবে "নিরুদ্দেশের যাত্রী আমার তরী", আমি নয়, আমি নিরুদ্দেশের যাত্রী নই, নিরুদ্দেশের যাত্রী কেবল আমার তরী ; আমি রিক্ত অর্থাৎ আমার সকল সংস্কারহীন কেবল আমার অভিযাত্রা, কেবল যাওয়াটুকু। এই কি নির্বাণ? সারাজীবন দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ সংগ্রামের পর, যুক্তি-চেতনার দোলাচলের পর জীবনের প্রান্তদেশে এসে তাকেই লাভ করা?

অশ্রুকুমার সিকদার

'রূপকারী বিবেক' : সুধীন্দ্রনাথের কবিতার পাঠান্তর

সুধীন্দ্রনাথের কাব্যসংগ্রহের ভূমিকায় বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন, 'তিনি (অর্থাৎ সুধীন্দ্রনাথ) প্রথম থেকেই বুঝেছিলেন…যে কবিতা লেখা ব্যাপারটা আসলে জড়ের সঙ্গে চৈতন্যের সংগ্রাম, ভাবনার সঙ্গে ভাষার ও ভাষার সঙ্গে ছন্দ, মিল ও ধ্বনিমাধুর্যের এক বিরামহীন মল্লযুদ্ধ।' কবি সুধীন্দ্রনাথের এই বিরামহীন মল্লযুদ্ধের কিছু প্রমাণ আছে তাঁর কবিতাবলীর পৌনঃপুনিক পাঠান্তরে। এই দিক থেকে সুধীন্দ্রনাথ কবি ইয়েটসের সগোত্র। ইয়েটসের মতো তিনিও আদমের অভিশাপ, মাথার ঘাম পায়ে ফেলার, কবিতা লেখার জন্যে পরিশ্রমের আবশ্যিক শর্ত সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন এবং ইয়েটসের মতোই তিনি সেই শর্ত পরম নিষ্ঠায় কবিজীবনে পালন করে গেছেন। সুধীন্দ্রনাথের কবিতার পাঠান্তর সমূহের আলোচনা করলে, তিনি সার্থকতার সন্ধানের কী ধৈর্য কী শ্রমের সঙ্গে কবিতার বাক্যাংশ শব্দ মিল নিয়ে বারবার 'Stitching and unstitching' করতেন তার বিস্ময়কর প্রমাণ পাওয়া যায়। ইয়েটসের 'A line will take us hours may be,' এই উক্তির সমর্থন পাই সুধীন্দ্রনাথের কবিজীবনে। যখন তাঁর নিজের বিবৃতি থেকে জানি একদা তিনি 'উড়ে চলে গেছে' এই অপরিচ্ছন্ন ক্রিয়ার 'উড্ডীন' বিশেষণে রূপান্তরের চেষ্টায় সারা সন্ধ্যা ব্যয় করে রবীন্দ্রনাথের সপ্রশংস বিস্ময় জাগিয়েছিলেন। শব্দপুঞ্জের মধ্যে ধ্বনিমাধুর্যের উচ্চারণ জাগাতে গেলে, তার লক্ষ্যকে অব্যর্থ করতে হলে যে শারীরিক শ্রমের চেয়ে বেশি পরিশ্রম ও প্রযত্নের মূল্য দিতে হয় ; একথা ইয়েটসের মতো সুধীন্দ্রনাথও জানতেন।

'অর্কেস্ট্রা'-র দ্বিতীয় সংস্করণ তৈরির সময় প্রথম সংস্করণের পাঠের উপর সুধীন্দ্রনাথ অনেক কলম চালিয়েছিলেন। তাতেও তাঁর সংস্কার ও সংশোধন প্রবণতা ক্ষান্তি মানে নি। 'তৃতীয় সংস্করণের জন্য সুধীন্দ্রনাথ স্থানে স্থানে অর্কেস্ট্রার পরিমার্জনা করছিলেন, বর্তমান কাব্যসংগ্রহে সেই সব পরিমার্জিত

পাঠই গৃহীত হয়েছে।' 'ক্রন্দসী' সম্বন্ধেও প্রকাশক জানিয়েছেন 'দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য সুধীন্দ্রনাথ 'ক্রন্দসী'র পরিমার্জনা আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেন নি। 'সন্ধান' ও 'যাদুঘর' কবিতা দুটির আদ্যন্ত এবং 'সৃষ্টিরহস্য' 'প্রত্যাখ্যান' ও 'বর্ষপঞ্চকের' আংশিক পরিমার্জনা সম্পূর্ণ হয়েছিল। এই আত্মছিদ্র-সন্ধানী ও আত্মসংশোধনে তৎপর লেখনীর হাত থেকে 'সংবর্ত' নামক কাব্যগ্রন্থটিও সম্পূর্ণ পরিত্রাণ পায় নি। 'সংবর্ত' গ্রন্থের সঙ্গে একত্র প্রকাশিত 'প্রাক্তনী' পর্যায়ের কৈশোরক কবিতাগুলি তো আদ্যপান্ত পুনর্লিখিত। এক-আধটা বাদ দিলে 'প্রতিধ্বনি'-র প্রতিটি অনুবাদ কবিতায় আদি রচনা ও পরিমার্জনার তারিখ দেওয়া আছে এবং দুই তারিখের মধ্যে দশ থেকে বিশ বৎসরের ব্যবধান। এই এক বা দুই দশক ধরে সুধীন্দ্রনাথের সক্ষম লেখনী যে আদি রচনার তারিখ থেকে কত সংস্কার, পরিমার্জনা, ও পর্যায়ের পর পর্যায় সংশোধনের মধ্য দিয়ে শেষ তারিখের সার্থকতায় কবিতাগুলিকে উত্তীর্ণ করেছিল সে শুধু আমরা অনুমান করতে পারি। সুপরিচিত 'শাশ্বতী' কবিতার কয়েকটি চরণের পরিবর্তন-পর্যায় লক্ষ্য করলে এই দীর্ঘ শ্রম ও ধৈর্যসাধ্য প্রক্রিয়ার কিছুটা আমরা উপলব্ধি করতে পারব। কাব্যসংগ্রহের সঙ্গে প্রকাশিত 'শাশ্বতী' কবিতার পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি থেকে আমরা আলোচ্য চার চরণের তিনটি পরিবর্তিত রূপ পাই।

প্রথম রূপ—একটি পণের অমিত প্রগলভতা
মৃন্ময় দীপে জ্বেলে দিল ধ্রুবতারা।
একটি বিদায় রচিল যে শূন্যতা
লক্ষ সাহারা গোবি তাহে দিশাহারা।

দ্বিতীয় রূপ—মুমূর্ষু দীপে জ্বেলে দিল ধ্রুবতারা
একটি অমিত বিদায় ক্ষিপ্ত পণে
বিধাতা স্বয়ং নাস্তিতে হল সারা
একটি হিয়ার অবল বিস্মরণে।

তৃতীয় রূপ—একটী পণের অমিত প্রগলভতা
মর্ত্যে আনিল ধ্রুবতারকায়ে ধরে
একটি স্মৃতির মানুষী দুর্বলতা
প্রলয়ের পথ দিল অবারিত করে।

এই শেষ রূপই গৃহীত হইয়েছিল 'অর্কেস্ট্রা'-র প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে। কিন্তু কাব্যসংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত তৃতীয় সংস্করণে আরো একটা পরিবর্তন আমরা পাই।

একটি পণের অমিত প্রগলভতা
মর্ত্যে আনিল ধ্রুবতারকারে ধরে
একটি স্মৃতির মানুষী দুর্বলতা
প্রলয়ের পথ ছেড়ে দিল অকাতরে।

এই ক্রমাগত পরিবর্তন পরিমার্জনা ও সংস্কার—কখনো একটি শব্দের, কখনো একটি বাক্য বা স্তবকের, কোনো বিরলক্ষেত্রে এমন কী সম্পূর্ণ কবিতার —এই কাজে সুধীন্দ্রনাথকে উৎসাহ দিয়েছে, তিনি নিজেই বলেছেন, তাঁর বিবেক। এই অনলস সংস্কারসাধনের সপক্ষে সুধীন্দ্রনাথ বিবেকের দোহাই দিয়েছেন, একবার নয়, বারংবার। 'সংবর্তে'-র মুখবন্ধে তিনি জানিয়েছেন, 'সংস্কারসাধ্য জেনে কোনো রচনাকে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী আকার দিতে আমার বিবেকে বাধে।' অথচ বিবেকের বশে কবিতার সার্থকতাই একমাত্র অম্বিষ্ট হলে এবং যেখানে সার্থকতা অর্জিত একমাত্র সেই কবিতাই স্থায়ীরূপ পেলে কবির পরিণতি-সাপেক্ষ যে ব্যক্তিত্ব তার বিবর্তন-ইতিহাসের স্বাক্ষর থাকে না এবং তাহলে কবির ভাবনা ও ভাষার বিবর্তন ও ক্রমপরিণতি নিয়ে সমালোচনার যে ব্যস্ততা তাও নিতান্ত নিরর্থক হয়ে পড়ে। এই ব্যাসকূট যে সুধীন্দ্রনাথ জানতেন না তা নয়।

কিন্তু পরিণতির ইতিহাস কাব্যশরীরে বজায় রাখার চেয়ে এই বিবেক-পীড়িত কবি যা 'আদ্যন্ত অনবদ্য' তার সন্ধানে একনিষ্ঠতাকে বেশি মূল্য দিয়েছিলেন, যদিও তিনি জানতেন মানুষের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিও অসম্পূর্ণ এবং এমন শিল্পসামগ্রী বিরল যার শ্রীবৃদ্ধি অভাবনীয়। সেই আদ্যন্ত অনবদ্যের যথাসাধ্য নিকটে পৌছোনোর দুরূহ সাধনায় তিনি ব্রতী ছিলেন বলে 'সংবর্তে'র মুখবন্ধে তিনি স্পষ্ট লিখেছিলেন, 'কবিতাবিশেষের জন্মকালে পাঠকের প্রয়োজন নেই, তার পরিচ্ছন্ন রূপই সাধারণের বিচার্য।' সুধীন্দ্রনাথের মানসিক প্রবণতা কোন দিকে তা এই সূত্র থেকে এবং তাঁর ক্রমাগত সংস্কার প্রচেষ্টা থেকে সহজেই অনুমান করা যায়। তবু সুধীন্দ্রনাথ ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক কবিব্যক্তিত্বের বিবর্তন-ইতিহাস বজায় রাখার দাবি সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারেন নি। সেইজন্যেই বোধহয় কবিতাবিশেষের জন্মকালে পাঠকের প্রয়োজন নেই এবং 'পদ্যরচনায় তারিখের উল্লেখ আমার চক্ষে

আত্মস্খালনের হাস্যকর প্রয়াসমাত্র' ইত্যাদি উক্তি করা এবং তদনুযায়ী অনেকগুলি কাব্যের পূর্বসংস্করণে রচনা-তারিখ উহ্য রাখা সত্ত্বেও কাব্যসংগ্রহে রচনা-তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে। হয়তো তা সম্ভব হয়েছে কবির অনুপস্থিতির জন্য। অবশ্য কবি-ব্যক্তিত্বের এই বিবর্তন-ইতিহাস বজায় রাখার দায়িত্ব, জড়ের সঙ্গে চৈতন্যের সংগ্রামে কোন কালে কবি কতটা জয়ী হয়েছেন সেই বিজয়-ইতিহাস তৎকালীন কাব্যশরীরে রক্ষা করার এই দায়িত্ব অন্যত্র সুধীন্দ্রনাথ নিজেও আংশিকভাবে স্বীকার করেছেন। যারা পরিণতির স্বাক্ষর রক্ষা করার দোহাই দিয়ে পৌনঃপুনিক সংস্কারের প্রতিবাদ করেন সুধীন্দ্রনাথ তাদের 'সমর্থনে এই পর্যন্ত মানতে প্রস্তুত যে অতীত বৈকল্যের অস্বীকার, শুধু অপলাপ নয়, অবমাননারও চূড়ান্ত। কারণ ব্যক্তিস্বরূপ পরিণতি-সাপেক্ষ··· আপন পরিপূর্ণতার ধ্যানে ডুবে গেলে, কবিপ্রতিভার সর্বনাশ অনিবার্য।' (অর্কেস্ট্রা-র ভূমিকা)। সুতরাং 'অর্কেস্ট্রা-র স্খলন-পতন-ত্রুটি আমার কাছে যতই লজ্জাকর ঠেকুক না কেন, তদন্তর্গত কবিতাবলীর পুনর্মুদ্রণে বাধা দিলে,···অমূলক আত্মমর্যাদাই প্রকাশ পেতো'—কারণ, পরিণতি-ইতিহাসের দাবি অগ্রাহ্য করা যায় না, কারণ যা আদ্যন্ত অনবদ্য, নিরঞ্জন সার্থকতায় মণ্ডিত, একমাত্র সেই কবিতাই প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদের অনেক রচনাও অপ্রকাশিত থেকে যেত। এই পর্যন্ত সুধীন্দ্রনাথ মেনে নিতে প্রস্তুত, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই বিবেকতাড়িত কবি বলেন, এই কবিতাগুলির পুর্নমুদ্রণে অরাজি হওয়া যেমন অন্যায় হত, 'এগুলোর সংস্কার সাধনে বিরত থাকলে, তেমনি সূচিত হতো রূপকারী বিবেকের অভাব, তথা পাঠকের প্রতি অবজ্ঞা।' কোনো এক সময়ে তোমার সাধ্যে কত দূর সম্ভব হয়েছে, সেই তারিখে সেইটুকুই সম্ভব ছিলো জেনে এই রূপকারী বিবেক নিস্তার বা অব্যাহতি দেয় না; সে বলে, পুনঃপুনঃ আক্রমণে, প্রযত্ন ও নিষ্ঠায় সর্বোত্তমের সন্নিকটে যাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এই সদাজাগ্রত বিবেকের জন্যেই 'অহংকার যেই অতীতে তাকায়, অমনি বেরিয়ে পড়ে পুরাতন রচনাবলীর সংস্কার-সাধ্য দোষ।' এই কারণে বিনা সংশোধনে পুরাতন কবিতাবলীর পুর্নমুদ্রণ কবির বিবেকে বাধে।

বুদ্ধদেব বসু সুধীন্দ্রনাথের কাব্যসংগ্রহের ভূমিকায় লিখেছেন 'জীবনের শেষ দুই দশকে সুধীন্দ্রনাথ কবিতা বেশি রচনা করেন নি, কিন্তু অনবরত নতুন করে রচনা করেছেন নিজেকে এবং সেটিও কবিকৃত্যের একটি প্রধান অঙ্গ।

পুরোনো রচনায় তৃপ্তিহীন পরিবর্তন ও পরিমার্জনা তাঁর—যা বন্ধুমহলে মাঝে মাঝে সরোষ প্রতিবাদ জাগালেও অনেক স্মরণীয় পংক্তি প্রসব করেছে।' বন্ধুভক্তদের সরোষ প্রতিবাদেই সম্ভবত সুধীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছিলেন ব্যক্তি-স্বরূপ যেহেতু পরিণতিসাপেক্ষ, সেই কারণে পরিণতির ইতিহাস রক্ষা প্রয়োজন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি রূপকারী বিবেকের তাড়নায় পরিবর্তন করে গেছেন। সুধীন্দ্রনাথ আত্মপক্ষ সমর্থনে ইয়েটসের নজির নিজেই দিয়েছেন। বাস্তবিক ইয়েটসের কবিতাবলীর পাঠান্তর-সম্বলিত সংস্করণ দেখলে তবেই বোঝা যায় কত পরিবর্তন-পর্যায়ের মধ্য দিয়ে তাঁর কবিতাবলী ভাস্কর্যের মতো অমর ও অবিশ্রান্ত সৌন্দর্য অর্জন করেছে। নানা সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যে সব কবিতার পুরাতন পাঠ জনপ্রিয় হয়েছে, এমনকী সেগুলোকে পর্যন্ত রূপকারী বিবেকের দায়ে সংশোধন করতে ইয়েটসের বাধে নি। ইয়েটসের এই সংস্কার-প্রবণতাও নিশ্চয়ই তাঁর 'বন্ধুমহলে মাঝে মাঝে সরোষ প্রতিবাদ' জাগিয়েছিল, এবং সেই কারণে সম্ভবত ইয়েটস তাঁর সংস্কারচর্চার সপক্ষে এই কয়টি লাইন লিখেছিলেন—'They that hold I do wrong/ Whenver I remake a song/Should recollect what is at stake :/It is myself that I remake.' এই শেষ চরণের বক্তব্যটি বুদ্ধদেব বসু সুধীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ব্যবহার করেছেন, সুধীন্দ্রনাথ 'অনবরত নতুন করে রচনা করেছেন নিজেকে।' কিন্তু ইয়েটসের নিজেকে পুর্ননির্মাণ এবং সুধীন্দ্রনাথের নিজেকে নতুন করে রচনায় মধ্যে পার্থক্য আছে। সুধীন্দ্রনাথের কাব্যের বক্তা আপাতত ও বস্তুত প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই জন—একজন মানুষের রোমান্টিক-বেদনা ধ্রুপদী ভাষায় পূর্বাপর প্রকাশ পেয়েছে—সুধীন্দ্রনাথে ইয়েটসের মতো ব্যক্তিত্বের পুর্ননির্মাণ নেই, তিনি নতুন নতুন মুখোশ পরেন নি। ইয়েটস নিজের জটিল ব্যক্তিত্ব প্রকাশের জন্যে পূর্বাপর বস্তুত এক থেকেও, সন্ত বা মাতাল, সৈনিক বা শিল্পী, রাজনীতিক বা উন্মাদ, শয়নকক্ষের দাসী বা পাগলি জেনের মুখোশ পরে যেমন ব্যক্তিস্বরূপের পুর্ননির্মাণ করেছেন, সেই জাতীয় পুর্ননির্মাণ সুধীন্দ্রনাথের নেই। ইয়েটসের ভাষাগত পরিবর্তন,—ভাষার মেদহীনতা, কাঠিন্য, পৌরুষ, বাক্যবন্ধের জটিলতা, আপাত সঙ্গীতদৈন্য—আসলে তাঁর নাটকীয় ব্যক্তিত্বের রূপান্তরের, নানা চরিত্রধারণের বাহ্য লক্ষণ। নিজেকে তিনি পুনর্নির্মাণ করেছিলেন বলেই তিনি কবিতার ভাষায় ক্রমাগত সংস্কার করেছিলেন। সুধীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব শেষ পর্যন্ত এক, কোনো মুখোশনাট্যের মেলায় তিনি বিচিত্র মুখোশ পরেন নি—তাঁর কবিতার

পরিবর্তন ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনজনিত নয়, তা শুধুই ভাষাগত। পূর্বযুগের বাংলা কবিতার উত্তরাধিকার হিশাবে যে সব দুর্বলতা তাঁর কবিতায় বর্তেছিল বলে তাঁর মনে হয়েছে,—গঠনগত তরলতা, অতি পেলবতা, সর্বজাতীয় শৈথিল্য ও ভাষাগত মুদ্রাদোষ—সেগুলোকে তিনি পরিমার্জনা ও সংশোধনের দ্বারা পরিহার করতে চেয়েছিলেন।

কী কী সেই দুর্বলতা যা তিনি দূর করতে যত্নবান ছিলেন, তাঁর কয়েকটি উক্তি উদ্ধার করলেই তা বোঝা যাবে। 'অর্কেস্ট্রা'-র দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় সুধীন্দ্রনাথ প্রথম সংস্করণ 'অর্কেস্ট্রা' সম্বন্ধে বলেছেন, 'সাধু ও প্রাকৃতের মধ্যবর্তী যে সাধ্যভাষায় সেকালের অধিকাংশ বাংলা কবিতা লেখা হত, তাই এ-গ্রন্থের বাহন। তা ছাড়া অন্ত্যানুপ্রাসের চাহিদায় তথা ছন্দোরক্ষার প্রয়োজনে, শব্দের বিকৃতি, পাদপূরণের জন্য ক্রিয়াপদের গ্রাম্যরূপ অথবা বর্ণসংকোচ ও বৃদ্ধি, হওয়া ও করা ধাতুর পৌনঃপুন্য, সম্বোধনের অনাবশ্যক বাহুল্য ইত্যাদি বাংলা পদ্যের সুপ্রচলিত স্বেচ্ছাচার অর্কেস্ট্রা-র সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল…।' 'সেইজন্যে বিনা সংশোধনে অর্কেস্ট্রা-র পুর্নমুদ্রণ আমার বিবেকে বাধলো।' অতন্দ্র প্রযত্নে কী কী শ্রেণীর দুর্বলতা উৎখাতে তিনি উৎসাহী ছিলেন তার আর একটা তালিকা পাই 'সংবর্তে'-র মুখবন্ধে—'আমি যদিও জ্ঞানত গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধ চাই, তবু এখনো আমার সাধ ও সাধ্য মাঝে মাঝে পরস্পরের বাধ সাধে। ফলত ছন্দোরক্ষার খাতিরে অথবা মিলের গরজে সাধু ও প্রাকৃত ভাষার সংমিশ্রণ, নামধাতুর বাহুল্য, বিভক্তি-বিপর্যয় ইত্যাদি বাংলা কাব্যের অনেক অভ্যাসদোষ একাধিক কবিতায় রয়ে গেল।' এ ছাড়াও আছে 'পাদ-পুরণের গরজে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের সাধুরূপ গ্রহণ ও বর্জন, 'যেখানে মাত্রাসংখ্যা কম পড়েছিল সেখানে অগত্যা পুনরুক্তি বা বিশেষণবাহুল্যের শরণ' এবং 'ছন্দের শৈথিল্য, শব্দের অপপ্রয়োগ, বাক্যের জড়তা, চিত্রকল্পের অসঙ্গতি'।

সুধীন্দ্রনাথের কবিতাবলীর কিছু পাঠান্তর পাশাপাশি রেখে আলোচনা করলে তাঁর পরিমার্জনা-প্রক্রিয়া বাস্তবক্ষেত্রে কীভাবে কাজ করেছে তা দেখানো সহজ হয় এবং প্রসঙ্গত, এই সংশোধন সর্বত্রই সঙ্গত হয়েছে কিনা এ প্রশ্নেরও বিবেচনা করা চলে। 'শাশ্বতী' (অর্কেস্ট্রা)

দ্বিতীয় সংস্করণ	প্রথম ও তৃতীয় সংস্করণ
একটি কথার দ্বিধা থরথর চূড়ে	একটি কথার দ্বিধা থরথর চূড়ে
বাসা বেঁধেছিল সাতটি অমরাবতী…	**ভর করেছিল** সাতটি অমরাবতী…

সুধীন্দ্রনাথ তৃতীয় সংস্করণে প্রথম সংস্করণের পাঠ আবার নিয়েছেন। করা ধাতুর পৌনঃপুন্য দূর করার জন্যে হয়তো তিনি দ্বিতীয় সংস্করণে বাঁধা ধাতু ব্যবহার করেছিলেন এবং ফলে 'বাসা' এসেছিল। কিন্তু পরে কবি চিত্রকল্পের সঙ্গতির প্রয়োজনে (দ্বিধা থরথর চূড়ে দীর্ঘকালের বাসা বাঁধা যায় না, ক্ষণকাল ভর করা যায় মাত্র) এবং অনুপ্রাসের দাবিতে পূর্বপাঠেই ফিরে গিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় সংস্করণ	তৃতীয় সংস্করণ
আজি সে কেবল আর কারে ভালবাসে।	**কিন্তু সে আজ** আর কারে ভালবাসে।

প্রথম পাঠের এলিয়ে-যাওয়া শিথিল চরণটি দ্বিতীয় পাঠে সুধীন্দ্রনাথ শোধরাবার চেষ্টা করেছেন। একটিমাত্র যুক্তাক্ষরের যোগে শুধু যে শিথিল পংক্তি সটান হয়েছে তাই নয়, এই সুযোগে কবি পদ্যে ব্যবহৃত 'আজি' বর্জন করে 'আজ' ব্যবহার করতে পেরেছেন। অবশ্য পদ্যে ব্যবহৃত সর্বনাম 'কারে' রয়েই গেল। এ ছাড়া অপ্রয়োজনীয় 'কেবল' শব্দটিকেও কবি বহিষ্কার করতে পেরেছেন।

'মার্জনা' (অর্কেস্ট্রা)

প্রথম সংস্করণ	তৃতীয় সংস্করণ
তাই বারে বারে ব্যাজজীবী স্মরণের লুব্ধ অত্যাচারে আত্মারে গচ্ছিত রেখে, আপনারে ভাবো চিরঋণী, অয়ি মোর ক্ষমাভিখারিণী	তাই বারে বারে ব্যাজজীবী স্মরণের লুব্ধ অত্যাচারে আত্মারে গচ্ছিত রেখে আপনারে ভাবো চিরঋণী, ক্ষমাভিখারিণী।

সম্বোধনের অকারণ বাহুল্য ও শিষ্ট সর্বনাম বর্জনের প্রয়োজনে এই পাঠান্তর। এখানেও কিন্তু পদ্যসর্বনাম 'আপনারে' রয়েই গেল।

'অর্কেস্ট্রা' (অর্কেস্ট্রা)

দ্বিতীয় সংস্করণ

সচেতন প্রতিবেশিনীর **পিঙ্গল কুন্তল** থেকে
নামহীন রতিপরিমল, পরদেশী সঙ্গীতের
মুগ্ধ সমর্থনে, মোর চিত্তে সহসা জাগায়ে দিল
অতিক্রান্ত উৎসবের **নিরাধার সম্মোহ আবার।**

তৃতীয় সংস্করণ

সচেতন প্রতিবেশিনীর ক্ষৌম কেশে উচ্চকিত
রতিপরিমল, পরদেশী সঙ্গীতের ঐকতান
সমর্থনে যেন পুনরায় উদ্বুদ্ধ করিল চিত্তে
অতিক্রান্ত উৎসবের বিক্ষুব্ধ ও বিক্ষিপ্ত সম্মোহ।

এই রূপান্তর অনেক কারণেই অস্বস্তিকর। অবশ্য 'পিঙ্গল কুন্তল'-এর চেয়ে 'ক্ষৌম কেশ' স্বরূপা বিদেশিনীর সৌন্দর্য বেশি প্রকাশ করে, তাছাড়া দ্বিতীয় পাঠটি ব্যবহারে নষ্ট হয়েছে কম। ভালোই হয়েছে পাদপূরণের প্রয়োজনে ব্যবহৃত অতিপ্রচলিত বিশেষণ 'নামহীন' সরিয়ে দেওয়া। কিন্তু শূন্যস্থান পূরণের জন্যে 'উচ্চকিত' ও 'ঐকতান'-এর বিশেষ করে 'উচ্চকিত' শব্দের ব্যবহার ভালো হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ থেকে যায়। মাত্রামেলানোর গরজে ব্যবহৃত অপ্রয়োজনীয় বিশেষণ 'মুগ্ধ', সাধু-চলিতের ভাষা-সংস্করত্ব নিরসনের প্রয়োজনে সাধু সর্বনাম 'মোর' বহিষ্কৃত হয়েছে রূপান্তরে। অপ্রয়োজনীয় ক্রিয়াবিশেষণ 'সহসা'-ও বিদায় নিল এবং অনুষঙ্গের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ 'পুনরায়' এলো তার জায়গায়। হয়তো যুগ্মক্রিয়াপদ-জনিত শৈথিল্য দূর করার উদ্দেশ্যেই সুধীন্দ্রনাথ 'জাগায়ে দিল'-র জায়গায় 'উদ্বুদ্ধ করিল' ব্যবহার করেছিলেন। সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নি, বরং যুক্তাক্ষরে যুক্তাক্ষরে হোঁচট খেয়ে কাব্যসঙ্গীত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আরো দুটো পরিমার্জনা একেবারেই সমর্থন করা যায় না। অব্যয় 'যেন'-র ব্যবহার ভাবগত ও সঙ্গীতগত দুই কারণেই দুর্বলতা সৃষ্টি করেছে, স্বাচ্ছন্দ্য হারিয়ে বাক্যেও এসেছে জড়তাদোষ। এই অব্যয় ব্যবহারে যে দ্বিধা এসেছে তার ফলে বক্তব্য জোরালো হয় নি, আবার সঙ্গীত-প্রবাহও এখানে এসে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। আরো গুরুতর আপত্তি শেষ চরণের পাঠান্তর বিষয়ে। পয়ার-মহাপয়ারের প্রখ্যাত শোষণক্ষমতাও 'বিক্ষুব্ধ ও বিক্ষিপ্ত সম্মোহ'-র কাছে হার মানে। সমস্ত শব্দভাবসঙ্গীত স্পন্দনবিস্তারের মধ্য দিয়ে প্রথম পাঠে যুক্তাক্ষরবর্জিত 'আবার'-এ এসে যেন শমে পৌঁছেছিল, কিন্তু দ্বিতীয় পাঠে কাব্যসঙ্গীত শেষচরণের পৌনঃপুনিক যুক্তাক্ষরের মধ্য দিয়ে 'সম্মোহ'-য় এসে প্রত্যাশিত শম খুঁজে পায় না, বরং মনে হয় যেন তানকর্তব্যের মাঝখানে সঙ্গীত হঠাৎ থেমে গেল—গুরুভার 'সম্মোহ' শব্দটি যেন হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে শব্দসঙ্গীতের প্রবাহকে স্তব্ধ করিয়ে দিল।

'সন্ধান' (ক্রন্দসী)

সুধীন্দ্রনাথ 'ক্রন্দসী' কাব্যগ্রন্থের 'সন্ধান' ও 'জাদুঘর' কবিতা দুটোর আন্তস্ত পরিমার্জন করেছিলেন। 'সন্ধান' কবিতার পরিমার্জনাকে অবশ্য ভাষাগত বলা চলে না, বরং বলা চলে দ্বিতীয় পাঠে ভাবই বিস্তার ও প্রসার পেয়েছে।

প্রথম সংস্করণ

তাহার শরীর বুদ্ধি, মনীষা মনন
শিল্প-উপাদান-সম অখণ্ডতা করে বিরচন… ।

দ্বিতীয় সংস্করণ

মননে ও মনীষায়, দেহে ও বুদ্ধিতে
একান্ত সে ; বিসংবাদী উপাদান শিল্পের শুদ্ধিতে
যেমন নিষ্ফল, সেও তেমনি সংগত—

বোঝা যায় এখানে পরিবর্তন শুধু ভাষাগত নয়, বিষয়গত—বস্তুত বিষয়গত পরিবর্তনের জন্যেই ভাষাগত রূপান্তরের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। প্রথম পাঠের,

অবিকল, সিদ্ধ, স্বয়ংবশ,
নিঃশঙ্ক সে অপমানে, অন্বেষণ করে না সে যশ…

চরণ দুটো স্থানচ্যুত হয়ে বহু চরণ পরে দ্বিতীয় পাঠে এই পরিবর্তিত চেহারা পেয়েছে,

শাঠ্যের প্রেরণা তারে যোগায় না শঠ,
মজে না সে প্রশংসায়, পায় না লোকাপবাদ ভয় ;

প্রথম সংস্করণে ছিল,

সে কেবল নির্লিপ্ত অয়নে
পূর্ণ করে ভগ্নবৃত্ত ; নিরাসক্ত বিভাবিকিরণে
জানায় দিকের বার্তা অমাগ্রস্ত নিঃসঙ্গ তরীরে ;
রূপসীরে
নিষ্কাম উদ্দীপ্তি তার করে পূজারতি,
কুরূপার কুৎসিত বসতি
মায়াপুরী হয়ে ওঠে নৈর্ব্যক্তিক তার অনুরাগে।

দ্বিতীয় পাঠে ভাবৃত্ত পূর্ণ করায় ব্রাউনিং-বক্তব্য ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী ব্যাপকতা পেয়ে হয়েছে,

দেবযানে
উদ্‌গোতা জ্যোতিষ্ক যেন বৃত্তির নিত্রবে পূর্ণ করে
অসম্পৃক্ত অয়নাংশ···।

'নিঃসঙ্গ তরী'র চিত্রকল্প মিল ও অনুপ্রাসের অনুরোধে হয়েছে,

তরায় বন্দরে
নিশাক্রান্ত তরণীরে নিরুদ্দিষ্ট তার আশীর্বাদ ;

রূপসী ও স্বরূপার মধ্যে সমদৃষ্টি দুই চরণে সংহতি পেয়েছে,

ব্যক্তি নিরপেক্ষ তার প্রচুর প্রসাদ
রূপসীর অহঙ্কারে, কুরূপার কৌস্তভে স্বরাট্‌ ;

এতদ্ব্যতীত এসেছে বহু নতুন চরণ বা বাক্যাংশ প্রথম পাঠে যার আভাসমাত্রও ছিল না। সেই কারণেই আরো বোঝা যায়, শুধু ভাষাগত শোধনের জন্যে নয়, এমনকী পূর্বপাঠের বিষয়ের স্পষ্টতার জন্যেও নয়, প্রধানত বিষয় ও ভাবের বিস্তারের জন্যেই এই কবিতাটির আদ্যন্ত পরিমার্জনা প্রয়োজন হয়েছিল।

'সৃষ্টিরহস্য' (ক্রন্দসী)

প্রথম সংস্করণ

সম্মুখে নিখিল নাস্তি ; পাছে মোর মৌল নীরবতা

দ্বিতীয় সংস্করণ

সম্মুখে নিখিল নাস্তি ; পৃষ্ঠ দেশে মৌল নীরবতা

'সাধু ও প্রাকৃত ভাষার সংমিশ্রণ'-এর দোষ দূর করা ও সাধুসর্বনামের উৎখাতের প্রয়োজনে এই সংস্কার।

'প্রত্যাখ্যান' (ক্রন্দসী)

প্রথম সংস্করণ

অধোমুখ আকাশের পানপাত্র থেকে
আবার ঝরিছে শিরে নীলারুণ সন্ধ্যার মাধুরী

দ্বিতীয় সংস্করণ

অধোমুখ আকাশের পানপাত্র থেকে
আবার মাথায় ঝরে নীলারুণ সন্ধ্যার মাধুরী

ছন্দের প্রয়োজনে ক্রিয়ার শিষ্টরূপ ঝরিতেছে সংকোচনের ফলে 'ঝরিছে' হয়েছিল। সংকোচন ও শিষ্টরূপ বর্জন করে প্রাকৃত রূপ ঝরছে করলে ছন্দপতনের এবং সুষমাহীনতার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় না। পাঠান্তরে 'ঝরিছে শিরে'-র পরিবর্তে 'মাথায় ঝরে' ব্যবহার করায় ক্রিয়াপদের শিষ্টরূপের ব্যবহার ও বর্ণসংকোচ করার দায় থেকে মুক্তি পাওয়া গেল, তাছাড়া সুভদ্র 'শিরে'-র পরিবর্তে এলো প্রাকৃত 'মাথা'।

'জাদুঘর' (ক্রন্দসী)

'ক্রন্দসী'র 'জাদুঘর' কবিতাটিরও আদ্যন্ত সংস্কার করা হয়েছে। এখানে সংস্কার 'সন্ধান' কবিতার মতো ভাবের প্রয়োজনে নয়, আদিরূপের স্পষ্টতা সাধন ও ভাষাগত দুর্বলতা নিরাকরণের প্রয়োজনে। কবিতাটির অংশ ধরে ধরে আলোচনা করছি।

প্রথম সংস্করণ

উপবাসী কবি এক অপলাপী উনিশ শতকে
মুদ্রিত পুঁথির পাতে করেছিল নাটকী ঘোষণা
"রুদ্ধ রাজ-অন্তঃপুরে আমি ব্যর্থ ফোয়ারা হব না;
হেরিবে না মুখচ্ছবি পুরনারী এ-চিত্রফলকে।

দ্বিতীয় সংস্করণ

এক উপবাসী কবি নাটকীয় উনিশ শতকে
অপণ্য গ্রন্থের মৌনে বলেছিল সাক্ষী অন্তর্যামী—
"রাজন্যের কেলিকুঞ্জে শিল্পজাত উৎস নই আমি;
হেরিবে না মুখচ্ছবি রঙ্গিনীরা এ-চিত্রফলকে।

'এক উপবাসী কবি' কথ্যরীতির বেশি অনুগত। মাত্রাপূরণের প্রয়োজনে ব্যবহৃত 'আলাপী', 'রুদ্ধ' ইত্যাদি বিশেষণ-বাহুল্য দ্বিতীয় পাঠে বর্জিত হয়েছে। স্থানান্তরের সুযোগে বর্ণসংকোচ-দুষ্ট 'নাটকী' 'নাটকীয়'-তে স্বাভাবিক হয়েছে। পদ্যগন্ধি 'পুঁথি'-র বদলে এসেছে 'গ্রন্থ'; মাত্রারক্ষার গরজে প্রথম পাঠের পাতায় না লিখে 'পাতে' লিখতে হয়েছিল, পাঠান্তরে কবি সেই বর্ণসংকোচের আশ্রয় নেন নি। করা ধাতুর জায়গায় দ্বিতীয় পাঠে এসেছে বলা ধাতু। 'রাজ অন্তঃপুরে'-র বদলে 'কেলিকুঞ্জ', 'ব্যর্থ ফোয়ারা' ও 'পুরনারীর' পরিবর্তে যথাক্রমে 'শিল্পজাত উৎস' ও 'রঙ্গিনীরা' অনেক বেশি সমীচীন; বিলাসব্যসন

কৌতুকের ও কৃত্রিমতার অভিপ্রেত অনুষঙ্গ প্রথম পাঠের শব্দগুলোয় ছিল না ; কিন্তু বাংলা কবিতায় দীর্ঘকাল থেকে যে সংস্কার চলে আসছে, রূপসীরা আয়নায় মুখ দেখেন না, মুখ হেরেন, সেই সংস্কারের ছোঁয়াচ থেকে সচেতন সুধীন্দ্রনাথও রেহাই পান নি।

প্রথম সংস্করণ

"আমি অব্যাহত নদ, চিরঞ্জীব প্রবাহে আমার
তৃষ্ণার্ত পশুর ক্ষুর, সঞ্চারিবে সার্থ অবিলতা
দিনান্তে কর্মের ক্লেদ প্রক্ষালিবে গ্রাম্য শুচিব্রতা ;
গৃহার্থী চাষীর ভিড়ে পুণ্য হবে খেয়ার দু-পার।"

দ্বিতীয় সংস্করণ

"আমি অব্যাহত নদ, পিপাসার্ত পশুদের ক্ষুরে
যদিও আবিল, তবুও চরিতার্থ আমার প্রবাহ,
ঘুচায় কর্মের ক্লেদ পল্লীস্ত্রীর সাদ্ধ্য অবগাহ,
চাষীরা গৃহাভিমুখী, খেয়ামাঝি তটস্থ সবুরে।"

প্রথম পাঠে প্রকাশের দোষে আবিলতা সঞ্চারের উপর ঝোঁক পড়েছে বেশি, যা কবির আদৌ অভিপ্রেত ছিল না ; পাঠান্তরে তাই অব্যাহত নদের চরিতার্থতার উপরে জোর দেওয়া হয়েছে বেশি। পদ্যগন্ধি এবং বর্ণসংকোচ দুষ্ট 'তৃষার্ত' হয়েছে 'পিপাসার্ত', নতুন পাঠে ব্যবহৃত 'চরিতার্থ' শব্দের সঙ্গে ঘটেছে চমৎকার মধ্যমিল। 'সঞ্চারিবে' আর 'প্রক্ষালিবে' নামধাতু বিদায় নিয়েছে; দ্বিতীয়টির জায়গায় এসেছে প্রাকৃত 'ঘুচায়'। এই সুযোগে, রবীন্দ্রনাথকে সহজেই মনে পড়িয়ে দেয়, 'দিনান্ত' শব্দটিকেও অপসারিত করা সম্ভব হয়েছে। 'গ্রাম্য শুচিব্রতা'-র অবয়বত্ব বা মূর্ততার অভাব দূর হয়েছে 'পল্লীস্ত্রী ব্যবহারে। গৃহার্থী চাষীর ভিড়ে খেয়ার দুপার কেন 'পুণ্য হবে' সে কথা অস্পষ্ট ছিল প্রথম পাঠে, পাঠান্তরে পুণ্য হওয়ার প্রশ্ন পরিত্যাগ করে কবি চিত্রকল্পটিকেই বেশি উজ্জ্বল করে তুলেছেন—এতে কবিতার সন্দেহাতীত উন্নতি হয়েছে।

প্রথম সংস্করণ

সে-নির্গুণ দৈত্যবাদে হেসেছিনু সেদিন বিদ্রূপে।
অন্ধকার অবরোধে বিষায়িত আজি প্রাণবায়ু ;

আকাশকুসুমগুলি পচে গেছে গুপ্ত অশ্রু-কূপে ;
উন্মূল উৎকর্ষ মোর এ-নির্জনে হয় নি চিরায়ু।
মিসরী সমাধিসম মরুগ্রস্ত এই আতুঘরে
নিঃস্ব রোমন্থক কাল আপনারে পরিপাক করে।

দ্বিতীয় সংস্করণ

সেদিন হাসায়েছিল দুর্গতের রিক্ত দৈন্যবাদ।
অন্ধকার অবরোধে বিষায়িত আজি প্রাণবায়ু ;
আকাশকুসুম প'চে বাড়ে শুধু অশ্রুকূপে গাদ ;
আমার উৎকর্ষ হায়, মূলাভাবে হয় নি চিরায়ু।
মিসরী সমাধিসম মরুগ্রস্ত এই আতুঘরে
রোমন্থক মহাকাল আপনারে পরিপাক করে।

'হেসেছিনু' এই গ্রাম্যক্রিয়াপদকে উৎখাত করে পরিবর্তে এসেছে কথ্যক্রিয়াপদের অনুগামী 'হাসায়েছিল'। ফলে, এবং 'আকাশকুসুমগুলি'-র আদরকারি বহুবচনচিহ্ন বর্জিত হওয়ায় চরণের মাত্রাসংখ্যার যে তারতম্য হয়েছে তারই পরিণাম হিশাবে আমরা 'বিদ্রূপে/অশ্রুকূপে' এই মিলের বদলে 'দৈন্যবাদ/গাদ' এই শ্রুতিকটু মিল পাই। পঞ্চম চরণের মতো দ্বিতীয় চরণ 'আজি' শুদ্ধ অপরিবর্তিত। সাধু সর্বনাম 'মোর' দূর করে পাঠান্তরে 'আমরা' সর্বনামের স্বাভাবিকত্বে কবি ফিরে এসেছেন বটে, কিন্তু মাত্রান্নতা দূর করার জন্যে 'হায়' অব্যয় ব্যবহার করেছেন—এক দুর্বলতা দূর করেছেন অন্য দুর্বলতার বিনিময়ে। অপ্রয়োজনীয় বিশেষণ 'নিঃস্ব" নির্বাসিত করেছেন, তাই পাদপূরণের জন্য 'কাল' হয়েছে 'মহাকাল'।

'বর্ষপঞ্চক' (ক্রন্দসী)

প্রথম সংস্করণ

পঞ্চবর্ষ গত হল। আলোড়িয়া মরুপথ ধূলি
সহসা অদৃশ্য হল জীবনের শ্রেষ্ঠ বর্ষগুলি
দৃষ্টির দিগন্ত পারে…।

দ্বিতীয় সংস্করণ

পঞ্চবর্ষ অতিক্রান্ত। মরুপথ ধুলায় আকুলি
অচিরাৎ অন্তর্হিত জীবনের শ্রেষ্ঠ বর্ষগুলি
দৃষ্টির দিগন্ত পারে… ।

'অতিক্রান্ত' এবং 'অন্তর্হিত' বিশেষণের ব্যবহারে হওয়া-ধাতু পৌনঃপুন্যজনিত দুর্বলতা এখানে দূর করা হয়েছে। 'আলোড়িয়া' নামধাতুর বদলে আর এক নামধাতু 'আকুলি' ব্যবহৃত হয়েছে বটে, কিন্তু 'ধূলি' অন্তত প্রাকৃত 'ধুলায় নেমে এসেছে।

কিন্তু এই কবিতার যেখানে প্রধান পাঠান্তর, সেখানে পাঠান্তর মাত্র ভাষাগত নয়, সেখানে পরিবর্তন এসেছে ভাববস্তুর পরিবর্তন থেকে।

প্রথম সংস্করণ

একদা যে-পঞ্চবর্ষ অমিতির নিশ্চিন্ত অয়নে
ব্যূহবদ্ধ শরীরের ঘনঘোর ছায়াপাত করি
দীপ্র ভবিতব্যতারে রেখেছিল সম্পূর্ণ আবরি
আমার নয়ন হতে, স্বর্গ, মর্ত্য, রসাতল ব্যেপে
যে-মন্থর পঞ্চবর্ষ জগদ্দল প্রতি পদক্ষেপে
সুপ্রতিষ্ঠ শতাব্দীরে করে যেত হেলায় নিষ্পেষ ;
সীমাশূন্য শূন্যতায় তারাও কি হল নিরুদ্দেশ ?

দ্বিতীয় সংস্করণ

একদা যে-পঞ্চবর্ষ অধুনার সূচীমুখ দ্বারে
অব্যাজ ঐক্যের ব্যূহ বেঁধেছিল, ভবিতব্য যাতে
যাযাবরবৃত্তি ভুলে ক্ষণমাত্র শিবির না পাতে
দুর্গের ধ্বংসাবশেষে, প্রত্যক্ষের পরীণাহ মেপে
যাদের সংসারযাত্রা, ভূমিকম্প প্রতি পদক্ষেপে,
জুড়েছিল অসম্পূর্ণ শতাব্দীর প্রশস্ত সোপান ;
সে-স্থাবর পঞ্চবর্ষ, তারাও কি শূন্যে ধাবমান ?

ছন্দোরক্ষার প্রয়োজনে অদরকারি বিশেষণ 'দীপ্র' ও 'সীমাশূন্য শূন্যতায়' এই পুনরুক্তিদোষ বর্জন ব্যতীত এখানে অন্য পাঠান্তরের কারণ বিষয়ের, ভাবের ও চিত্রকল্পের পরিবর্তন। পূর্বে ছিল 'সুপ্রতিষ্ঠ' শতাব্দী, পরে হয়েছে 'অসম্পূর্ণ' শতাব্দী। 'ভবিতব্য যাতে / যাযাবরবৃত্তি ভুলে ক্ষণমাত্র শিবির না পাতে / দুর্গের ধ্বংসাবশেষ' এই ইমেজের আভাসও আদি পাঠে ছিল না এবং চিত্রকল্পের এই সুস্পষ্টতা ছিল না।

'নান্দীমুখ (সংবর্ত)

প্রথম সংস্করণ	দ্বিতীয় সংস্করণ
ছায়াপ্রচ্ছদে যাতায়াত করে কারা ?	প্রচ্ছদে ওই **ছায়াপাত** করে কারা ?

এখানে পরিমার্জনার উদ্দেশ্য চিত্রল্পের সঙ্গতি আনা। 'ছায়াপ্রচ্ছদে যাতায়াত'-এর তুলনায় প্রচ্ছদে ছায়াপাত শুধু সঙ্গততর নয়, বেশি সুস্পষ্টও বটে।

'সংক্রাম' (সংবর্ত)

দ্বিতীয় সংস্করণ

তোমার-আমার মাঝে বিরহের বাহিনী বহে না ;
কবিতা-প্রভব ক্রৌঞ্চ আমাদের উপমান নয় ;
সম্প্রতি সঙ্গমে আর ভূষণেরও ব্যবধি রহে না,
বিশ্রম্ভের ব্যাকরণ, নিরব্যয়, আদ্যন্ত সান্বয়।

তৃতীয় সংস্করণ

বিরহের খাতে সেতু, অভিসার আজ পারংগম ;
বিয়োগান্ত ক্রৌঞ্চ আর আমাদের উপমান নয় :
তুমি, আমি একাকার ; **বীতহার সাষ্টাঙ্গ সংগম ;**
বিশ্রম্ভের ব্যাকরণ, নিরব্যয়, আদ্যন্ত সান্বয়।

প্রথম পর্বের 'তোমার-আমার মাঝে বিরহের বাহিনী বহে না' এই চরণে দ্বিতীয় পাঠে অর্ধচরণে সংহত ও সুস্পষ্ট হয়েছে 'বিরহের খাতে সেতু' এবং তৃতীয় চরণ 'সম্প্রতি সঙ্গমে আর ভূষণেরও ব্যবধি রহে না' সংহতি ও সুস্পষ্টতা লাভ করেছে 'বীতহার সাষ্টাঙ্গ সঙ্গম' এই অর্ধচরণে। এতে শুধু যে সংহতির বা মূর্ততার সংগুণ অর্জিত হয়েছে তাই নয়, অতিরিক্ত অর্ধচরণে 'অভিসার আজ পারঙ্গম' প্রথম পংক্তিতে এবং 'তুমি, আমি একাকার' তৃতীয় পংক্তিতে যোগ করার সুযোগ পাওয়ায় এই পদাবলীতে অগাস্টান হিরোইক কাপলেটের ভারসাম্য এসেছে। 'কবিতা-প্রভব ক্রৌঞ্চ', 'বিয়োগান্ত ক্রৌঞ্চ' হয়েছে বোঝাই যায় অর্থসঙ্গতির প্রয়োজনে ; প্রথম বাক্যাংশে বিচ্ছেদ-যন্ত্রণার ছবি ফুটে ওঠে নি, তাই এই পরিবর্তন।

এই অতন্দ্র রূপকারী বিবেক, আমার বিবেচনায়, প্রায় সব সময়ের এই পদাবলীকে আরো বেশি উৎকর্ষের কাছে নিয়ে গিয়েছে। এ সম্বন্ধে অবশ্য-

-পাঠকে-পাঠকে মতভেদ থাকতেই পারে, অনেকের মনেই অনেক পাঠান্তর জাগাতে পারে সরোষ প্রতিবাদ। কিন্তু যেটা বড় কথা সেটা হল এই পাঠান্তর-তালিকা থেকে কবির কাব্যাদর্শ কীভাবে বাস্তবে কাজ করে তার একটা চমৎকার হদিস পাই; কবির মানসক্রিয়ার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়, বুঝতে পারি রচনার পিছনে ক্রিয়াবান কবির অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্যকে। উত্তরকালের পাঠক যখন কবিমনের পরিণতি বুঝতে চাইবেন তখন এই পরিবর্তনের কথা তাঁকে হিশেবের মধ্যে রাখতে হবে। উপরন্তু মনে রাখা দরকার, এই রূপকারী বিবেকের কথা সুধীন্দ্রনাথ স্পষ্টাপষ্টি বললেও, এই বিবেক সমস্ত আধুনিক কবির মধ্যেই বিশেষভাবে ক্রিয়াবান। এই বিবেকের জন্যেই আধুনিক কবি বিশেষভাবে সচেতন কবি।

রঞ্জিত সিংহ

ব্যক্তিস্বরূপের কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

১৯৩২ সালে লিখিত 'ধ্রুপদ-খেয়াল' প্রবন্ধে 'ব্যক্তিস্বরূপ' ও 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে'র অর্থপ্রতিপত্তিতে পার্থক্য নিরূপণ করেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। স্বভাবে ও আচারে কবিতে-কবিতে যে প্রতিলোমতা আছে—সেই শ্রেণী-নির্ণয়ের গরজেই ঐ দুই শব্দবন্ধের উদ্ভাবন। বিষয়বস্তুর ভিতরে কবিসত্তার অনায়াস নিরঞ্জনে যেখানে প্রকাশমান 'ব্যক্তিস্বরূপে'-র পরিচয়, আত্মমগ্নতা সেখানে দেয় 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য'। ঐ ধারণা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাছে এতদূর গৃহীত সত্যের মতো ছিল যে ১৯৫৩ সালে বুদ্ধদেব বসুর কাছে সরাসরি চিঠিতে জানিয়েছিলেন—"···সাধারণ পাঠকের যে-কবিতা স্বচ্ছন্দ লাগে, তা প্রায়ই স্মৃতিশক্তির সাহায্যে লিখিত—অর্থাৎ চর্বিতচর্বণের নিদর্শন, স্বকীয় উপলব্ধির সাক্ষ্য নয়। ঐ জাতীয় স্বাচ্ছন্দ্যে আমার আর লোভ নেই"—('কবিতা'—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতিসংখ্যা)। ইদানীন্তন ঐ ধারণা গৃহীত সত্য তো নয়ই, এমন কী এইসব প্রশ্নের যৌক্তিকতাও কেউ কেউ আর খুঁজে পান না। এই প্রশ্নের অন্তর্নিহিত নান্দনিকচিন্তার অভিযোজন খুব দুর্বল—এমনি একটা বিবেচনা আমাদের অনেককে যেন পেয়ে বসেছে। অপরপক্ষে যদিও শ্রীমতী সিট্ওয়েল বা ই, ই, কামিংস-এর 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য'-এর উৎভটতায় সুধীন্দ্রনাথের মানসিক সমর্থন ছিল না, তবু 'ব্যক্তিস্বরূপ'-এর অনায়াস উদ্‌ভাসনে তিনি পুরোপুরি আস্থাবান ছিলেন। যে স্বারূপ্য রবীন্দ্রনাথ, য়েটস, রবার্ট ফ্রস্ট বা অনুরূপ কবিপ্রতিভাকে 'অপূর্ব বস্তুনির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা' যুগিয়েছিল, অথবা স্বতন্ত্র কাব্যপরিমণ্ডলের একনায়কত্ব দিয়েছে তাতে আরোপিত প্রয়াসের আড়ষ্টতা নেই! কবি কল্পনার অনায়াস ও অনবকাশ প্রাতিস্বিক অয়নচারিতাই পাঠককে সেখানে মুগ্ধ করে।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'আরম্ভিল'—এই অত্যন্ত পুরোনো মধুসূদনপন্থী নামধাতুর প্রয়োগ লক্ষ্য করে যখন কেউ বিস্ময় প্রকাশ করেন, তখন সে বিস্ময়ে

আমি কোন অসঙ্গতি খুঁজে পাই না। বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে যিনি উগ্র আধুনিক নামে পরিচিত, সেই সুধীন্দ্রনাথ কেমন করে এই জাতীয় শব্দরূপকে প্রশ্রয় দিতে পেরেছিলেন! কিন্তু এই প্রশ্নের মধ্যেই মনোযোগী পাঠক সুধীন্দ্রনাথের কাব্যজিজ্ঞাসা তথা কাব্যসাধনার গূঢ় ইঙ্গিতের সন্ধান পাবেন। উপরন্তু, ব্যক্তিস্বরূপ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রভেদ প্রসঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের একাধিক মন্তব্য স্মরণীয় তো বটেই, এলিয়টের 'ঐতিহ্য ও স্বতন্ত্র প্রতিভা' প্রবন্ধটিও এ ব্যাপারে প্রণিধানযোগ্য। সুধীন্দ্রনাথের মতো অত বড় স্বতন্ত্র প্রতিভা কেন 'আরম্ভিল'-র মতো শব্দরূপ প্রয়োগ করেছিলেন, 'টংকারিছে'-র মতো ক্রিয়াপদ বা 'যূথীগন্ধ সনে মিশে'-র মতো রবীন্দ্রানুগতা তাঁর কাব্যজীবনের গোড়ায় কেন অনুপেক্ষণীয় মনে হল—এই কাব্যজিজ্ঞাসার মধ্যেই সুধীন্দ্রনাথ দত্তের বৈশিষ্ট্য রক্ষা পেয়েছে এবং এই জিজ্ঞাসার ফলশ্রুতির মধ্যেই স্থাপিত হয়েছিল ভবিষ্যৎ কবিযশো প্রার্থীর কাছে কবিতার নতুন আদর্শ।

অর্থাৎ পূর্ববর্তী বাংলা কবিতার পরীক্ষা-নিরীক্ষার সমস্ত লক্ষণকে শিরোধার্য করে সুধীন্দ্রনাথের কবিতা লেখা শুরু। 'শ্রীশ্রীদুর্গামাতা সহায়' এই 'আত্ম-সমর্পণের নম্রতা' নিয়ে তাঁর কাব্যরচনার প্রথম পদযাত্রা। সুতরাং নামধাতু সেখানে সামান্য ব্যাপার। মধুসূদন-প্রবর্তিত প্রবহমানতার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও যখন স্বাচ্ছন্দ্যের নাম নিয়ে রবীন্দ্রনাথে আবেগে অবগাহনের উপায় হয়েছিল—সেই দোষাবহ অথচ অনতিক্রমনীয় কাব্যলক্ষণাদির ভ্রান্ত আদর্শে সুধীন্দ্রনাথের প্রাথমিক কাব্যচর্চার দিন নিশ্চয়ই দ্বিধাবিজড়িত। লক্ষণীয়, কাব্যজীবনের শেষপর্বে এসে যখন 'যযাতি' লেখা হচ্ছে, তখনকার সুধীন্দ্রনাথের কাছে স্বাচ্ছন্দ্য আর লোভের বস্তু ছিল না। বুদ্ধদেব বসুকে লিখিত তাঁর পূর্বোদ্ধৃত চিঠিটিই এই মন্তব্যের সাক্ষ্য বহন করছে। সৎ-কবিমাত্রকেই খানিকটা দেখে এবং কিছুটা ঠেকে শিখতে হয়। তাই এইসব সংস্কারসাধ্য ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করেও নেতি নেতি করেই 'সংবর্তে'র সিদ্ধির সোপানে সুধীন্দ্রনাথ পৌঁছেছিলেন। লক্ষ্য স্থির রেখে কাব্যযাত্রা এযাবৎকাল আমাদের দেশের কবিদের ধাতে বিশেষ সয়নি। ১৯৬০ সালে 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্য-সংকলনে'র ভূমিকায় বুদ্ধদেব বসু-ও বলেছিলেন যে, অতি ধীরে সাহিত্যের পথে সুধীন্দ্রনাথ অগ্রসর হয়েছিলেন 'অতি সুচিন্তিত-ভাবে'। কারণ অব্যবস্থিতচিত্তের জন্ত মধুসূদন তাঁর পরীক্ষাকে ফলপ্রসূ করতে পারেন নি। এই দৃষ্টান্তে কাব্যজীবনের গোড়া থেকেই রবীন্দ্রনাথ

অনুভব করলেন যে কবির প্রাকরণিক বিবেকের পরিণতি অনবরত ও সজ্ঞান পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল। উপরন্তু, না মেনে উপায় নেই, রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কবি হিশেবে সুধীন্দ্রনাথের পক্ষে এই বিশেষ 'সুচিন্তিত' একাগ্রতা যতখানি প্রয়োজনীয় ঠেকেছিল, মধুসূদনের পরবর্তী হিশেবে রবীন্দ্রনাথের এ ব্যাপারে ততখানি সচেতনতা আবশ্যিক ছিল না। মন্তব্যটি বিশদতার অপেক্ষা রাখে। কবিতার অনুকম্পায়ীমাত্রই জানেন যে মধুসূদনের প্রধান কৃতিত্ব—বাংলাছন্দে প্রবহমানতার মতো অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের প্রয়োজনীয়তা তিনিই প্রথম অনুভব করেছিলেন। বস্তুত এই প্রবহমানতার আবিষ্কারে মধুসূদন তাঁর উত্তরসূরীদের শ্রুতিসিদ্ধিকে অনেকখানি ত্বরান্বিত করেছিলেন। বিশেষভাবে আমি রবীন্দ্রনাথের কথা বলছি। অন্যান্য সৎকবির মতো তাঁর দৃষ্টি অনাবিল থাকায় মধুসূদন বর্জিত অন্ত্যানুপ্রাসকে তিনি পুনঃপ্রবর্তিত করলেন বটে কিন্তু কাশীরাম দাসীয় পয়ারে ছেদ-যতির যৌগপদ্যকে তিনি আর ফিরিয়ে আনলেন না। শ্রুতিসিদ্ধ রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন যে মধুসূদনের কাছে পরবর্তীদের শিক্ষণীয় ব্যাপারগুলির মধ্যে অন্ত্যানুপ্রাস বর্জন কখনই অন্যতম হতে পারে না। কারণ, মধুসূদন ঐ প্রকরণের আবশ্যিকতা অনুভব করেছিলেন প্রাতিস্বিক অনুভূতির অমোঘ আকর্ষণে। অপরদিকে, অনুপ্রাসবর্জনকেই প্রধান মূল্য দিয়ে হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে গ্রহণীয় ঠেকে মধুসূদন-প্রবর্তিত ছেদ-যতির বিচ্ছেদ। অর্থাৎ বর্জনের পরিষ্কৃতির পথেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্বসূরীকে গ্রহণ করেছিলেন। ফলে, নবীনচন্দ্র সেন ইত্যাদির শ্রুতিতে সুস্পষ্ট না হলেও অমিত্রাক্ষরের অমিত্রাক্ষরতাকে অমান্য করে রবীন্দ্রনাথ প্রাধান্য দিলেন ঐ ছন্দের অপর গুণের উপর। এই গুণেই ফলপ্রসূ বাংলা কবিতায় সুধীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত কথ্যছন্দের ধ্বনিবত্তা। রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা সুধীন্দ্রনাথকে তাঁর পূর্বসূরীর কাব্যসাধনার প্রতি যে-অধিকতর 'সুচিন্তিত' সচেতনতা দেখাতে হয়েছিল—তার প্রধান হেতু নিহিত আছে আলোচ্যমন্তব্যে। রবীন্দ্রনাথের সম্মুখে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের আবিষ্কার ছাড়া আর বিশেষ কিছু উল্লেখ্য ছিল না। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের সম্মুখে ছিল রবীন্দ্রনাথের বিশাল কাব্যনিরীক্ষা। কারণ, শ্রুতিসিদ্ধির দৃষ্টান্ত হয়েও রবীন্দ্রনাথ প্রবহমানতাকে লিরিকের স্বাচ্ছন্দ্যের কাজে লাগিয়েছিলেন। অথবা বলা যায়, এই প্রবণতা তাঁর স্বভাবানুগামী ছিল বলেই ঐ পূর্বোক্ত আচরণ অনিবার্য-ও বটে। কিন্তু উত্তরাধিকারীর শিক্ষানবিশীর কাছে এর ফল খুব

অবিমিশ্র নয়। বাংলা কবিতাকে বহুলাংশে এগিয়ে দিলেও রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র-সমসাময়িকদের কলমে প্রবহমানতা বর্জনীয় ও ক্লান্তিকর ফেনিলতায় অবসিত হয়ে পড়ে। বাংলা কবিতার এই নিঃশেষিত কাব্যরূপের প্রাতিকূল্যে সুধীন্দ্রনাথ কবিতার আসরে প্রবেশ করেন।

প্রবহমানতার যথোচিত ব্যবহারে পাউণ্ড-এলিয়ট কী কাব্যরূপের সন্ধানে নেমেছিলেন—তাঁদের উপর শেক্সপীয়র-ওয়েবস্টারের প্রভাব কীভাবে অর্শিয়েছিল—মধুসূদন-নবীনচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে বাংলা কবিতায় প্রবহ-মানতার ব্যবহার কোন্ পর্যায়ে উপস্থিত হয়েছিল—সে-ব্যাপারে সুধীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টি কোনোদিন আবিল হয় নি। অধিকন্তু, কবিতায় গদ্যের উপাদান সংমিশ্রণের ব্যাপারে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রমথ চৌধুরীর ধ্যানধারণার কাছে যে যথেষ্ট ঋণী ছিলেন সে ব্যাপারে সুধীন্দ্রনাথের কোনো স্বীকারোক্তি পাওয়া যায় না। কিন্তু এই জাতীয় অনুমানে পাঠকের নিব্যূঢ় কল্পনাই স্বতোপ্রমাণ। কারণ উভয়ের কবিতার সঙ্গে পাঠকের পরিচয়ই এই অনুমানের মৌল ভিত্তি। তাছাড়া এই দুই কবির বেশ কিছু গদ্য উক্তি পাওয়া যায় যা প্রমাণ করে, এই দুই কবিই একই প্রকরণ-আদর্শের চর্চায় কত সুচিন্তিতভাবে নিয়োজিত ছিলেন। 'পদচারণ' কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গপত্রে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে উদ্দেশ্য করে প্রমথ চৌধুরী লিখেছিলেন "গদ্যের কলমে লেখা এই পদ্যগুলি"-তে "আছে Rhyme এবং সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ Reason। এর প্রথমটি যে পদ্যের এবং দ্বিতীয়টি গদ্যের বিশেষ গুণ, এ-সত্য আপনার কাছে অবিদিত নেই।" 'যযাতি' কবিতাটি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসুকে একটি চিঠিতে সুধীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীর উপরের ধারণার প্রায় প্রতিধ্বনি করেন।—"…আমার বিশ্বাস বা অবিশ্বাস কবিতাটার উপলক্ষমাত্র—আঠারো অক্ষরছন্দের সঙ্গে আমার গদ্যরীতির সমন্বয়সাধনই ওটার মুখ্য উদ্দেশ্য"।

সুধীন্দ্রনাথের কাব্যসংগ্রহে আমরা 'তন্বী' থেকে 'দশমী' পর্যন্ত তাঁর কাব্যস্বভাবের ক্রমবিকাশকে লক্ষ্য করার সুযোগ পেয়েছি। 'তন্বী' বা 'অর্কেস্ট্রা'র সময় থেকেই সুধীন্দ্রনাথের লক্ষ্য স্থির ছিল। সিদ্ধির পরিণতরূপ কল্পনায় রেখে 'ক্রন্দসী', 'উত্তরফাল্গুনী' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থের মধ্যস্থতায় ধীরে ধীরে 'সংবর্ত' ও 'দশমী'-র সিদ্ধিতে এসে তিনি পৌঁছেছিলেন। সৎকবিরা যেমন দেখে তেমন ঠেকেও শেখেন বলে, 'সংবর্তে'-র সিদ্ধিতে পৌঁছুতে সুধীন্দ্রনাথের প্রায় তিরিশ বছর সময় লেগেছিল। বস্তুত, নেতি নেতি করে ইতির সন্ধান যে কোনো ভালো কবির কাব্যসিদ্ধির গোড়ার কথা।

রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থভুক্ত 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতার কয়েক পংক্তি এখানে উদ্ধার করা গেল।

"হে আদি জননী সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার,
একমাত্র কন্যা তব কোলে। তাই তন্দ্রা নাহি আর
চক্ষে তব।"

আলোচ্যাংশে মধুসূদনের যে-সংস্কারসাধ্য প্রধান ত্রুটি রবীন্দ্রনাথ শুধরেছিলেন তার পিছনে আছে তাঁর শব্দচেতনায় ও ধ্যানে পারিবারিক প্রভাব। শব্দের অপপ্রয়োগে প্রবহমানতা মধুসূদনের কলমে আড়ষ্টতা পেয়েছিল, সন্দেহ নেই। সে-আড়ষ্টতা কেটে গেলেও প্রবহমানতায় লিরিক-অসংবদ্ধতা থেকে মুক্ত হওয়ার কোনো সংকল্পই রবীন্দ্রনাথ দেখান নি। রবীন্দ্রনাথের ঋণ পরিশোধ নয়, তাঁর ঋণ স্বীকার করেই যে 'তন্বী' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ, তাতে সুধীন্দ্রনাথ পাঠকের আকর্ষণীয় হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকেই অনুসরণ করে।

"বিষাক্ত যৌবন ব্যথা, রুদ্ধ-প্রাণ-ধারণের গ্লানি
সহে না সহে না আর;" ('অন্ধকার')

এই পংক্তির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কবিতার গ্রহণীয় ও বর্জনীয় সমস্ত লক্ষণ বলবৎ আছে। বস্তুত, 'দ্রবীভূত', 'অমা-অন্ধকার', 'তিতিক্ষার অভিনয়' ইত্যাদি গন্ধভূমিক শব্দ বা শব্দবন্ধের প্রয়োগ সত্ত্বেও সুধীন্দ্রনাথের এই কবিতা 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতার লিরিকপ্রভব আবেগ তথা ক্লান্তিময়তা থেকে নিষ্কৃতি পায় নি।

'অর্কেস্ট্রা'-র নাম কবিতায় পুনর্বার প্রবহমানতার উদ্দেশ্যকে সুধীন্দ্রনাথ সফল করতে যত্নবান হয়েছিলেন। এবারে প্রবহমানতার পূর্ব-ক্লান্তিময়তা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য এই কবিতাটিকে আগাগোড়া প্রবহমান পয়ারে আর তিনি বাঁধলেন না। আশা করেছিলেন, বিভিন্ন ছন্দের অভিঘাতে হয়তো কবিতার ঐ বিশেষ লক্ষণ আবেগের শ্লথতা থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু যে প্রকৃত লক্ষণের উপর কথ্যছন্দের শ্রুতিসিদ্ধি নির্ভরশীল এবং প্রবহমানতা যে-সিদ্ধির প্রধান মাধ্যমস্বরূপ, ভবিষ্যৎ বাঙ্গালী কবি বা পাঠক সে-শিক্ষা যদিও সুধীন্দ্রনাথের কাছ থেকেই গ্রহণ করেছেন, তবু নিম্নলিখিত কাব্যাংশে তা দূরাগত ছিল।—

"অপনীত প্রচ্ছদের তলে
বাদ্যসমবায় হতে, আরম্ভিল নিঃসঙ্গ বাঁশরী
নম্রকণ্ঠে মরমী আহ্বান।" ('অর্কেস্ট্রা')

দৈর্ঘ্যের সংক্ষিপ্ততায়, বোধ হয় সুধীন্দ্রনাথের ধারণা হয়েছিল, প্রবহমানতার ক্লান্তিকে জয় করা সম্ভব হবে। অধিকন্তু, অনুভূতির ঐক্যবোধকে আয়ত্তে আনার জন্যেও এই কবিতায় বিভিন্ন ছন্দের তিনি মধ্যস্থতা মেনেছিলেন। অথবা ঐ কবিতাটির অন্তর্নিহিত শিল্প অভিপ্রায় সম্পর্কে সুধীন্দ্রিয় উচ্চারণ-ও এখানে উদ্ধার করা যেতে পারে।— "…শ্রাব্য ঐক্যতানের অতিশ্রুতি ব্যঞ্জনা, আর শ্রোতৃবিশেষের সমবায়ী ভাবানুষঙ্গ ;"।

এতৎসত্ত্বেও 'ক্রন্দসী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভূ'ত 'সিনেমায়' কবিতার পূর্বে কবির কাছে বহুলাংশ ভাবানুষঙ্গবাহী কবিতার রূপকল্প পরিকল্পনামাত্র ছিল। অবশ্য প্রবহমানতার অন্তর্বাহী আবেগকে নির্বাসন দেওয়ার জন্যই পরস্পরসম্বন্ধযুক্ত বিষয়াশ্রয় (Objective Corrlative) তথা অনুভূতিপুঞ্জের ঐক্যবোধের (Unified sensibility) প্রতি সুধীন্দ্রনাথ মনোযোগ দর্শাতে বাধ্য হয়েছিলেন। এর ফলে রবীন্দ্রানুসৃত আবেগময়তার ক্লান্তিহরণে তিনি যে আংশিক সিদ্ধি পান নি, তা নয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার্য, এতে কবিতাটিতে নাটকীয় সংঘট্টের উপস্থিতি ঘটলেও, 'গান্ধারীর আবেদন'-এর যা প্রধান ত্রুটি সেই কথোপকথনের ভঙ্গি অসম্মানিত-ই থেকে গেল। কারণ সুধীন্দ্রনাথ তখনও উপলব্ধি করতে পারেন নি, কোন্ কোন্ শব্দরূপের প্রয়োগ-নৈপুণ্যে কথ্যছন্দের শ্রুতিসিদ্ধি নির্ভরশীল।

> "ধূমাঙ্কিত তরল আঁধারে
> বাক্যহীন গুঞ্জরণ মাথা ঠুকে মরে চক্রাকারে
> মাতাল অন্ধের মতো।" (সিনেমায়')

এই উপরিউদ্ধৃত অংশে কথ্যছন্দ যে আপতিকভাবেই উপস্থিত, এই কবিতার বাকি অংশ লক্ষ্য করলে তা বোঝা যাবে। 'ঠুকে মরে'—এই ক্রিয়াপদের ব্যবহারের গুণে তৎসম, তৎভব সর্বপ্রকার শব্দরূপ এই পংক্তিতে পরস্পরসম্বন্ধযুক্ত হয়ে কথ্যছন্দকে যেমন পাঠকের শ্রুতিগোচর করেছে, এই কবিতার অন্যত্র সেই আলোচ্য সাফল্যের অনবচ্ছেদ লক্ষ্য করলাম না। 'তন্বী'-র 'অন্ধকার'-কবিতার প্রবহমানতা বিষয়াশ্রয়হীন আবেগে বিপর্যস্ত। 'অর্কেস্ট্রা'-র 'নাম' কবিতায় ছন্দোবৈচিত্র্যের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে অক্ষরবৃত্তের প্রবহমানতার অহেতুক দৈর্ঘ্যের ব্যবচ্ছেদকে সুধীন্দ্রনাথ প্রধান বলে মনে করলেন। কিন্তু প্রবহমানতার ক্লান্তিহরণে আবেগের নির্বাসন দৈর্ঘ্যের ব্যবচ্ছেদে-ই যে সংঘটিত হয় না—সে ব্যাপারে আংশিক সচেতনতা তিনি দেখালেন 'ক্রন্দসী'-র 'সিনেমায়'

কবিতায়। প্রকৃতপক্ষে কথ্যছন্দের শ্রুতিসিদ্ধির পক্ষে দৈর্ঘ্যের ব্যবচ্ছেদেরই মতো বিষয়াশ্রয় এবং অনুভূতিপুঞ্জের ঐক্যবোধও উপান্তমাত্র।

আসলে স্বাভাবিক উচ্চারণের অনুগামিতা বা এককথায় কথ্যছন্দের শ্রুতি-প্রবণতার গরজেই প্রবহমানতার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়েছিল। বাংলা কবিতায় প্রথম এই স্বীকৃতি দিয়েছিলেন মধুসূদন দত্ত। কবিযশো-প্রার্থীদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করতে গিয়ে এজরা পাউণ্ড-ও বলেছিলেন—"কখখনো এমনভাবে পংক্তি রচনা করবে না যে সেই পংক্তির শেষে এসে সম্পূর্ণ ছেদ পড়ে। আর পরবর্তী পংক্তি একটা ঝাঁকুনি দিয়ে যেন আরম্ভ না হয়। পরবর্তী পংক্তির প্রথম অংশ যেন ছন্দের ঢেউ-এর উত্থানকে ধরে রেখে এগোতে পারে।"

'উত্তরফাল্গুনী' কাব্যগ্রন্থের 'শর্বরী' কবিতায় পূর্বসাফল্য অর্থাৎ বিষয়াশ্রয় ও অনুভূতিপুঞ্জের ঐক্যবোধকে সুধীন্দ্রনাথ বজায় রাখলেন তো বটেই, প্রবহমানতা কথ্যছন্দের ধ্বনিগুণে মর্যাদাবান হল শব্দরূপের অবিকৃতিতে, তদুপরি ক্রিয়াপদ ও অব্যয়াদির যথোচিত ব্যবহারে।—

"সহসা হেমন্তসন্ধ্যা রূপজীবী জরতীর মতো
অব্যর্থ ক্ষয়ের ব্যাপ্তি ঢেকেছিল অত্যন্ত রঞ্জনে।" ('শর্বরী')

এই কবিতার গুরুত্ব,—সুধীন্দ্রনাথ এখানে কথ্যছন্দের স্বরূপ উপলব্ধি করলেন। প্রবহমানতা যথোচিত শিল্পমর্যাদায় ব্যবহৃত হল। উপরন্তু, বৈনাশিক মহাকাল কর্তৃক উপদ্রুত ধূলিসাৎ গুহাচিত্র এবং এই অব্যর্থ ক্ষয়ের ব্যাপ্তিকে পটভূমিকা করে সুখশ্রান্ত ধনীর অতিক্রান্ত নাগরিক উৎসবের গ্লানি—এই ঘটনাচিত্রে সামগ্রিকতার পারবশ্য তিনি কার্যকর করেছিলেন।

'সংবর্ত' কাব্যগ্রন্থের 'যযাতি' এই রূপকল্পেরই পরিণততম রূপ। এবং 'শর্বরী' কবিতা এই সিদ্ধির পূর্বপ্রস্তুতির পূর্ণ সাক্ষ্য বহন করে। অর্থাৎ 'অন্ধকার', 'অর্কেস্ট্রা', 'সিনেমায়', 'শর্বরী'—এই উল্লিখিত কবিতা চতুষ্টয়ের মধ্যস্থতায় গ্রহণ-বর্জনের তিনি যে-অনবচ্ছিন্ন অনুশীলন করে গিয়েছিলেন, 'সংবর্ত' কাব্যগ্রন্থের 'যযাতি' তার সাফল্যময় উদাহরণ—

"……এবং বিজ্ঞান বলে
পশ্চিম যদিও আয়ুর সামান্য সীমা বাড়িয়েছে
ইদানিং, তবু সেইখানেই মৃত্যুভয় যৌবনের
প্রভু, বার্ধক্যের আত্মাপহারক।"

'যযাতি' কবিতায় মানুষের স্বপ্নভঙ্গজনিত বিবিক্তির বিষাদ ব্যক্ত করতে গিয়ে সুধীন্দ্রনাথ আত্মবিলোপ ঘটালেন রবীন্দ্রনাথের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'-র ভাবানুষঙ্গের মধ্যে, সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রসঙ্গের সমানুপাতে, র‍্যাবোর স্বপ্নভঙ্গের বিবৃতি ও দেবযানী-শর্মিষ্ঠার কলহকলাপের মধ্যস্থতায়। ভবিষ্যৎ কবিযশোপ্রার্থীদের পক্ষে যা প্রধান লক্ষণীয় বিষয়, তা হচ্ছে বিষয়াশ্রয় বলতে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' বা রবীন্দ্রনাথের 'গান্ধারীর আবেদন'-এর আখ্যানধর্মিতা সুধীন্দ্রনাথ বোঝেন নি।

সুধীন্দ্রনাথ কেন, এই কাব্যাদর্শের যে কোনো সাধকের পক্ষেই ঐ পর্যবেক্ষণ রক্ষাকবচের তুল্যমূল্য হিশেবে বিবেচিত হবে। 'যযাতি' কবিতাটি প্রসঙ্গে এইসব কথা বলার কারণ এই যে, নাট্যধর্মী কবিতার চরিত্র মোটামুটিভাবে আমাদের সাহিত্য বিবেচনার বহির্ভূত। এই কাব্যরূপের প্রসঙ্গে আমাদের 'গান্ধারীর আবেদন' ছাড়া আর কিছুই মনে পড়ে না। তাই আমাদের ভবিষ্যৎ কবিযশোপ্রার্থীদের কাছে সুধীন্দ্রনাথ একান্তভাবে স্মরণীয়। কারণ বাঙালী পাঠকের কাছে যদি কাহিনীকাব্য ও নাট্যধর্মী কবিতার মৌল প্রভেদ সিকি অংশও পরিষ্কার হয়ে থাকে তবে সে-কৃতিত্বের প্রধান অংশীদার 'যযাতি' ও 'সংবর্ত' কবিতাদ্বয়ের প্রণেতা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। 'যযাতি' কবিতার পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে এখানে ঘটনা এসেছে কবির আত্মজৈবনিক পর্যবেক্ষণকে নৈরাত্ম্যমর্যাদা দেওয়ার স্বাভাবিক ইচ্ছায়, আখ্যান ফাঁদানোর পুরুষানুক্রমিক তাগিদে নয়। নাট্যগুণকে বাড়ানোর জন্য ছন্দ বা অন্ত্যানুপ্রাসকে 'বলাকা'-র কবিতাবলির মত পাঠকের শ্রুতিতে স্পষ্টত রাখা হয় নি। পক্ষান্তরে, এই কবিতায় অন্ত্যানুপ্রাসের পারম্পর্য যেমন স্থানে স্থানে রক্ষিত হয়েছে তেমনি অন্ত্যানুপ্রাসকে আবার পদমধ্যস্থ করে অনুপ্রাসের ধ্বনিপরিমিতিকে আমাদের অবচেতনের গভীরে স্থান দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন কবি। এই ছন্দোপরীক্ষা যে সুধীন্দ্রনাথ খুব সচেতনভাবে করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় বুদ্ধদেব বসুকে লিখিত কবির চিঠিতে। —"দ্বিতীয় স্তবকে চাক্ষুষ মিত্রাক্ষর যাতে কানে না পৌঁছায়, সে-চেষ্টায় বিরাম পর্ব-পর্বাঙ্গের অনুগামী।"—এই ছিল কবির সচেতন শিল্প অভিপ্রায়।

ফলে, যেমন 'যযাতি' তেমনি 'সংবর্ত'-নাম কবিতা সেইসব কবির কাছে অতিশয় মূল্যবান উদাহরণ যাঁরা নাট্যধর্মী কবিতা লিখিতে ইচ্ছুক। 'যযাতি'র রূপকল্পের মতো 'সংবর্তে'-র রূপকল্পেরও প্রথম কবি রবীন্দ্রনাথ, যদিও সাহিত্যের

ঐতিহাসিক মুক্তবন্ধ অক্ষরবৃত্তের ব্যাপারে গিরিশ ঘোষকেই আবিষ্কারকের সম্মান দেবেন। কিন্তু গিরিশ ঘোষের কাছে মুক্তবন্ধের রূপকল্প কবিত্বহীন নির্মোকমাত্র, তাই আমি অন্তত রবীন্দ্রনাথকেই এই রূপকল্পের প্রথম কবি বলব, কারণ তাঁর কলমেই মুক্তবন্ধ প্রথম কবিতা হয়ে উঠছে। 'সঞ্চয়িতা'র ভূমিকায় নিজের কাব্যেতিহাসের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথও এই কথাই বলেছিলেন যে তাঁর কাব্যেতিহাসের সেখান থেকেই সূচনা, যে পর্যায় থেকে তাঁর পদ্য কবিতা হয়ে উঠছে। যাই হোক পংক্তির হ্রাস-দৈর্ঘ্যে রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর কবিতাকে আবেগবাহী করে তুলেছিলেন, 'সংবর্তে'র উক্ত হ্রাস-বৃদ্ধিতে কথোপকথনের ধ্বনিগুণ-ই মর্যাদা পেয়েছে।

কিন্তু 'যযাতি-র মতো 'সংবর্ত' কবিতাটির সাফল্যও সুধীন্দ্রনাথের তিরিশ বৎসর-ব্যাপী নিরন্তর সাধনার ফল। সুতরাং পুনর্বার স্মরণ্য যে, ঐ শ্রুতিসিদ্ধিতেও তিনি রাতারাতি পৌঁছোন নি। 'তন্বী' গ্রন্থভুক্ত 'অতন্দ্রায়' কবিতাটি লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে এই কবিতার আষ্টেপৃষ্ঠে রয়ে গেছে রবীন্দ্র -মুক্তবন্ধের সমস্ত বর্জনীয় ত্রুটি। 'অর্কেস্ট্রা'য় এই রূপকল্পের অনেকগুলি বৈফল্যময় দৃষ্টান্ত আছে। তবে ঐ গ্রন্থের 'নাম' কবিতায় প্রথম তিনি অস্পষ্টভাবে অনুভব করেন যে কবিতায় গদ্যের প্রবহমানতার কার্যকারিতা গদ্যের যাথার্থ্যের গুণে মর্যাদাবান। অন্যথায় তা হয়ে উঠবে নিকৃষ্ট গদ্যের ভারবাহী ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা। অবশ্য যাথার্থ্যের প্রবর্তনে 'নাম' কবিতায় নাট্যগুণের লক্ষণ যদিও ধরা পড়ল, তবু 'উঠিছে', 'জমায়েছিল' ইত্যাদি ক্রিয়াপদ এবং 'উচ্ছলি,' 'বিকশি' ইত্যাদি কবিতার সুবিধাবাদী বিকৃতিতে কথ্যছন্দ এখানে ঘনীভূত হয়ে ওঠে নি, নীহারিকাস্তরেই থেমেছিল। পক্ষান্তরে, এই 'নাম' কবিতাতেই কথ্যছন্দের শ্রুতির ঈষৎ ইঙ্গিত-ও নিম্নলিখিত পংক্তিতে অনুভব করা যায়:

ক্রমাগত
তাদের পদাঙ্ক মুছে গেছে রৌদ্রে, ধারাপাতে, ঝড়ে!"

'ক্রমাগত' ও 'মুছে গেছে' এই দুটি শব্দ ও শব্দবন্ধ লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে, কথ্যছন্দের নির্ভরতা কোন্ জাতীয় শব্দের প্রয়োগে। আত্মসচেতন সুধীন্দ্রনাথ নিজেই যেহেতু লক্ষ্য করেছিলেন যে 'অর্কেস্ট্রা'র 'মুক্তছন্দ প্রায়ই শিথিল', তাই 'ক্রন্দসী' কাব্যগ্রন্থের 'সন্ধান' এবং তদপেক্ষা সাফল্যময় 'নরক' কবিতায় যাথার্থ্যের ভদবস্থা বজায় রাখা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছিল। পুনরায়, বিশেষত এই 'নরক' কবিতায় পরস্পরসম্বন্ধযুক্ত বিষয়াশ্রয়ের পরিণতির সন্ধানেও নেমেছিলেন

তিনি। উপরন্তু, শব্দের অবিকৃতি ক্রিয়াপদ ও অব্যয়াদির সুপ্রয়োগে যে কথ্যছন্দ শ্রবনসুভগ হয়ে ওঠে—এমনকী ভারী শব্দও যে সেখানে ধ্বনিপ্রবাহে বিঘ্ন আনে না—'ক্রন্দসী'-র 'নরক' কবিতায় সুধীন্দ্রনাথ তা প্রথম উপলব্ধি করেন।—

> "মনে হয় তাই
> আত্মরক্ষা হাস্যকর, সুসংকল্প মৌখিক বড়াই
> জীবনের সারকথা পিশাচের উপজীব্য হওয়া,
> নির্বিকারে, নির্বিবাদে সওয়া
> শবের সংসর্গ আর শিবার সদ্‌ভাব।
> মানসীর দিব্য আবির্ভাব,
> সে শুধু সম্ভব স্বপ্নে, জাগরণে আমরা একাকী।" ('নরক')

'উত্তরফাল্গুনী' কাব্যগ্রন্থে মুক্তবন্ধের উল্লেখ্য উদাহরণ পাওয়া যায় না। এবং 'নরক' কবিতাটির অন্ত্যানুপ্রাসে কিছু দুর্বলতা ধরা পড়লেও কথ্যছন্দের ভঙ্গি বা চাল যিনি লক্ষ্য করেছেন, 'সংবর্ত' কবিতাটির পূর্বাভাসও তাঁর গোচরীভূত। 'সংবর্ত' কাব্যগ্রন্থে এসে দেখি যে 'জেসন্' এবং 'সংবর্ত' কবিতাটি অনুভূতি-পুঞ্জের ঐক্যবোধে তথা পরস্পরসম্বন্ধযুক্ত বিষয়াশ্রয়ে নাট্যগুণ বহুগুণে সমৃদ্ধ। অপরদিকে শব্দের অবিকৃতি, বিশেষত ক্রিয়াপদ-অব্যয়াদির সুষ্ঠু প্রয়োগে গদ্যের যাথার্থ্য প্রবহমানতায় কোথাও আর ইতিপূর্বে কাব্যানুসৃত ক্লান্তিময়তাকে সঞ্চিত হতে দেয় নি। পাঠকের ধৈর্যচ্যুতির আশঙ্কা অনুভব করে 'জেসন্' বা বিশেষভাবে 'সংবর্ত' কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়ায় আমি বিরত থাকলাম। তবু একটি পুনরুক্তি এই প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় যে এই 'সংবর্ত' কবিতায় গদ্যের প্রবহমানতা ও যাথার্থ্য তো বটেই, পারম্পর্যপ্রধান অন্ত্যানুপ্রাসের উপস্থিতি কীভাবে সম্ভব, বিশেষ ধারাবাহিক আখ্যানের পরিবর্তে বিচ্ছিন্ন প্রসঙ্গ বা অনুষঙ্গকে কীভাবে একটি অখণ্ড রসসত্তার অনিবার্য অঙ্গসংস্থান হিশাবে ব্যবহার করা যায়—তার দৃষ্টান্ত এই কবিতাটি।

বস্তুত, সাধ থাকলেও সাধ্যের অভাব বশত মধুসূদন প্রবহমানতাকে আবিষ্কার করেই ক্ষান্ত হয়েছিলেন, কাজে লাগাতে পারেন নি। প্রবহমানতাকে স্বাচ্ছন্দ্যের উপায় মনে করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কাব্যজীবনের প্রথমযুগেই এইসব সংস্কারসাধ্য ত্রুটির প্রতি সুধীন্দ্রনাথ সচেতন থাকলেও রাতারাতি বাংলাকবিতার এই পুরুষানুক্রমিক ব্যাধিগুলিকে নিজের কাব্যশরীর থেকে তিনি ঝেড়ে ফেলতে পারেন নি। 'ঐন্দ্রী অতৃপ্তি' অথবা 'আত্মগ্লানি' যে-নামকরণই হোক, আসলে

এক প্রবল মানসিক অসন্তোষ সুধীন্দ্রনাথকে 'সংবর্তে'-র সিদ্ধরূপের সন্ধান দিয়েছিল। অধিকন্তু, আমার ধারণা, নাট্যগুণধর্মী কবিতা হিশেবে 'সংবর্ত' 'যযাতি' অপেক্ষা সফলতর উদাহরণ। মিশ্রানুভূতির নিরন্তরতা, প্রসঙ্গের নানাত্ব-ঘটিত সংঘট্টে 'সংবর্ত' 'যযাতি'-কে ছাড়িয়ে তো যায়ই, তাছাড়া 'যযাতি'-তে নাট্যগুণকে সমৃদ্ধ করে তোলার জন্য অন্ত্যানুপ্রাসবৈচিত্র্যে তিনি আপাত মনোযোগিতা দেখিয়েছিলেন। 'সংবর্ত'-এ কথ্যছন্দ আবিষ্কারের জন্য সেরকম কোনো প্রথাবিরুদ্ধতার আশ্রয় তিনি সচেতনভাবে গ্রহণ করেন নি। অন্ত্যানুপ্রাসের পারম্পর্য সত্ত্বেও ধ্বনির এই পরিমিতিকে পাঠকের অগোচরে রাখার এই বিশেষ কৌশলটি কাব্যনাট্যের প্রণেতার পক্ষে প্রণিধানযোগ্য বিষয়। আসলে অনুপ্রাসকে রক্ষা করে অনুপ্রাসকে পাঠকের শ্রুতির অগোচরে রাখা কৃতিত্বের ব্যাপার কখনোই নয়। বরং ছন্দের ধ্বনিকে আপাত-শ্রুতির অন্তরালে রেখে পাঠকের অবচেতনমনে তার প্রভাব বিস্তারে সমর্থ না হলে, অনুপ্রাসাদির প্রাকরণিক উপযুক্ততাসুদ্ধ আবার বিতর্কসাপেক্ষ হয়ে পড়ে।

এই কৃতিত্ব দাবি করে 'সংবর্ত'-এর অন্ত্যানুপ্রাস—

> "বীমাই জীবন
> বুঝি বটে, কিন্তু ঠিক মাসে মাসে কিস্তির জোগান
> দিতে গিয়ে বাজার খরচে পড়ে টান।
> অথচ ডাক্তারে বলে তন্তুক্ষয়
> এ-বয়সে নিতান্ত নিশ্চয় ;" ('সংবর্ত')

মুক্তবন্ধের মতো রবীন্দ্রনাথ ব্যবহৃত আঠারোমাত্রার অক্ষরবৃত্তকেও 'তন্বীর' আমল থেকেই সনেটজাতীয় প্রকরণ সিদ্ধির কাজে লাগানোতে সুধীন্দ্রনাথ যত্নবান হয়েছিলেন। 'তন্বী'-র 'শৃঙ্গার' কবিতাটি এইজাতীয় প্রয়াসের প্রাথমিক উদাহরণ। 'অর্কেস্ট্রা' কাব্যগ্রন্থে 'অপচয়' 'মহাসত্য', 'বিকলতা' ইত্যাদি কবিতার মধ্যস্থতায় এই রূপকল্পের পরিণতরূপ খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি 'সংবর্তে'র 'বিপ্রলাপ', 'কঞ্চুকী' ও 'সোহংবাদ' কবিতাত্রয়ের ভিতর। অধিকন্তু, আবেগের অতিপ্লবতার স্থানে যাথার্থ্যের ঋজুতাকে প্রবর্তিত করে যান্মাত্রিক মাত্রাবৃত্তে লিখিত 'শাশ্বতী' রবীন্দ্রনাথের 'নিমন্ত্রণ' কবিতা অপেক্ষা নিঃসন্দেহে পরিণততর। তবে অনুভূতিপুঞ্জের ঐক্যবোধ তথা পরস্পরসম্বন্ধযুক্ত বিষয়াশ্রয়ের গুণে, কথ্যবাচনভঙ্গিমায় 'ক্রন্দসী'-র 'উটপাখী' কবিতাটি এই জাতীয় রূপকল্পের পরিণততমরূপ। অধিকন্তু, বিষয়াশ্রয়ের দিক থেকে 'সংবর্ত' কাব্যগ্রন্থের '১৯৪৫'

কবিতাটি 'উটপাখী' কবিতাকে ছাড়িয়ে না গেলেও, রাজনৈতিক প্রসঙ্গের কবিতা হিশাবে '১৯৪৫' কবিতাটি বাংলাকবিতার ক্ষেত্রে উল্লেখ্য। এহেন মন্তব্যে সত্যেন্দ্রনাথ বা নজরুল ইসলামের কাব্যপাঠক, আশা করি, নিশ্চয়ই বিস্ময় প্রকাশ করবেন না। কিন্তু যাঁরা বিবেকী কাব্যপাঠক তাঁরা উপলব্ধি করেছেন যে 'সাম্যবাদী' কবিতার নজরুল বা 'গান্ধীজী' কবিতার সত্যেন্দ্রনাথ উপলক্ষকে লক্ষ্যের উপর স্থান দিয়েছিলেন। বিস্মৃত হয়েছিলেন যে রাজনৈতিক মতবাদের প্রতিষ্ঠা কবির কৃত্য নয়, কবির আত্মকৃত্য কাব্যসৃষ্টি। প্রসঙ্গত স্মরণ্য, লুক্রিটিয়াশের কবিতা সম্পর্কে এলিয়টের মন্তব্য। পদার্থবিদ্যা বা জ্যোতিষবিদ্যা সম্পর্কে লুক্রিটিয়াশের মতামত আজকের দিনে অগ্রাহ্য ঠেকলেও, এলিয়টের মতে, লুক্রিটিয়াশের কাব্যসিদ্ধির স্বীকৃতিতে তা কোনোদিনই বাদ সাধবে না।—

> "এ সকলে আজ তুমি কি নিরুৎসাহ
> বুঝেছ সাধুর শাঠ্যেই মজে শঠ?
> রাইনে জুড়ায় বার্সেলোনার দাহ
> স্পেনে নিষিদ্ধ যদিও ধর্মঘট।" ('১৯৪৫')

যে-প্রসঙ্গে এই পংক্তিচতুষ্টয় সুধীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন, ইতিহাসের ছাত্র ব্যতীত ভবিষ্যৎ মানুষের স্মরণে এ প্রসঙ্গ স্থান পাওয়ার কথা নয়। তবু গদ্যের যাথার্থ্য ও প্রবহমানতায়, ক্রিয়াপদ ও অব্যয়ের সুষ্ঠু ব্যবহারে, যুক্তাক্ষরের শিক্ষণীয় সুপ্রয়োগে—'১৯৪৫' কবিতাটি বাংলাকবিতার অনুকম্পায়ী পাঠক ও কবিদের চিরদিনই কাব্যপাঠ ও কাব্যসৃষ্টির উৎসাহ জোগাবে।

উপরন্তু, ছন্দোসিদ্ধিই মানেই একঅর্থে কাব্যসিদ্ধি। ফলে, এ আলোচনার প্রায় আদ্যন্ত সুধীন্দ্রনাথের ছন্দোবৈচিত্র্যের বিশ্লেষণে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। সুধীন্দ্রনাথ মুক্তবন্ধ মাত্রাবৃত্তের চর্চাতেও যে-কৃতিত্ব দর্শিয়েছিলেন তার উৎসসন্ধানে অগ্রসর হতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'সাগরিকা' কবিতার পরিবর্তে 'সোনার তরী'-র 'নিরুদ্দেশযাত্রা' বা 'বলাকা'র 'সবুজের অভিযান' ইত্যাদি কবিতার নামোল্লেখ করলে অনেকেই হয়তো বিচলিত বোধ করবেন। কিন্তু 'তন্বী'-র 'ভ্রষ্টলগ্ন', অর্কেস্ট্রা'-র 'চপলা' ও 'সংবর্তে'-র 'নান্দীমুখ' কবিতাবলির মধ্যস্থতায় মুক্তবন্ধ মাত্রাবৃত্ত রচনার শৈল্পিক প্রস্তুতি ধরা পড়ে। সুধীন্দ্রনাথের চোখের সামনে যদিও 'সাগরিকা' কবিতার দৃষ্টান্ত ছিল তবু অতিশিথিল ও অতিকথনদুষ্ট এই কবিতাটির পদাঙ্কে না চলে মুক্তবন্ধের সাফল্যের জন্ত 'নিরুদ্দেশযাত্রা' কবিতার হ্রাসবৃদ্ধিপ্রভব পংক্তির যাথার্থ্যের অনুশীলনই তিনি

মনঃস্থ করেন। এবং এই ব্যাপারে 'সংবর্ত'-এর 'নান্দীমুখ'-এর চাইতেও 'প্রত্যাবর্তন' কবিতাটিতে সুধীন্দ্রনাথের যে-উল্লেখ্য পরিবর্তন নিহিত আছে, 'দশমী'-র 'প্রতীক্ষা' বা 'নষ্টনীড়' কবিতাদ্বয়ে সে-পরিবর্তন স্পষ্টীকৃত।

আসলে 'দশমী'-র দশটি কবিতা যে-কারণে 'সংবর্ত'-এর কবিতাবলি থেকে পৃথক, সেই পার্থক্যের পূর্বাভাস এই 'প্রত্যাবর্তন' কবিতাটিতেই নিহিত আছে।—

'বামে বিস্তৃত নারিকেলবীথি—বনচ্ছায়া
স্বচ্ছ বিরল গ্রামের ধবল লেপে ;
দক্ষিণে জল—শ্যামলাবণ্যে মরীয়া মায়া
প্রখর পিপাসা লক্ষ যোজন ব্যেপে।...
বিশ্ব স্বাধীন : অম্বরে মীন ;
মাটির মমতা-মুক্ত তিমির পৃথুল কায়া॥" ('প্রত্যাবর্তন')

'সংবর্ত'-এর এই কবিতাটির পূর্বে চিত্রকল্পের ব্যবহার সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথ খুব সচেতন ছিলেন বলে মনে হয় না। অবশ্য 'শাশ্বতী' বা 'উটপাখী' কবিতায় চিত্রকল্পের উপস্থিতি আপতিক। অপরপক্ষে এও ঠিক সুধীন্দ্রনাথের মানসিকতাই বিশেষভাবে চিত্রকল্প সৃষ্টির অনুকূল। এই মন্তব্যের পক্ষে এইটুকু বলাই হয়তো যথেষ্ট যে, যাথার্থ্য ও অনুভূতিপুঞ্জের ঐক্যবোধ চিত্রকল্প সৃষ্টির সহায়ক। আবার এও স্মরণ্য, 'সংবর্ত'-কাব্যগ্রন্থের পূর্বাবধি ঐ দুটি গুণ সুধীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারেন নি। 'শাশ্বতী' ও 'উটপাখী' কবিতাদ্বয়কে তাই ব্যতিক্রমের পর্যায় ফেলা যায়। তবে যেটি প্রধানত স্মরণ্য তা হচ্ছে বাংলায় 'চিত্রকল্প' শব্দের অপেক্ষা ইংরেজীতে 'ইমেজ' শব্দটি অনেক বেশী বিপ্রলাপিত। কারণ যুগে যুগে এই শব্দটি ইংরেজী সাহিত্যে ভিন্নার্থে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। ফ্র্যাঙ্ক কার্মোড রচিত 'রোম্যানটিক ইমেজ' গ্রন্থটি পড়লে এই মন্তব্যের উপযুক্ততা প্রমাণ পাবে। ইয়েটস পর্যন্ত ইংরেজী কবিতায় 'ইমেজ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে 'ভিশন' অর্থে। কিন্তু হিউম-পাউণ্ড-এলিয়টের কাছে 'ইমেজ' যে-অর্থ বহন করে এনেছে তার সঙ্গে একান্তভাবে জড়িত আছে মিশ্রানুভূতির ঘটনাঘটন। লিরিক কবিতা যেহেতু বিশেষ মর্জির ব্যাপার, তাই শেলীর 'স্কাইলার্ক' কবিতায় মিশ্রানুভূতির বহুলাঙ্গতা অনিবার্য নয়। ফলে এই জাতীয় কবিতায় চিত্রের সন্ধান মেলে, কিন্তু চিত্রকল্প অকল্পনেয়। চিত্রকল্প সম্পর্কে পাউণ্ডের উক্তি খুব সরাসরি এবং আলোচ্য ধারণার প্রাসঙ্গিক।

—"চিত্রকল্পে পরিবেশিত হয় মনন ও আবেগের বহুলাঙ্গতা—যা সময়ের এক বিশেষ মুহূর্তের উদ্ভাসন।"

সুতরাং সুধীন্দ্রনাথে চিত্রকল্পের উপস্থিতি যতখানি অনিবার্য, যুগসন্ধির কবি হিশাবে জীবনানন্দে তা ততখানি আপতিক। অবশ্য 'আট বছর আগের একদিন' বা 'রাত্রি' কবিতায় চিত্রকল্পের সন্ধান মেলে এই কারণে যে এইসব কবিতায় লিরিকের মন্ময়তা ছেড়ে জীবনানন্দ পরস্পরসম্বন্ধযুক্ত বিষয়াশ্রয়ের প্রতি অনেকাংশে মনোযোগী হয়েছিলেন। অর্থাৎ যে-কাব্যান্দোলনের শুরু জীবনানন্দে, সুধীন্দ্রনাথে সেই কাব্যাদর্শের প্রতিষ্ঠা। কারণ সুধীন্দ্রনাথ জানতেন ও বুঝেও ছিলেন, রবীন্দ্রনাথেই লিরিকতার প্রতিষ্ঠা এবং আশিবৎসরের নিরন্তর সাধনায় রবীন্দ্রনাথই লিরিকতার আপাতসম্ভাবনা নিঃশেষিত করে দিয়ে গিয়েছিলেন। এতৎসত্ত্বেও 'তন্বী' কাব্যগ্রন্থ থেকেই লিরিকতার প্রতি বিরুদ্ধতা দেখিয়ে সুধীন্দ্রনাথ তাঁর সুমেরুপ্রমাণ স্বকীয়তাকে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করেন নি। কারণ 'বিধিবদ্ধ মৌলিকতা' আর 'প্রথাসিদ্ধ ভাবালুতা' সুধীন্দ্রনাথের মতে একই ভাবনার প্রকারান্তর ছিল। ফলে 'তন্বী' পাঠে এই কথাই ধারণা হবে যে, রাবীন্দ্রিকতা এইসব কবিতায় এমনই আষ্টে পৃষ্টে জড়িয়ে আছে যে সত্যেন্দ্রনাথও বোধহয় ততখানি রবীন্দ্রানুগতা দেখান নি। প্রকৃতপক্ষে, বাংলা কবিতার সাফল্য-বৈফল্যকে বহন করেই সুধীন্দ্রনাথ কাব্য সাধনায় অগ্রসর হন। অর্থাৎ নেতি নেতি করেই তিনি 'সংবর্ত' ও 'দশমী'-র সিদ্ধিতে উপস্থিত হয়েছেন। বস্তুত পরিণত কবি হিশেবে সুধীন্দ্রনাথ সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন নি। ক্রমশ পরিণতির দিকে তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন।

ফলত, যেমন 'আরস্তিল' নামধাতু বা 'এবে'-র মত সুবিধাবাদী কাব্যিক বিকৃতি দিয়ে সুধীন্দ্রনাথের কাব্যারম্ভ হয়েছিল, তেমনি তাঁর অন্ত্যপর্বের কবিতাই প্রমাণ করেছিল যে কথ্যছন্দের স্বাভাবিক উচ্চারণপদ্ধতি কতখানি শ্রুতিরম্য। ক্রিয়াপদ বা অব্যয়ের অস্থির প্রয়োগ না ঘটিয়ে অতিশিথিলতায় প্রবহমানতার উদ্দেশ্য ব্যাহত না করে, নিকৃষ্ট গদ্যের অতিকথনদুষ্টতায় কবিতায় রসবিঘ্ন না এনে সুধীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার পথপ্রদর্শক। যখন বাংলা কবিতায় রাবীন্দ্রিকতা দৃঢ়মূল, সুধীন্দ্রনাথই তখন রাবীন্দ্রিকতার চর্বিতচর্বণ অনুকৃতির শূন্যগর্ভতা থেকে উদ্ধার করে বাংলা কবিতাকে মুক্তির ভিন্নপথ দেখালেন। অব্যবহিত ও পরবর্তী বাংলা কবিতা তাঁর প্রয়াস ও আদর্শের দ্বারা

যে অনুপ্রাণিত হয়েছিল বা পরোক্ষভাবে সে প্রেরণা এখনো যে ক্রিয়াশীল তা দৃষ্টান্তসহ প্রমাণ সম্ভব।

উপরন্তু, যে-কারণে সুধীন্দ্রনাথ বর্তমান কবিযশোপ্রার্থীদের উদাহরণস্বরূপ তা হচ্ছে বাংলা কবিতায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিস্বরূপের প্রভেদ তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন। কামিংসের উৎভটতায় শূন্যগর্ভতাই যে স্বতোপ্রমাণ পাউণ্ড-এলিয়টের প্রাতিস্বিকতার তুলনামূলক বিচার প্রসঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের কাছে তা সুস্পষ্ট। ফলে, রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রপূর্ব বাংলা কবিতার লক্ষণাদিকে বর্জন করে সুধীন্দ্রনাথ কাব্যসাধনায় অগ্রসর হন নি, বরং সেই লক্ষণাদিকে গ্রহণ করেই বর্জনের উপায় তিনি ভেবেছিলেন। তিনি প্রমাণ করেন, স্থির লক্ষ্য ও পূর্ব প্রস্তুতি বিনা রবীন্দ্রোত্তর যুগে কাব্যসিদ্ধি স্বকপোলকল্পনামাত্র। ফলত, তাঁর কবিতা প্রসঙ্গেই একথা আজ সত্য যে সংলেখক ও সংপাঠকের প্রভেদ হচ্ছে এই যে, প্রথমজন লেখেন এবং দ্বিতীয়জন লেখেন না। এতদ্‌ব্যতিরেকে যে শিক্ষা-দীক্ষা-একাগ্রতা কাব্যসিদ্ধির একমাত্র উপায়, 'রসজ্ঞ' উপাধিও সেই সমান সাধনার অপেক্ষা রাখে। এবং সুধীন্দ্রনাথ নিজেও এব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন বলেই অডেন প্রসঙ্গে একসময় তিনি মন্তব্য করেন যে প্রাচ্য অপেক্ষা পাশ্চাত্যে কাব্যপ্রতিষ্ঠা হয়তো সুকর। অবশ্য সুধীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য যে অনেকাংশে অনুমান ও খানিকটা ধিক্কারবোধ থেকে জাত, পাঠক তৈরির জন্য এজ্‌রা পাউণ্ডের প্রয়াসের কথা যাঁদের জানা আছে, তাঁরাই এটা উপলব্ধি করতে পারবেন। সুধীন্দ্রনাথের পর এদেশে যাথার্থ্যের চর্চা সুভাষ মুখোপাধ্যায়তেই প্রায় এ করকম শেষ। কিন্তু, যেসব কবি সুধীন্দ্রনাথের পর লিরিকে প্রত্যাবর্তন দেখিয়েছেন, তাঁরা এখনও প্রমাণ করতে পারেন নি যে লিরিক আর শূন্যগর্ভ বাতাবরণ নয়। পক্ষান্তরে, আমি জানি, যে-দুচারজন বর্তমান কবি যাথার্থ্য বা বিষয়াশ্রয়ে কিছু কিছু মনোযোগিতা দেখাচ্ছেন, তাঁরা এখনই অংশত প্রমাণ করেছেন যে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পরেও সুধীন্দ্রনাথের কাব্যাদর্শ সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের দিশারী।

তন্বী প্রসঙ্গে

ক., তন্বী : প্রথম প্রকাশ ১৩৩৭। ১৯৩০। এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স ; ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা। প্রকাশক : শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার।

খ. উৎসর্গ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রীচরণে

অর্ঘ্য

ঋণশোধের জন্য নয় ঋণস্বীকারের জন্য'।

গ. রচনাকাল : ২৩ অক্টোবর ১৯২৪ থেকে ৯ মার্চ ১৯৩০।

ঘ. 'তন্বী' প্রকাশের সময় কবির বয়স : ২৯ বছর।

ঙ. এই বই-এর ভূমিকা থেকে একটি অনুচ্ছেদ :

পরবর্তী কবিতাগুলোর উপরে স্বদেশী বিদেশী অনেক কবিই ছায়াপাত করেছেন—সবসময়ে গ্রন্থকারের সম্মতিক্রমে নয়। কেবল রবীন্দ্রনাথের ঋণ সর্বত্রই জ্ঞানকৃত। সত্য বলতে কি, সমস্ত বইখানা খুঁজে, যদি কোনও খানে কিছুমাত্র উৎকর্ষ মেলে, তবে তা রবীন্দ্রনাথের রচনারই অপহৃত ভগ্নাংশ ব'লে ধ'রে নেওয়া প্রায় নিরাপদ। তবু এই চুরির জন্যে আমি লজ্জিত নই, কেননা শুধু সুন্দরের মোহ যে-চোরকে পাপের পথে ডাকে, সে নিশ্চয়ই নীতিপরায়ণ নয়, কিন্তু রূপজ্ঞ বটে। ওই লুন্ঠিত সম্পদের একটা বিস্তারিত তালিকা এইখানে দিতে পারলে, হয়তো, মহাবিদ্যার অপবাদটা অনেকখানি লঘু হত। কিন্তু সে-লোভ পরিহার করছি, কারণ পাঠকের বিদ্যাবুদ্ধির প্রতি আমার শ্রদ্ধা অগাধ। এই প্রসঙ্গে স্বর্গীয় আনাতোল ফ্রাঁসের উপদেশ উল্লেখযোগ্য। তিনি একবার এক কবিযশঃ প্রার্থীকে বলেছিলেন, "পূর্বগামীর ঋণ কখনও স্বীকার

কোরো না। সে-কৌশলে অধর্মের বোঝা তো তিলমাত্র কমবেই না, বরং হারাবে পাঠকের দরদ। পণ্ডিত ভাববে, তুমি করছ তার অখিল বিস্তার প্রতি কটাক্ষ; মূর্খের মনে হবে তার অজ্ঞতা আর তোমার কাছে ঢাকা রইল না।" উপরন্ত আমার অনুতাপে পাঠকের কোনও দাবি নেই, তাতে যাঁর অধিকার, তাঁর ক্ষমায় কিছুতেই বঞ্চিত হব না।[২]

২.

রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে[৩] সুধীন্দ্রনাথকে লেখেন: তোমার বইখানি[৪] পেয়ে খুসি হলুম। এইটে হোলো বাঁধি বুলি। যাকে পাঠিয়েচ সেই হয়তো এই কথাটা দিয়েই চিঠি আরম্ভ ক'রেচে। অতএব ঐ বাক্যটা বাদ দিলেও চলত। বাদ দিতুম যদি সত্যিই খুসি না হতুম। তোমার কবিতাগুলি হঠাৎ আমার মনটাকে বাংলামুখো ক'রে দিলে। চলেছিলুম একেবারে উল্টোদিকে। ভালো লাগল। ছন্দে ভাষায় ব্যঞ্জনায় লেখাগুলি বেশ জমাট হয়েচে। আমার কাছে ঋণস্বীকার ক'রে আজকের দিনের বাংলাদেশে তুমি অসামান্যতা দেখিয়েচ। একেবারেই সাহস করতে না যদি ঋণটা বাহিরের জিনিষ না হ'ত। কাব্যে তোমার একান্ত স্বকীয়তা আর সমস্ত কিছুকে অতিক্রম ক'রে প্রকাশ পেয়েচে।

আর একটি চিঠিতে[৫] লেখেন: তোমার প্রথম কবিতার বই[৬] বের হোলে কিছুদিন অপেক্ষা করেছিলেম। দেখবার কৌতূহল ছিল লোকে কী বলে। দেখলুম ভালোমন্দ কিছুই বললে না। তাতে বিস্ময় বোধ হয়েছিল কিন্তু এটা বুঝতে পেরেছিলুম ক্রিটিকরা যা হোক কিছু একটা বলতে ভরসা পাচ্ছিল না। সাহিত্যে নতুন রূপের আবির্ভাব দেখলে বাঁধামতওয়ালারা সাধারণতঃ তাড়া করে আসে। কিন্তু যদি ভালো লাগে তা হোলে কী বলবে ভেবে পায় না। ভালো লাগা উচিত কিনা ঠাহর করতে পারে না। প্রথমটা তোমার ভাষার অপরিচিত দুরূহতায় গোল বাধে। কিন্তু তার ভিতর দিয়েও তোমার যে স্বকীয়তা দেখা যায় তাতে বিদ্রূপ করবার অবসর পেলেও বিরুদ্ধবাণীকে থামিয়ে দেয়। তোমার শত্রু মিত্র কেউ তোমার বইখানিকে কোনো সম্ভাষণই করলে না—অনায়াসে নিন্দা করতেও পারেনি, অনায়াসে ভালো বলতেও দ্বিধা বোধ করেছে। তোমার কাব্য এসেছে সাহিত্যক্ষেত্রে অপরিচিত বেশে—স্পর্ধিত আধুনিকতার তারস্বরও তার নয়, সাবেক আমলের মধুর সৌজন্যেরও অভাব আছে।

রবীন্দ্রনাথের এই চিঠিখানির তারিখ ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫। শান্তিনিকেতন থেকে লেখা। এই সেপ্টেম্বরেই বেরিয়েছিল সুধীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'অর্কেস্ট্রা'।

বুদ্ধদেব বসু আরও দশ বছর পরে অর্থাৎ ১৯৪৫ সালে লেখা তাঁর 'কালের পুতুল' প্রবন্ধে সুধীন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গে ঐ প্রবন্ধের একটিমাত্র নির্জন পাদটীকায়[৭] আমাদের জানান : লোকমুখে যা শুনেছি তাতে মনে হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'তন্বী'তে হয়তো এর ব্যতিক্রম আছে। কিন্তু 'তন্বী' কখনো আমার চোখে পড়েনি।

'তন্বী' বেরিয়েছিল ১৯৩০ সালে। এই পনেরো বছরে (১৯৩০ থেকে ১৯৪৫) এমন কী বুদ্ধদেব বসুও যে বইটি দেখেন নি, এটি আমাদের জন্যে একটি খবর বটে। হয়তো কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথই একাধিক চিঠিতে 'তন্বী'র প্রতি তাঁর পক্ষপাত সুধীন্দ্রনাথকে সরাসরি জানিয়েছিলেন। এই বই যে রবীন্দ্রনাথের অনুমতিক্রমে ছাপা হয়েছিল সে খবর আমরা শুনতে পাই রবীন্দ্রনাথকে লেখা সুধীন্দ্রনাথের একটি চিঠিতে[৮] : আপনার অনুজ্ঞা না নিয়ে ছাপাখানার কবলে পড়িনি।

তবে বইটি যে নেহাত নগণ্য ছিল না পরবর্তীকালের একটি প্রবন্ধে[৯] বুদ্ধদেব সে কথা লিখেছিলেন : 'এখানেও তাঁর রীতিগত স্বকীয়তার লক্ষণ সুস্পষ্ট, এখানেও এমন আভাস আছে যে এই নবাগত রবীন্দ্র-ঋণী কবি একজন সম্ভবপর পথিকৃৎ। ধরা যাক বইয়ের প্রথম কবিতার প্রথম স্তবকটি :

অধুনা-আনীত নব অলিখিত
লেখনী মোর,
কি জানি কেমন ভাগ্য লিখন
আছে রে তোর!
মুখাগ্রে তোর ছুটিবে কি গান?
পাবি লাঞ্ছনা? মিলিবে কি মান?
কোথা কবে হবে কাজের খতম,
নেশার ভোর,
জানি না, এইতো জাগিলি প্রথম,
লেখনী মোর!

কবিতাটি যেন সুধীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'; ছন্দ, স্তবক ও মিলের ঝংকারে, আর বিশেষত 'মুখাগ্রে তোর ছুটিবে কি গান? / পাব লাঞ্ছনা? মিলিবে কি মান?'—এই পঙক্তি দুটিতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে; কিন্তু কবির যাত্রারম্ভের চিত্রকল্প হিসেবে এখানে ব্যবহৃত হল—নৈসর্গিক নির্ঝর নয়, একটি দোকানে-কেনা কলে-তৈরি ফাউন্টেনপেন, একটি সাধারণ ঘরোয়া সামগ্রী, যার দ্বারা, ধরে নেওয়া যায়, বস্তুতই এই কবিতার পাণ্ডুলিপি রচিত হয়েছিল। অর্থাৎ চিত্রকল্পটি আবহমান নয়, ব্যক্তিগত,-সমকালীন, গদ্যধর্মী—এবং এতেও সূচিত হল এক নতুন যুগলক্ষণ। রবীন্দ্রনাথের সন্দেহ ছিল না তাঁর যাত্রা সফল হবে, কিন্তু আধুনিক কবি দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আন্দোলিত। তাছাড়া 'কোথা হবে তোর কাজের খতম,/নেশার ভোর'—বহু তৎসম শব্দের পরে এই আকস্মিক অসংস্কৃত 'খতম' শব্দটি, আর তারপরেই 'সমাপ্তি' অর্থে পুরোনোগন্ধী 'ভোর', আর তারপরে 'খতম'-এর সঙ্গে 'প্রথম'-এর অন্ত্যানুপ্রাস: আমি একবার যাকে বলেছিলুম সুধীন্দ্রনাথের 'অপরূপ গুরুচণ্ডালী', এটাই বোধহয় তার প্রথম উদাহরণ। 'খতম-প্রথম': এই মিলটি চমকপ্রদ, কল্পনা করা শক্ত যে রবীন্দ্রনাথ, তাঁর কৌতুক কবিতায় ছাড়া, এই ধরণের কোনো মিল প্রয়োগ করেছেন। এই 'গুরু চণ্ডালের' পথে আরো অগ্রসর হয়েছিলেন সুধীন্দ্রনাথ; কী পদ্যে, কী গদ্যে, গম্ভীর সংস্কৃত শব্দের সংসর্গে হালকা দৈশিক শব্দের ব্যবহার তাঁর পরিণত শৈলীর একটি চরিত্রলক্ষণ। 'গুরু-অগুরু', 'দ্বিধা-মলিদা', 'ক্ষণবাদী-তামাদী', 'লহমা-প্রথা'—এই মিলগুলি যার কোনো-কোনোটি লুক্কায়িত—সবই তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থ 'দশমী'[১০] থেকে আসছে।

আলোচ্য কবিতাটির নাম 'নবীন লেখনী', (রচনা তারিখ: ১৫ মে, ১৯২৬) যে কবিতাটি সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথ তাঁর উত্তেজিত অতৃপ্তি ও লজ্জার কথা রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠিতে[১১] লিখেছিলেন। হেতু রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'বাংলা কাব্যপরিচয়'[১২] গ্রন্থে 'নবীন লেখনী' স্থান পেয়েছিল। সুধীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: 'তন্বী' বইখানায় এই রকম খারাপ কবিতা একাধিক আছে। কিন্তু তার মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট নিশ্চয় 'নবীন লেখনী'। তাই সেটার পুনর্মুদ্রণে আমার ঘোরতর আপত্তি।

এতদ্ সত্ত্বেও বুদ্ধদেব বসু, এবং আমরাও, এই 'নবীন লেখনী'তেই সুধীন্দ্রকাব্যের ভবিষ্যৎ মুদ্রিত দেখি: 'নবীন লেখনী' কবিতার প্রধান গুণ এক যত্নসাধিত পরিচ্ছন্নতা, যা রাবীন্দ্রিক ছন্দ ও শব্দবন্ধ অতিক্রম করেও রসজ্ঞ

পাঠকদের চিত্তে অনুভূত হয়।[১৩] এমনকী, 'তন্বী'র সংক্ষিপ্ত ভূমিকার গদ্যেও সুধীন্দ্রনাথের পরবর্তী গদ্যের মূল কাঠামোটাকে বুদ্ধদেব সনাক্ত করতে পেরেছিলেন।[১৪]

তাই বিষম খটকা লাগে যখন বুদ্ধদেব 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহে'র ভূমিকাতে[১৫] লেখেন: 'এই গ্রন্থের ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দু একটি কথা বলা দরকার। 'অর্কেস্ট্রা' থেকে 'দশমী' পর্যন্ত কালানুক্রমে সাজিয়ে, 'তন্বী'কে স্থান দেওয়া হলো 'দশমী'র পরে।' কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন: 'কেননা, আমার বিশ্বাস, সুধীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে আদ্যন্ত পরিশোধন না ক'রে 'তন্বী'র পুনঃ প্রকাশে রাজী হতেন না; এবং বর্তমান অবস্থায়, ঐতিহাসিক অর্থে সুধীন্দ্রনাথের প্রথম পুস্তক ব'লে, এর বিষয়ে আগ্রহান্বিত হবেন তাঁরাই, যাঁরা লেখকের পরবর্তী রচনাসমূহের সঙ্গে পরিচিত। তাই 'তন্বী'কে এই গ্রন্থের প্রথমে স্থান দিতে আমার বিবেকে বাধলো; মনে হ'লো, অন্যান্য রচনা প'ড়ে আমার পরে 'তন্বী'তে পৌছনো পাঠকের পক্ষে অধিক সঙ্গত হবে।'

কিন্তু এই যুক্তি অসার না হলেও, খুব একটা গ্রাহ্য লাগে না। বরঞ্চ বহুলাংশে পরস্পর বিরোধী ঠেকে। 'তন্বী' তো হঠাৎ-জেগে-ওঠা কোনো ভূখণ্ড ছিল না। ১৯২২, বঙ্গাব্দ ১৩২৯, সুধীন্দ্রনাথের বয়স যখন একুশ, থেকে ১৯৩০, বঙ্গাব্দ ১৩৩৭, সুধীন্দ্রনাথের বয়স যখন উনত্রিশ,—এই আট বছরের পরিশ্রমী অনুশীলন এবং আত্ম-আবিষ্কারের ফল ছিল এই 'তন্বী'। দুরূহের দারুণ আকর্ষণে-রচিত। এই বই ছিল না, রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছিলেন: 'অল্প বয়সের যে-সকল রচনা স্খলিত পদে চলতে আরম্ভ করেছে মাত্র, যারা ঠিক কবিতার সীমার মধ্যে এসে পৌঁছয় নি।' ছিল না 'অপরিণত মনের প্রকাশ অপরিণত ভাষায়।'[১৬]

তাই সঞ্জয় ভট্টাচার্য লিখেছিলেন[১৭]: সুধীন্দ্রনাথের 'নবীন লেখনী' যেদিন প্রথম জাগল সেদিনটি হয়ত গৃহকোণ বিদেশী সাহিত্যে উৎসাহী কবিকে নানা ইন্দ্রজাল দেখাচ্ছিল যার সঙ্গে পরিচয়-গ্রন্থী বন্ধন করতে পরবর্তী বহু কাব্যপ্রবণ মন অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু প্রথম দিনে তিনি 'নব অলিখিত লেখনী' নিয়ে জানতেন না 'কী জানি কেমন ভাগ্য লিখন' তার আছে। তাই লেখকের জিজ্ঞাসু মন লেখনীকে প্রশ্ন করেছিল:

> তোর অন্তরে কভু কি শিহরে,
> উঠিবে রবি

স্ফীত ধমনীর লহর অধীর
নাটনধ্বনি ?
তোরে দিয়ে কভু হবে কি রচন
প্রণয় লিপির ব্যাকুল বচন ?

কল্লোলযুগের চিত্র এ কথাগুলোতে ব্যক্ত। সুধীন্দ্রনাথ আকস্মিক দৃশ্যপট রচনা করে আবির্ভূত হননি। কল্লোল-অধ্যায়েও প্রশ্নপাত করে অগ্রসর হয়েছেন। তিনি জানেন লেখকের পথের বাধা 'অশ্রুর নদী, শাসনের শিখা,/হিংসার চিত্র, যশমরীচিকা' এবং জানতেন তার দরুন লেখনীর 'গমন চোর' ভঙ্গির কথা। তবু যখন লেখনী ধারণ করলেন এই ব্যক্তি, তখন তাঁর মনে এই অঙ্গীকার ঝঙ্কৃত হয়েছিল :

জ্বেলে দিবে সহমরণের চিতা
তোর ও মোর ॥

আমরণ লেখকের জন্ম হল সেদিন। তারপর 'অবরুদ্ধ পরান পথলে' তিনি দেখতে পেলেন 'উন্মাদ শ্রাবণবন্যা ছুটে আসে ভৈরব নিঃস্বনে'।[১৮]
যেন দ্বার খুলে গেল !

সুধীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে ধূর্জটি প্রসাদ-এর একটি মন্তব্য মনে পড়ে [১৯] রচনাকে সে (সুধীন্দ্রনাথ) পারফেক্ট করতে চায়। 'তন্বী' (১৩৩৭) থেকে 'দশমী' (১৩৬৩) এই কাব্য-সপ্তর্ষিমণ্ডলের অন্তর-ইতিহাস এই একটি মাত্র একসূত্রে গ্রথিত করে। 'তন্বী' কাব্যেই এই দুশ্চর অন্বেষার, এই সপ্তপদী যাত্রার সূত্রপাত। এই দীক্ষার হাতে-খড়ি এবং প্রথম পাঠ, লেখা বহুল্য, রবীন্দ্রনাথেরই স্কুলে। 'তন্বী'র উৎসর্গ ও ভূমিকা তার অকাট্য প্রমান। সুধীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রযুগের মানুষ। তাঁর কাব্যচর্চা একরকম রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তনা ও প্রশ্রয়ে লালিত। এ বিষয়ে 'কুক্কুট'[২০] কবিতাটি রচনার নেপথ্য-কাহিনী তো কিংবদন্তী প্রতিম হয়ে আছে।

তাই রবিশস্যের স্বর্ণরাশিতে সুধীন্দ্রনাথের নৈতিক উত্তরাধিকার সহজেই বর্তেছিল। এটা কিছু নিন্দারও নয়। প্রসঙ্গত, জীবনানন্দের একটি উক্তি উদ্ধৃত করি[২১] : আধুনিক কালে দু-একজন বিশিষ্ট কবির প্রধান কবিতাগুলোও বার-বার রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়িয়ে দেয়। আরো দু-একজন ভালো কবি তাঁরই জিনিস নিয়ে সাধক হয়েছেন বলে মনে হয় ; কিন্তু জিনিস যারই হক তাকে উপকরণ হিসাবে গ্রহণ করে যদি রচনায় পৃথক সিদ্ধি পাওয়া যায় তাহলে শিল্পীর উপায় নিয়ে প্রশ্ন করার কোনো মূল্য নেই।

'তন্বী'তে সুধীন্দ্রনাথ এই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, উক্তিও উপলব্ধির সহযোগে, প্রসঙ্গ ও প্রকরণে রবীন্দ্রানুসরণ সত্ত্বেও। আর কেই বা আছেন, এই ১৯৭৪ সালেও,—আছেন কি কেউ, যিনি রবীন্দ্ররাজ্যের বশংবদ প্রজা নন?

সুধীন্দ্রনাথের নাস্তির দর্শনও, যা তাঁকে রবীন্দ্রনাথের একদম বিপরীত বিন্দুতে স্থাপন করেছিল, অন্তত তার বীজও, বস্তুতপক্ষে 'তন্বী'র প্রসঙ্গ ও প্রযুক্তির ভিতরে ভিতরে আক্রান্ত। তাই 'নিরাশাকরোজ্জ্বল'২২, তবে একেবারে নিচ্ছিদ্র নাস্তিও নয়। কয়েকটি উদ্ধৃতি :

সে যে অনামিকা
অনিত্যা মৃণ্ময়ী অল্পা, তবু তার রূপ মরীচিকা
নিশ্ছায় অমিত শূন্য মরুভূমি মাঝে
অন্তিম সম্বল সম দিশাহারা নয়নে বিরাজ॥ (তন্বী সে যে/তন্বী)

গ্লানি কলঙ্ককালিমা নিবিড়
বড় কঠোর?
জ্বেলে দিবে সহমরণের চিতা
তোর ও মোর॥ (নবীন লেখনী/তন্বী)

কণ্ঠ হতে থেমে যাক গান;
হউক আমার গতি, অন্তর্দগ্ধ উল্কার সমান,
ভাস্বর আলোক হতে চির-অন্ধ পাতালের কোলে,
বিস্মৃতির পঙ্কগর্ভে, অব্যক্তির অখ্যাত অতলে॥ (অন্ধকার/তন্বী)
আঁধার আঁধার ঘোর নিয়ত আঁধার
নীরব নিবিড় স্থির নিখিল আঁধার! (নিকষ/তন্বী)

'তন্বীর কাল থেকেই সুধীন্দ্রনাথের লক্ষ্য স্থির ছিল। বলা বাহুল্য যে, তিনি অর্জুনের মতো লক্ষ্য ভেদও করেছিলেন।

সুধীন্দ্রনাথ ছন্দ সচেতন কবি। সমসাময়িক কবিদের মধ্যে ছন্দোজিজ্ঞাসা এবং ছন্দ-সম্পর্কে আগ্রহ তাঁরই ছিল সব চাইতে বেশি। তাঁর কান ছিল নিখুঁত। বাংলার ত্রিবিধ ছন্দই, মধ্যমিল, অন্তর্মিল, অন্ত্যমিল, স্তবক বিন্যাস, যতিচিহ্ন ব্যবহার ইত্যাদি কারুকার্যের সূক্ষ্ম সহযোগে কবিতার স্বার্থে প্রথম

কাব্যগ্রন্থেই অন্তরঙ্গ শ্বাসপ্রশ্বাসের মতো সুধীন্দ্রনাথ ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। কবিতার অন্তে দুটো পূর্ণচ্ছেদের চল আমরা তাঁর কাছে থেকেই পেয়েছি। সুধীন্দ্রনাথ কবিতার শেষে তো বটেই, প্রতি স্তবকের শেষেও যুগল পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহার করতেন,—অবশ্য রবীন্দ্রনাথেও এই রীতি আংশিক ভাবে ছিল, কিন্তু সুধীন্দ্রনাথই প্রথম নীতি ও প্রয়োজনের নির্দেশে ধারাবাহিক ভাবে চালু করেছিলেন, 'তন্বী' থেকে 'দশমী' পর্যন্ত। একজন কবিযশঃপ্রার্থীর পক্ষে এই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয়, সুধীন্দ্রনাথ সেখানেই আত্মসন্তুষ্ট থেমে থাকেন নি। তাঁর প্রত্যেকটি কবিতার সযত্ননির্মান আমাদের অভিনিবেশ চুম্বকের মতো ধরে রাখে। সনেট রচনায় এমন শৈল্পিক স্থাপত্য, সংবৃত্তি এবং পরিপাট্য ঐ সময় আর কে দেখিয়েছে, জানি না। ১৯২৭ সালে হয়তো সম্ভব ছিল না। উদাহরণ হিশেবে 'তন্বী' থেকে একটি সনেট[২৩] এখানে তুলে দিচ্ছি:

হে শৃঙ্গার, যারা বলে অনুপম তোমার মাধুরী,
তাহারা অলীকভাষী কিংবা অজ্ঞ অন্ধ অচেতন,
মথিতপ্রণয়বিষে জরজর তব সংবেদন,
ধ্বংসের ফাটলে যেন সূর্যভীরু ক্লেদাক্ত দাদুরী॥

কোথা সে-অমৃতক্ষিপ্ত স্বর্গজয়ী রক্তিম উল্লাস,
সংকীর্ণসময়হন্তা নির্বাণের চরম আকৃতি?
এ শুধু আতঙ্কে-কাঁপা নিবৃত্তির নির্বাক্ কাকুতি,
বিধর্ষিত সম্ভ্রমের অশ্রুরুদ্ধ ব্যাহত নিঃশ্বাস॥
তব বিড়ম্বনাক্ষুব্ধ যত লোক, যুগে যুগান্তরে,
সে-সর্বনাশের দায় রেখে যায় পরম্পরাপরে,
অব্যক্তির শবাচ্ছাদে দুরাশার কঙ্কাল আবরে'॥

ভোগস্মৃতিমুগ্ধ আমি, আজি সেই চক্রান্তের ফলে
কান্তার ক্ষীনাস্থি তনু বক্ষে ধ'রে দুর্বিষহ বলে,
চেয়ে আছি তাপদগ্ধ বুভুক্ষার আবিল অতলে॥

পক্ষান্তরে, 'তন্বী'র নাম কবিতার[২৪] প্রবহমানতাও ভিন্ন স্বাদের আবহে বিস্ময়কর:

তন্বী সে যে।

জীবনের রুদ্র বহ্নি তাই কি নিস্তেজে
জলে ক্ষুদ্র চক্ষুদীপে তার ?
জগতে যা হেয়,
নিতান্ত নশ্বর দীন তুচ্ছ অবজ্ঞেয়,
তাদের সবার
নিঃসার নির্যাসে রচা সে-ভঙ্গুর কায়া।
তাই তার সংকুচিত ছায়া
রূপান্ধের দৃষ্টিপথে গর্বপুষ্ট মলিনতা ভরি,
ধরার অরূপ সিদ্ধি রাখেনা আবরি।
নম্র তার আশুতোষ ক্ষুধা
কখনও করে না দাবি অনুদার অমরার সুধা,
শুধু যাচে
পার্থিব সুরার ফেনা অপব্যয়ী বিলাসের কাছে।
সে জানে আপন সীমা,
তাই তার আশ্লেষের ক্ষীনাস্থি ভঙ্গিমা,
কালের কবল হতে কেড়ে,
পারেনা, সাবিত্রীসম, রক্ষিতে প্রেমের কঙ্কালেরে ; ইত্যাদি।

এই কবিতায় যা লক্ষণীয় তা হচ্ছে গদ্যের প্রভাব এবং প্রবহমানতা, যা ঐ সময় খুব একটা সহজলভ্য ছিল না। শঙ্খ ঘোষ সম্ভবত একেই বলেছেন সুধীন্দ্রনাথের ছন্দশাসন ২৫। ছন্দ ছেড়ে বেরিয়ে এসে নয়, ছন্দের মধ্যেই, ভিতর থেকে খুলে গিয়ে, এই প্রথম 'তন্বী' (১৯৩০) থেকে তাঁর শেষের গান অসামান্য 'দশমী' (১৯৫৬) পর্যন্ত, কাব্যের মুক্তি খুঁজেছিলেন তিনি, 'যেন অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময় / লভিব মুক্তির স্বাদ'॥

অরুণকুমার সরকার

'সংবর্ত' মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত

আজ পর্যন্ত বাংলা কবিতার প্রধানতম দুর্বলতা এই যে অধিকাংশ সময়েই তা নিরাবয়ব—হৃদয়বৃত্তির প্রকাশ মাত্র। এদিক থেকে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-র কাব্য অন্যতম ব্যতিক্রম; বিশুদ্ধ চিন্তাবস্তুই তাঁর কাব্যাবেগের মৌল উৎস। যে নৈরাশ্য তাঁর ভাবনা-বেদনার সঙ্গে ওতপ্রোত, তিরিশের অন্যান্য কবিদের মতো তা ব্যক্তিগত ব্যর্থতার আত্মবিলাপ নয়, বিচার-বিশ্লেষণ এবং অনুশীলনেরই পরিণাম। ফলত তাঁর কাব্য যতটা এ্যাটিট্যুড বা মুডে-র প্রকাশ, তার চাইতে ঢের বেশি বুদ্ধিগ্রাহ্য; এবং এইখানেই তাঁর সিদ্ধি যে স্বকীয় রচনারীতিকে ন্যায়শাস্ত্রের নিয়মানুগ রেখেও তিনি কদাচ আবেগের মুণ্ডপাত করেননি।

তাই সুধীন্দ্রনাথ যা বলতে চেয়েছেন তা অস্পষ্টভাবে বুঝে, চাই কি সময় সময় বুঝতে না পেরেও, তাঁর কবিতা যা হয়ে উঠেছে তা হৃদয়ঙ্গম তথা উপভোগ করা সম্ভব। কিন্তু তত্রাচ তাঁর সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণভাবে একমত হতে পারি না যখন তিনি বলেন, 'মালার্মে—প্রবর্তিত কাব্যদর্শনই আমার অম্বিষ্ট; আমিও মানি যে কবিতার মুখ্য উপাদান শব্দ: এবং উপস্থিত রচনা-সমূহ শব্দ প্রয়োগের পরীক্ষা-রূপেই বিবেচ্য।' 'সংবর্তে'র মুখবন্ধ থেকে উদ্ধৃত এই উক্তি, আমার ভয় হয়; কর্মক্ষেত্রে সুধীন্দ্রনাথের কবিতার দ্বারা সমর্থিত হয়নি। মালার্মে, যতদূর জানি, মোটামুটি এই কথাই বলেছেন যে, যেহেতু গান হয়ে ওঠাই কবিতার কৈবল্য, অনির্বচনীয়কে, অর্থাৎ বস্তুর অন্তঃসারকে, প্রকাশ করার প্রয়োজনে সত্যিকারের কবিতা অনতিব্যক্ত হতে বাধ্য। সুতরাং কবির পক্ষে ব্যাকরণ-লঙ্ঘন দূষণীয় তো নয়ই, বরং আভিধানিক অর্থকে পরিহার করে শব্দগুলোকে ভেঙেচুরে গানের উপাদান করে তোলাই তাঁর লক্ষ্য হওয়া উচিত। কেননা, ভাবনার দ্বারা নয়, মালার্মের মতে শব্দের দ্বারাই কবিতা লেখা হয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যাই বলুন না কেন, কথা নিয়ে মাতলামি করা

তাঁর স্বভাবের ত্রিসীমানায় নেই। তাঁর কবিতা চিন্তারই আবেগরূপ; এবং যেহেতু শব্দ ব্যতিরেকে চিন্তার প্রকাশ শিবেরও অসাধ্য, সেই কারণেই কথার প্রতি তাঁর আসক্তি। কথা এবং শব্দ দিয়ে অভাবনীয় অচিন্ত্যনীয়কে অস্পষ্টতার আলো-আঁধারিতে প্রত্যক্ষ করা, আর যাই হোক, তাঁর অভ্যাস নয়। অর্ধস্ফুট দৈনিক মৃদু শব্দ তিনি প্রায় ব্যবহারই করেন না; সমাসবদ্ধ যুগ্ম ভারী ওজনের শব্দের দিকেই তাঁর ঝোঁক। পরিণামে, তাঁর কবিতায় যে ধ্বনির সম্মোহন সৃষ্ট হয় তা কখনই তাঁর উপলব্ধিকে ছাপিয়ে ভিন্ন পরিবেশে পাঠককে উপস্থিত করে না, বরং তাঁর বক্তব্যের দিকেই আমাদের অধিকতর আকৃষ্ট করে; অর্থাৎ ভাসিয়ে নিয়ে যায় না। ফলত সুধীন্দ্রনাথের কবিতার বাক্যগঠনরীতি শুধু যে অবিকল গদ্যের ব্যাকরণ মেনে চলে তা-ই নয়, মাত্রাবৃত্তে তাঁর অসামান্য দখল সত্ত্বেও বোঝা যায় পয়ারই, বিশেষ করে ১৮ মাত্রার, তাঁর মেজাজের অনুকূল, যেহেতু সেখানেই দুরূহ চিত্রকল্প এবং বক্তব্যকে আয়ত্তে আনা সম্ভব। তাই আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে যে পাঁচটি রচনা, অর্থাৎ 'পথ', 'যযাতি', 'জেসন', 'উজ্জীবন' এবং 'নাম' কবিতাটি, আমার বিবেচনায় সমধিক মূল্যবান, সে-গুলি পয়ারেই রচিত।

আর উচ্ছ্বাসের প্রতি সুধীন্দ্রনাথের অনীহা এতই প্রকট যে সর্বদা স্বরবর্ণের, বিশেষত অ-কার আ-কারের, অনুপ্রাসই তাঁকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। এই, সম্ভবত অবচেতন, আকর্ষণের তাড়নায় সময় সময় তাঁকে প্রায় মোহাচ্ছন্ন বলে মনে হয়। 'সংবর্তে'র প্রত্যেকটি কবিতাই আমার উক্তিকে সমর্থন করবে। 'অঙ্গুলি তুলি, দেখায় অলখ নিষাদে', 'অনিকেত অভিসারে', 'অসম্ভূত অমা', 'অন্যোন্যসম্বল আজ ত্রিভুবনে আমরা দুজনে', 'অভিশাপে প্রস্তাবিত অর্ধনারীশ্বর···অকস্মাৎ অব্যাহতি পাবে', 'অস্পৃশ্য অম্বরে তবুও অদৃশ্য তুমি', 'আজ আনে আচম্বিতে অতিশ্রুতি অন্তরায় প্রত্যাশিত আকাশবাণীতে', 'অস্মিতার অসম্ভব দাবী', 'অবিবেকী অন্তর্যামী; স্ত্রী-পুরুষ অন্যোন্যনির্ভর', 'অনিকাম অবসাদ', 'অপমৃত ভগবান', 'অস্তাচলে রক্তাক্ত অঙ্গার', 'অন্ধতম অতিপ্রজ', 'অসাধ্য সাম্রাজ্যরক্ষা', 'অব্যর্থ প্রলয়···তারও অব্যাহতি নেই অপঘাত থেকে', 'অপূর্ব মানুষের অত্যুদিত চিত্তের প্রসাদ,' 'অশক্ত বা অসম্পৃক্ত অধিদৈবতের', 'অবাধ অগাধ, অপার নীরে', 'অসীম আমার সহসা স্বরাট অনুপ্রভা' ইত্যাদি অনুপ্রাস, স্বাবলম্বী স্বরবর্ণের বলেই শব্দদোষে উদাসী হয়ে উঠে না, বরং একটি বলিষ্ঠ ভাবমণ্ডলের সৃষ্টি করে।

উদ্ধৃতির সংখ্যা ইচ্ছে করেই বাড়িয়েছি এই জন্য যে কৌতূহলী পাঠক এর থেকে বুঝতে পারবেন সুধীন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রযুক্ত কোনো শব্দকেই এককভাবে উপেক্ষা করা যায় না। তারা অতিশয় অভিমানী, এমনকী অনুপ্রাসের যূথবদ্ধতা সত্ত্বেও এবং অ-কার আ-কারের পরিবর্তে ব-কার ম-কারের অনুপ্রাস ব্যবহৃত হলে ধ্বনির ধূম্রজাল ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকত না।

সুতরাং 'সংবর্তে'র ভূমিকায় সুধীন্দ্রনাথ যাই লিখুন, নিম্নোদ্ধৃত-কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতেই তাঁর জীবনদর্শন ও কাব্যদর্শন-উভয়ই অধিকতর পরিস্ফুট হয়েছে :

আমি বিংশ শতাব্দীর
সমান বয়সী ; মজ্জমান বঙ্গোপসাগরে ; বীর
নই, তবু জন্মাবধি যুদ্ধে যুদ্ধে, বিপ্লবে বিপ্লবে
বিনষ্টির চক্রবৃদ্ধি দেখে, মনুষ্য ধর্মের স্তবে
নিরুত্তর, অভিব্যক্তিবাদে অবিশ্বাসী, প্রগতিতে
যত না পশ্চাৎপদ, ততোধিক বিমুখ অতীতে।
কারণ ভূতের নির্বন্ধাতিশয়ে তথা ভবিষ্যের
নিষেধে, অধুনা ত্রিশঙ্কু, এবং সে-খণ্ড বিশ্বের
মধ্যে দ্বৈপায়ন আমরা সকলে, জানি কি না জানি,
নাস্তিরই বিবর্তবাদ। এমনকি উপস্থিত হানি
সম্ভবত অবাস্তব সুললিত সে-পদ্যের মতো,
যাতে রেনু, বেনু, কদাচ ধেনুও, মিলে, ক্রমাগত
অভিভাবে আত্মোপলব্ধির অভাব লুকিয়ে রাখে,
এবং অলীক ভেবে, উচ্ছ্বসিত স্বপ্নরচনাকে
যখন করেছি ত্যাগ, সেকালে স্বকপোলকল্পিত
সর্বনাশে হাহুতাশ অবৈধ ও সাফল্যবর্জিত॥ (যযাতি)

একদা সুধীন্দ্রনাথের নামের সঙ্গে 'নাস্তিক' বিশেষণটা কে উচ্চারণ করেছিলেন মনে নেই। যিনিই করে থাকুন, আমার মতে, নিদারুণ ভুল করেছিলেন। বস্তুত সুধীন্দ্রনাথের মতো এমন ঘোরতর আস্তিক* বাঙালি কবিদের মধ্যে, আমি অন্তত আর খুঁজে পাইনি। তাঁর প্রাক্তন রচনাবলীর কথা মনে রেখেই এ-কথা বলছি। সেখানে তিনি মৃত্যুভীত, সর্বদা ভবিতব্যভারাতুর। কিন্তু তা

* লেখক এখানে "নাস্তিক" ও "আস্তিক" শব্দ দুটি প্রচলিত অর্থ থেকে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন, ঈশ্বরে অবিশ্বাসী ও বিশ্বাসী অর্থে নয়। —সম্পাদক।

আপাতভাবেই। কেন না, কে না জানে জীবনকে সব থেকে গভীর ভাবে যে ভালবাসে, কালচেতনা তাকেই উৎপীড়ন করে বেশি? সুধীন্দ্রনাথের নৈরাশ্যবাদের মূল কারণই হল আস্তিকতা। একদিকে, তাঁর মনে, সুস্থ সুন্দর মানবসমাজের কল্পরূপ, অন্যদিকে, বহির্জগতে, সম্মিলিত নরকযাত্রা; এতদুভয়ের অন্তর্দ্বন্দ্বই তাঁর কবিতার নির্যাস। সুধীন্দ্রনাথ যদি সত্যসত্যই নাস্তিক হতেন, তাহলে, বলাই বাহুল্য, জগদ্ব্যাপার তাঁকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করত না। কিন্তু সম্ভবত ইয়ুঙ-কথিত 'কালেকটিভ্ আনকনসাস' যার প্রেরণা, সেই 'পথ' নামক কবিতাটি পাঠ করলেই বোঝা যায় যে-অস্থিতি, যে-জঙ্গমতা মানুষের মগ্নচেতন উত্তরাধিকার, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তারই সচেতন অংশভাগী। মানুষের ক্রিয়াকর্ম, সাম্রাজ্যের উত্থানপতন, ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর সদাজাগ্রত কৌতূহল এই জন্যেই যে তাঁর চেতনায় এক সুপরিকল্পিত রাষ্ট্রভাবনা মূর্ত রয়েছে:

> নির্বিকার স্বপ্নের নিভৃতে,
> বিয়োগান্ত নাটকের উদ্যোগী নায়ক, আমি পাতি
> যৌবরাজ্য,—ব্যোমযান, কামান, পদাতি
> যে-রাষ্ট্রের অঙ্গ নয়, ন্যায়, ক্ষমা, মিতালি, মণীষা
> যার মুখ্য অবলম্ব, জিজীবিষা
> সামান্য লক্ষণ; (সংবর্ত)

প্রাক্‌সামরিক পৃথিবীতে চিন্তাশীল মানুষের সামনে পথনির্ণয়ের সমস্যা কিছু দ্বিধাগ্রস্ত ছিল না। তখন একদিকে ছিল ক্ষয়িষ্ণু ধনতন্ত্রবাদের অন্তিম আত্মরক্ষার প্রয়াস এবং সমাজদেহে তজ্জনিত দুষ্টক্ষত; অন্যদিকে ছিল বিশ্বজোড়া গণবিপ্লবের প্রস্তুতি এবং সোভিয়েট রাশিয়ার বরাভয়। স্বভাবতই সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তখন মনেপ্রাণে শেষোক্ত দলে যোগ দিয়েছিলেন। তদনীন্তন বিপ্লবীদের উদাত্ত কণ্ঠে কতবার আবৃত্তি শুনেছি:

> তার স্বাধিকার আগে ফিরে দিতে হবে
> নতুবা নগর, তথা প্রান্তর,
> ভ'রে রবে বাসী শবে।
> অশক্য পিতা; বলীর কণ্ঠলগ্ন
> মাতা বসুমতী ব্যভিচারে আজ মগ্ন;
> ক্ষত্র শোণিতে অবগাহি, জামদগ্ন্য
> তবু পাতিবে না স্বর্গরাজ্য ভবে।

স্বীয় শক্তিতে হবে যোগ দিতে
শুদ্ধির তাণ্ডবে ॥ (নান্দীমুখ)

কিন্তু ১৯৩৮ আর ১৯৪৫-এর মধ্যে মাত্র সাত বছরের ব্যবধান হলেও এটুকু সময়েই কল্পান্তের বিপর্যয় ঘটে গেছে। যুদ্ধে জয় হয়েছে, নাট্‌সীবাদের বিনাশ, তা-ও কিন্তু পুনরুজ্জীবিত জাতিবিদ্বেষে যুদ্ধজয়ের উদ্যম ফুরিয়ে গেছে : সামনে আর এক মহাসমর, অনুবিদারণের দুঃস্বপ্ন। সবথেকে মারাত্মক আঘাত হেনেছে আদর্শের ভিত্তিভূমি, সমস্ত প্রতিশ্রুতিকে চুরমার করে সেখানেই একনায়কত্বের বজ্রমুষ্টি দৃঢ়তর হয়েছে, পরমত—অসহিষ্ণুতা সীমা ছাড়িয়েছে, পরিহাসের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে ব্যক্তিস্বাধীনতা। তাই ১৯৩৮-এ-যিনি তাণ্ডবে যোগ দেবার উন্মত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন, ১৯৪৫-এ তাঁর মুখেই শুনতে পাচ্ছি :

তবু জানি যবে জয় হবে বলেছিলে,
চাওনি তখন তুমিও এ-পরিণাম :
শূন্যে ঠেকেছে লাভে লোকসানে মিলে,
ক্লান্তির মতো, শান্তিও অনিকাম।
এরই আয়োজন অর্ধশতক ধ'রে
দু-দুটো যুদ্ধে, একাধিক বিপ্লবে ;
কোটি-কোটি শব পচে অগভীর গোরে,
মেদিনী মুখর একনায়কের স্তবে !
নির্বাণ নভে গৃধ্নু রাহুর গ্রাস ;
তুমি অনিকেত নির্বাক নাস্তিতে :
কে জবাব দেবে, নিখিল সর্বনাশ
কোন্ অবরোহী পাতকের শাস্তিতে ? (১৯৪৫)

ফলত 'সংবর্ত' এক ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী, বিবেকী দ্বিধায় বিচলিত, আধুনিক মানুষের আদর্শগত স্বপ্নভঙ্গের কাহিনী। সুধীন্দ্রনাথ একক নন। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন, কিন্তু, আমার বিশ্বাস, ধীরে ধীরে ক্রমবর্ধমান, এক নৈরাশ্যবাদীদের ভ্রাতৃসংঘ গড়ে উঠছে। তারা সংশয়ী কিন্তু ভগ্ন-উরু নন, পুরাতন বিশ্বাসের পরিমার্জনাকালে নূতন মূল্যবোধের সন্ধানী এবং অন্তর্বর্তীকালে আপাতত্রিশঙ্কু। তত্রাচ তাঁরা, সুধীন্দ্রনাথের মতোই ইতিহাসে ব্যক্তির অবদানকে স্বীকার করেন, বিশ্বাস করেন যে ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহে 'ব্যষ্টিসংকল্পের ঝোঁকে' 'কখনো বিলম্ব ঘটে, কদাচিৎ দ্রুতি।' সুধীন্দ্রনাথের মতোই তাঁরা

নাট্‌সী জার্মানিকে ঘৃণা করেন কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে অনুভব করেন যে জার্মানি গ্যেটে, হোল্ডার্লিন, রিল্কে, টমাস মানের, তা তাঁদেরও স্বদেশভূমি। এই বোধ আস্তিক্যের এবং সেই জন্যেই ভাবীসমাজের স্বপ্নবীজ। কিন্তু সাম্প্রতিক পৃথিবীতে তা দিবাস্বপ্ন জেনেই, বুদ্ধিজীবীরা নানা আখ্যায় আজ আত্মগোপন করে আছেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যেমন, 'সংবর্তে'র মুখবন্ধে ক্ষণবাদী বৌদ্ধ বলে প্রচার করেছেন নিজেকে। 'নিরপেক্ষ কালের প্রবাহে' কেবলই 'পুনরাবৃত্তি' এ-কথা বহুবার ঘোষণা করলেও, বহির্জাগতিক ঘটনাপ্রবাহ প্রতীতি বা প্রতিভাসের ভাঙাগড়া মাত্র, এ-ধারণা তাঁর রচনার দ্বারা কতটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা নিঃসন্দেহেই তর্কসাপেক্ষ। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ স্পষ্টত প্রমাণ করতে পেরেছেন যে বৌদ্ধদের মতোই শুক্লকর্মে তাঁর আস্থা অটুট আছে, এখনো, এই পরিবেশেও যখন :

জাতিভেদে বিবিক্ত মানুষ ;
নিরঙ্কুশ একমাত্র একনায়কেরা। কিন্তু তারা
প্রাচীর, পরিখা, রক্ষী, গুপ্তচর ঘেরা প্রাসাদেও
উন্নিদ্র যেহেতু, তাই ভগ্ন সেতু নদীতে নদীতে,
মরু নগরে নগরে! পক্ষান্তরে অতিবেল কারা
তথা সংক্রমিত মেরু ব্যক্তির ধ্বংসাবশেষে : দ্বেষে
পুষ্ট চীন থেকে পেরু ; প্রতিহিংসা মানেনা সিন্ধুর মানা।

(যযাতি)

উপরি-উদ্ধৃত অংশটিতে অন্তর্মিলের যে অভিনবত্ব দেখানো হয়েছে, সাবধানী পাঠক নিশ্চয়ই তা লক্ষ্য করেছেন। মানুষ : নিরঙ্কুশ : একনায়কেরা : ঘেরা ; যেহেতু : সেতু ; নগরে, পক্ষান্তরে, মেরু : পেরু ; ধ্বংসাবশেষে : দ্বেষে, ইত্যাদি অন্তর্মিলগুলি সম্বন্ধে সজাগ থাকলে, আমার মনে হয়, কাব্যাংশটির পাঠ সহজতর হবে। বস্তুত 'যযাতি' কবিতাটি শুধু যে প্রকরণের দিক থেকেই আশ্চর্য তা-ই নয়, সঙ্গে-সঙ্গে পয়ারের চরমোৎকর্ষ তো বটেই, বাংলা কবিতায় শ্রেষ্ঠ বিমূর্তনার অদ্বিতীয় উদাহরণ। এবং উল্লিখিত কবিতা-পাঠে এ-ধারণাও আমাদের মনে বদ্ধমূল হয় যে শব্দ সম্পদে সুধীন্দ্রনাথ কুবেরতুল্য। শব্দ যেহেতু বস্তু এবং চিন্তারই প্রতীক তাই শব্দাধিকারীর পুঁজির অঙ্ক থেকে তার মানসিক ব্যাপ্তিকেও জরিপ করা যায়। সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় শব্দগত দুর্বোধ্যতা নিয়ে যাঁরা হা-হুতাশ করেন, আমার মতে, আত্মানুশীলনে মনযোগী হওয়াই তাঁদের কর্তব্য। আধুনিক ইংরিজি কবিতা, ধরা যাক ডাইলান্ টমাসের, বোঝবার জন্য যে

পরিমাণ পরিশ্রম আমরা করে থাকি বাঙলি কবির ক্ষেত্রে তা প্রযুক্ত হবে না কেন ? বাংলা কবিতার উৎসধারা রবীন্দ্রনাথে এসে বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালায় পরিণত হলেও, তার উৎপত্তি আরো সুদূরস্থানে। এ কথা মনে রাখলে, সুধীন্দ্রনাথ ব্যবহৃত শব্দাবলীকে অচেনা মনে হবে না। এবং কবিতায় যারা ভাবালুতার চেয়ে বেশি কিছু আশা করেন, নিম্নোদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিটির মর্মোদ্ধারের জন্য ঈশোপনিষৎ* হাতড়াতেও তাঁরা ইতস্তত করবেন না:

কারণ তখন বায়ু অনিলে মেশে না, অবস্কর
ভস্মান্ত হয় না, অনুব্যবসারী ক্রতু
বোঝে সন্তাপেও ব্যাপ্ত ব্রহ্মাণ্ডের বীতাগ্নি বেপথু। (সংবর্ত)

তাই শাব্দিক দুর্বোধ্যতার জন্য সুধীন্দ্রনাথের কবিতা সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারলাম না বলে কবির প্রতি আমার কিছুমাত্র অভিযোগ নেই, নিজের স্বল্পবিদ্যায় আপাতত লজ্জিত হয়ে থাকলাম।

কিন্তু 'সংবর্ত'-যে মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত, আমার এ-অনুভবের কথা না জানিয়ে আলোচনায় দাঁড়ি টানতে পারছি না। সুধীন্দ্রনাথের বিষয়বস্তু ইতিহাস এবং যুদ্ধ বলেই এ কথা বলছি না, সৎ পাঠক মাত্রই সম্ভবত স্বীকার করবেন যে সত্যসত্যই এই কাব্যের নেপথ্যনায়ক ধীরোদাত্তগুণান্বিত।

---

* বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম।
ওঁ ক্রতো স্মর, কৃতংস্মর, ক্রতো স্মর কৃতং স্মর॥

জগন্নাথ চক্রবর্তী

মৌলিক অনুবাদঃ সুধীন্দ্রনাথকৃত সেকসপিয়রের সনেট

'কাব্যের অনুবাদ সম্ভব' এবং 'কাব্যের অনুবাদ অসম্ভব'—এই দুটিই খুব অদ্ভুত উক্তি। অনেকটা 'ঈশ্বর আছেন' এবং 'ঈশ্বর নেই' এই ধরণের। উভয়েরই ধ্বনি হচ্ছে স্বতঃসিদ্ধের। 'আছেন' এমন অকাট্য প্রমাণ নেই, অথচ 'আছেন' ধরে নিয়ে চমৎকার মন্দির, মসজিদ, ভজন, কীর্তন, শিল্প, কবিতা, সুন্দর আচার-আচরণ, নম্রতা, মনোগ্লানি তৈরি হয়েছে এবং হচ্ছে। যাঁরা এই সব করছেন তাঁদের বিশ্বাস বা আস্তিক্যবোধ যে সর্বদাই খুব দৃঢ় তাও নয়। দেখা যাচ্ছে 'নেই' এই বিপরীত সিদ্ধান্ত প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও, সেই সিদ্ধান্ত ধরে নিয়ে মানুষ যে চুপ করে বসে আছে তাও নয়। বিচারে বসলে 'হাঁ'কে না বা 'না'-কে হাঁ করা যায়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে নাস্তিকতা খুব কাজের নয়। তেমনি বিশুদ্ধ উপপত্তি হিশাবে কাব্যানুবাদের অসম্ভবতা যিনি সব চেয়ে বেশি স্বীকার করেন তিনিই প্রয়োগের ক্ষেত্রে দেখি উলটো কাজ করতে সবচেয়ে উৎসাহী। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-র কথাই ধরা যাক। মালার্মের বিখ্যাত ফরাসী কবিতা 'ফনের দিবাস্বপ্ন' তিনি বাংলায় অনুবাদ করেন। করে তাঁর মনে হয়েছে যে পাঠক হয়তো কবিতার মর্ম ধরতে পারবেন না, তাই পাচ পাতা অনুবাদের সংগে আরো সাড়ে তিন পাতা একটি গদ্য ভাষ্য জুড়ে দিয়েছেন! পরিশ্রমজাত এই ভাষ্যেই সুধীন্দ্রনাথ কাব্য-অনুবাদ বিষয়ে তাঁর মগ্ন বিশ্বাসটি ব্যক্ত করেছেন, সেটি এই—'ফন্-এর দিবাস্বপ্ন'-এ ঈসোপনিষদের রহস্যারোপ হাস্যকর; এবং **হয়তো** তার চেয়েও বেশী পণ্ডশ্রম উক্ত ফরাসী কবিতার বঙ্গানুবাদ। কারণ কবি হিশাবে মালার্মে শুধু বিভিন্ন, এমনকী বিপরীত, আবেগের আস্রবণ, অথবা অস্‌মোসিস, ঘটিয়েই ক্ষান্ত নন। তাঁর নিরবচ্ছিন্ন চিত্রকল্প যে-রকম বহুলাঙ্গ বাক্যের মুখাপেক্ষী, তার অনুকরণ স্বভাব-নিগ্রস্থ বাংলায় **একেবারে অসম্ভব**।" (নিম্নরেখাঙ্কন আমার)। সামান্য একটু নখের আঁচড় দিলেই এই উক্তির মধ্যে অনেক মজা আবিষ্কার করা যাবে।

দীর্ঘ কবিতাটি অনুবাদ করার পর তিনি বলেছেন, অনুবাদটি, এমন কী অনুবাদ কাজটিই 'পণ্ডশ্রম'। 'হয়তো' কথাটি বাক্যটিকে যদি বা খানিকটা সন্দিগ্ধ করে থাকে, উদ্ধৃত অংশের সর্বশেষ উচ্চারণ 'একেবারে অসম্ভব' সে সন্দেহ সম্পূর্ণই দূর করে দিয়েছে। বাংলায় একেবারে অসম্ভব জেনেও সুধীন্দ্রনাথ ওই কবিতার বঙ্গানুবাদে হাত দিলেন। এবং সম্পূর্ণ করলেন। এর কী ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে? 'ঈশ্বর নেই' জেনেও নাস্তিক শিল্পী কর্তৃক সোমনাথ বা দ্বারকানাথ মন্দির নির্মাণের মতোই কি ব্যাপারটি অদ্ভুত নয়? এবং অদ্ভুত হলেও বিশ্বাস্য নয়? অনুরূপভাবে সুধীন্দ্রনাথ যদি বলতেন তাঁর পক্ষে শেকসপিয়রের সনেট বাংলায় অনুবাদ করা 'পণ্ডশ্রম' এবং 'একেবারে অসম্ভব' তবে সেই উক্তিও হত অদ্ভুত। কিন্তু শতকরা একশো ভাগ বিশ্বাস্য। আমরা এও জানি এমন উক্তি করবার পরও সুধীন্দ্রনাথ শেকসপিয়রের অন্তত তেইশটি সনেট অনুবাদ করতেন, বা অনুবাদ শেষ করে ভাষ্য জুড়ে তাতে মন্তব্য করতেন যে, এই ধরনের সনেট অনুবাদ করা 'পণ্ডশ্রম', এমন কী একেবারে 'অসম্ভব'!

এর কারণ, সুধীন্দ্রনাথ ও শেকসপিয়র পরস্পরের অসাধ্য দুই কবি। যেমন ডান ও শেকসপিয়র ছিলেন সমকালীন কিন্তু অসমগোত্রীয় এবং পরস্পরের অসাধ্য। একই পত্রিকাভুক্ত হলেও এঁরা সমান্তরালবর্তী এবং গুণগতভাবে পরস্পরকে ছেদ করেন নি। এমন কী একজন আরেকজনের স্পর্শকও নন। অথচ ডান এবং শেকসপিয়র পুঞ্জ পুঞ্জ সনেট লিখেছেন এবং প্রমাণ করেছেন কেউই কারো চেয়ে কম সনেটসিদ্ধ নন। অমনোযোগী পাঠক বহিরঙ্গে বিদ্ধ হয়ে ছোটখাটো মিল দেখাতে অনেক চেষ্টা করবেন। কিন্তু প্রকৃত কাব্যপাঠক ক্রমাগত অঙ্গুলিনির্দেশ করবেন তাঁদের মৌল অমিলের দিকে, বৈপরীত্যের দিকে। ডান নাটক লেখেন নি, কিন্তু শেকসপিয়র মুখ্যত নাট্যকার। তবু আত্মকথার পশ্চাৎপট ও আগ্রহী কথোপকথনের ছায়া থাকা সত্ত্বেও শেকসপিয়রের সনেটগুচ্ছ গুণগত বিচারে একেবারেই লিরিক্যাল ও মসৃণ। পক্ষান্তরে ডানের 'সংগ্‌স অ্যাণ্ড সনেটস' একেবারেই মসৃণতাবর্জিত কিন্তু আশ্চর্য রকমের নাটকীয় গুণসম্পন্ন এবং বিস্ফোরক। জন ডানের উল্লেখ করলাম এই কারণে যে, আধুনিক বাংলা কাব্যে সুধীন্দ্রনাথের মধ্যেই আমরা পাই সেই মেটাফিজিক্যাল রীতির এষণা ও প্রবর্তনা যা এলিজাবেথীয় যুগে ডানের মধ্যে প্রথম স্ফূট। সমকালীন ম্যাট্রিক্সে বিচার করতে হলে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ও

সুধীন্দ্রনাথের মধ্যেই তুলনা টানতে হয়, যদিও সে তুলনা হবে বেশ খানিকটা অস্থখী। রবীন্দ্রনাথ নিজে অনেক নাটক লিখেছেন, সুধীন্দ্রনাথ লেখেননি। কিন্তু দুজনেই প্রচুর সনেট রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' তো সবটাই সনেট ; অথচ রবীন্দ্রনাথের সনেটে কোনো নাটকীয় দাঢ়্য'ই আমরা পাই না যেমন পাই সুধীন্দ্রনাথের সনেটে।

অংশত সমকালীন হলেও, সুধীন্দ্রনাথ কখনই রবীন্দ্রনাথের মতো সনেট বা কবিতা লেখেননি, লিখলে তা হত পণ্ডশ্রম, যেমন হত ডানের পক্ষে, যদি তিনি শেকসপিয়রের মতো সনেট বা নাটক রচনায় ব্রতী হতেন। ডানের পক্ষে শেকসপিয়র যা, সুধীন্দ্রনাথের পক্ষেও শেকসপিয়র তাই-ই। অর্থাৎ অসাধ্য এবং পণ্ডশ্রম। দুজনের মেজাজ আলাদা, কাব্যরীতি আলাদা, দিগ্‌দর্শন আলাদা। তবুও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সুধীন্দ্রনাথ এই আপাত পণ্ডশ্রমে ব্রতী হয়েছেন এবং শুধু তাই নয় তিনি এক ভিন্নতর সিদ্ধিও লাভ করেছেন। ভিন্নতর বলছি এই কারণে যে এই সিদ্ধি অনুবাদক বা অনুকথক হিসাবে সিদ্ধি নয়, কাব্যস্রষ্টা হিসাবেই সিদ্ধি। শেকসপিয়রের ছায়ায় সিদ্ধি নয়, সুধীন্দ্রনাথের স্বকীয় আতপেই সিদ্ধি।

শেকসপিয়রের ২১ সংখ্যক সনেটের সুধীন্দ্রনাথকৃত অনুবাদটি লক্ষ্য করা যাক। মূল সনেটটি এরূপ :—

So is it not with me as with that Muse
Stirr'd by a painted beauty to his verse,
Who heaven itself for ornament doth use
And every fair with his fair doth rehearse,
Making a couplement of proud compare,
With sun and moon, with earth and sea's rich gems,
With April's first-born flowers, and all things rare
That heaven's air in this huge rondure hems,
O! let me, true in love, but truly write,
And then believe me, my love is as fair
As any mother's child, though not so bright
As those gold candles fix'd in heaven's air:
Let them say more that like of hearsay well;
I will not praise that purpose not to sell.

সুধীন্দ্রনাথের অনুবাদ :

সেই কবিদের মতো ক্ষিপ্র নয় আমার কল্পনা,
চতুরার অঙ্গরাগে পরাশ্রীর স্বপ্ন যারা দেখে,
অতিমর্ত্য উপাদানে রচে যারা ভাকের গহনা,
সৌন্দর্যের প্রতিযোগে নষ্ট করে স্বার্থ একে একে
ধূলার ধরায় যারা কোনও কালে নয় বদ্ধমূল,
পেড়ে আনে জ্যোতিষ্কেরে, মন্থে যারা সিন্ধু মণিময়,
অম্লান যাদের মাল্যে ফাল্গুনের আশুক্লান্ত ফুল,
বিজড়িত বাহুপ্রান্তে নীলকান্ত বায়ুর বলয়।
প্রেমে সত্যসন্ধ আমি, অপলাপে ফুরাব না মসী,
মানো মোর নিবেদন—অন্য কোনও মনুষ্যদুহিতা
আমার প্রিয়ার চেয়ে নয় বটে অধিক রূপসী,
তথাচ রুচিরতর অমরার হৈম দীপান্বিতা।
প্রবাদবিলাসী যারা অতিকথা তাদেরই মানায় ;
আমি তো পসারী নই, গুণগানে আমার কি দায় ? (মিতভাষী)

একুশ সংখ্যক মূল সনেটটির বৈশিষ্ট্য এই যে এটিতে বাহ্যত শেকসপিয়র কাব্যে অতিশয়োক্তি প্রয়োগের রীতির বিরোধিতাই করেছেন। সনেটগুচ্ছে এবং অন্যান্য কবিতায় অবশ্য দেখা যায় যে কাব্যিক অতিশয়োক্তি প্রয়োগে তিনি সিদ্ধহস্ত। প্রকৃতপক্ষে অতিশয়োক্তির বিরোধিতার আকারে তিনি এখানে ঘুরিয়ে সেই অতিশয়োক্তিরই প্রয়োগ করেছেন। অতিশয়োক্তির প্রকৃত বিরোধিতা শেকসপিয়র মাত্র একটি সনেটেই করেছেন, সেটি 'ডার্কলেডী'কে সম্বোধন করে লেখা ১৩০ সংখ্যক সনেটটি (সুধীন্দ্রনাথ এটিরও অনুবাদ করেছেন) :

My mistress' eyes are nothing like the sun ;
Coral is far more red than her lips' red :
If snow be white, why then her breasts are dun ;
If hairs be wires, black wires grow on her head....

(কে বলে সূর্যের সঙ্গে তুলনীয় প্রিয়ার নয়ন ?
প্রবাল রক্তিম হলে, নাতিরক্ত তার ওষ্ঠাধর ;
তুষার ধবল বটে, পাংশুবর্ণ কিন্তু তার স্তন ;
কেশের বদলে ধরে মস্তকে সে তন্তুর কেশর।) (মৃন্ময়ী)

শেকসপিয়রের ২১ সংখ্যক সনেটটি ফিলিপ সিডনির 'অ্যাসট্রোফেল অ্যাণ্ড স্টেলা (Astrophel and stella) সনেটগুচ্ছের ৩, ৬, ১৫ ও ৭৫ সংখ্যক সনেট দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকতে পারে। এই সনেটগুলিতে সিডনি বলতে চেয়েছেন যে স্টেলা ছাড়া অন্য কোনো বাগ্‌দেবীর অনুপ্রেরণায় তাঁর প্রয়োজন নেই। স্টেলা যেমন, তেমনটি বর্ণনা করতে পারলেই যথেষ্ট; অন্য কবিদের অনুকরণ অথবা বিস্তারিত উপমা কিংবা অতিশয়োক্তির কোনো দরকারই নেই। সিডনি সম্ভবত এই সনেটগুলি লিখবার উৎসাহ পেয়েছিলেন দু বেল্লে (Du Bellay) এবং রঁজা (Ronsard)-র কাছ থেকে, যাঁরা অন্য প্রসংগে প্রায় একই কথা বলেছেন। সুধীন্দ্রনাথ কেন এই সনেটটিকে অনুবাদের জন্য বেছে নিয়েছিলেন তা আমরা জানি না। এটি যেন সুধীন্দ্রনাথের নিজের কাব্যরীতির বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ। শব্দে, ধ্বনিতে, উপমায়, রূপরাগে, কাব্যের অঙ্গসজ্জায় ঐশ্বর্য সৃষ্টি না করে সুধীন্দ্রনাথ কখনোই তৃপ্ত নন; এক ধরনের 'গ্র্যাণ্ড স্টাইলে' তিনি স্বাচ্ছন্দ্য পেতেন, যেন সেটিই তাঁর সহজাত। এমনকী এই সনেটের অনুবাদেও আমরা দেখি তিনি অঙ্গরাগ রচনায় মূল কবিতার উপর অনেকখানি টেক্কা দিয়েছেন। 'Stirred' (উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত) এই একটি কথাকে তিনি 'পরাশ্রীর স্বপ্নদর্শনে' উন্নীত করেছেন। শুধু তাই নয় চতুরা, অঙ্গরাগ, পরাশ্রী এতগুলি ধ্রুপদী পদ ব্যবহার করে তিনি এমন এক উচ্চাঙ্গসংগীতের ধ্বনি ও ব্যঞ্জনা এনেছেন যা মূলের 'printed beauty'-র মধ্যে আমরা পাই না। মূল কবিতায় একটি শ্লেষের ভাব আছে যা সুধীন্দ্রনাথের ধ্বনি-গৌরবান্বিত পংক্তিতে সম্পূর্ণ আবৃত। 'আমি অন্য কবিদের মতো নই' এই সামান্য উক্তিকে তিনি 'ক্ষিপ্র নয় আমার কল্পনা' এই কাব্যিক উক্তিতে পরিবর্তিত করেছেন। Ornament-কে 'ডাকের সাজ' ('গহনা' সম্ভবত প্রথম পংক্তির 'কল্পনা'র সঙ্গে মিল দেবার জন্য) বলার একটি সহজ কবিত্বশক্তি ও স্বদেশিয়ানা পরিস্ফুট হয়েছে; কিন্তু সামান্য গহনা জড়োয়া গহনায় পরিণত করা হয়ে গেছে। চতুর্থ পংক্তিতে কবি 'স্বার্থ' পদটি স্ব+অর্থ অর্থাৎ শব্দের স্বাভাবিক অর্থ এই হিসাবেই ব্যবহার করেছেন। অথচ বাংলায় 'স্বার্থ' কথাটি স্বার্থবুদ্ধি ও স্বার্থপরতার সংগেই সর্বদা জড়িত। শব্দার্থ অর্থে স্বার্থের এই ধ্রুপদী প্রয়োগ, সুধীন্দ্রনাথের তৃতীয় পংক্তির ভাষায়, 'অতিমর্ত্য উপাদানে' গহনা রচনার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অথচ অতিমর্ত্য উপাদানে যাঁরা কথামালায় অলঙ্কার রচনা করেন, যেমন সুধীন্দ্রনাথ স্বয়ং, মূল কবি

তাঁদেরই নিন্দা করছেন এই সনেটে। তা সত্বেও সুধীন্দ্রনাথ সানন্দে, এই সনেটটি বেছে নিয়েছেন অনুবাদের জন্য! ৭ম পংক্তির 'all things rare' এই বাক্যাংশের ভাবটিকে বিস্তৃত করে একটি সম্পূর্ণ পংক্তি (৫ম পংক্তি) রচনা করেছেন সুধীন্দ্রনাথ—'ধুলায় ধরায় যারা কোনও কালে নয় বদ্ধমূল'; এ ধরনের স্বাধীন paraphrasal রচনাকে 'অনুবাদ' বললে তা হবে সত্যের 'অপলাপ' (অনুবাদের ৯ম পংক্তি দ্রষ্টব্য!) মাত্র। 'ধুলায় ধরায় যারা কোনও কালে নয় বদ্ধমূল' সেই ক্ষিপ্রকল্পনাবান কবিদেরই একজন সুধীন্দ্রনাথ। কোন কোন সমালোচক এই ২১ সংখ্যক সনেটেই প্রতিদ্বন্দ্বী কবি-রচিত অসার শিল্পের উপর শেকসপিয়র কর্তৃক প্রথম আক্রমণ ("First attack on the false art of a Rival Poet") লক্ষ্য করেছেন। যদি ৭৮—৮৬ সংখ্যক সনেটগুলির প্রতিদ্বন্দ্বী কবি হন চ্যাপম্যান, তবে এই সনেটের শেষ অংশে কেনাবেচার প্রসংগটি ('sell') তাঁর চ্যাপম্যান নামের সংগে বেশ সংগত মনে হবে। উক্ত কল্পনাবলে কবিদের মতোই অনুবাদকর্মে লিপ্ত হয়েও তিনি প্রায়ই stirred (মূলের ২য় পংক্তি) বা কল্পনার আবেগে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন। মূলের সংগে অনুবাদের ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম পংক্তি মিলিয়ে পড়লে এই সত্যটি সহজেই বোধগম্য হবে।

পেড়ে আনে জ্যোতিষ্কেরে, মন্থে যারা সিন্ধু মণিময়, (মিতভাষী)

এটি একটি আশ্চর্য প্রাণবন্ত পংক্তি। যে নিন্দার্হ, তার গর্হিত কাজের বর্ণনা দিতে কেউই এমন উজ্জ্বল চমকপ্রদ লাইন লিখবে না। শেকসপিয়রের মূল ৬ষ্ঠ পংক্তি-এর কাছে একেবারেই নিষ্প্রভ, নিষ্প্রাণ গদ্য—With sun and moon with earth and sea's rich gems. একেবারে গতানুগতিক গুটিকতক অপ্রাণিত বিশেষ্য-পদ। এদের মধ্যে কোনো সৃষ্টির উল্লাস বা কর্মচাঞ্চল্য নেই, তার কারণ শেকসপিয়র এখানে প্রকৃত সৃষ্টি নয় নকল সৃষ্টির উদাহরণই দিতে বসেছেন। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ অনুবাদক হিসাবে মুখে একে গতানুগতিক, নকল সৃষ্টি বলে মনে নিতে বাধ্য হলেও মনেপ্রাণে তা মানেন নি। আর সেইজন্যই অনুবাদের নামে এমন ভাস্বর ডাকের সাজে বক্তব্যটি ঢেলে সাজিয়েছেন যে অনূদিত পংক্তিটি মূলকে তবু ছাড়িয়েই যায় নি, একেবারে কানা করে দিয়েছে। প্রিয়ার উপমা খুঁজতে জ্যোতিষ্ক পেড়ে আনা এবং সিন্ধু মন্থন করে মণিমুক্তা সংগ্রহ করার সামান্যতম আভাসও মূলে পাওয়া যাবে না। সুধীন্দ্রনাথ মূলের অতিশয়োক্তির বর্ণনাকেই আরো

অতিশয়োক্ত করে পরিবেশন করেছেন, এবং মূলে যদিও কাব্যিক অতিশয়োক্তিকে একটি ব্যর্থ অলঙ্করণ ক্রিয়া বলে অভিহিত করা হয়েছে, সুধীন্দ্রনাথ প্রয়োগক্ষেত্রে দেখিয়েছেন অতিশয়োক্তি কেমন সার্থক ও উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে। মাইকেল মধুসূদন যখন রাবণের উপমা দিতে গিয়ে অতিশয়োক্তি করে বলেন—

কনক-আসনে বসে দশানন বলী—
হেমকূট-হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা
তেজঃপুঞ্জ !

তখন এর মধ্যে আর যাই হোক, কোনো শ্লেষ থাকা সম্ভব বলে মনে হয় না। তেমনি সুধীন্দ্রনাথ অনূদিত অতি-অতিশয়োক্ত ৬ষ্ঠ লাইনটি পড়বার সময়ও মনে হয় না এর মধ্যে কোনো শ্লেষ আছে বা এটি কোনো অনুমোদনের অযোগ্য, গর্হিত ক্রিয়ার বর্ণনা। কবি 'অতিমর্ত্য উপাদানে' এতই মনস্ক যে মূলের sun, moon, earth এবং sea-এর মধ্যে বিশেষ করে earth কেই নিঃশব্দে বর্জন করেছেন; সূর্য এবং চন্দ্রকে আলাদা নামে না ডেকে 'জ্যোতিষ্ক' এই সাধারণ নামে তাদের জ্যোতির্ময় সত্তাটিকেই তুলে ধরেছেন; সমুদ্রকে তবু সমুদ্র না রেখে সমুদ্রমন্থনের পৌরাণিক কাহিনীর ব্যঞ্জনাও তার সাথে যুক্ত করেছেন, যাতে ভারতীয় পাঠক এই পংক্তির মধ্যে অনুবাদগন্ধ একেবারেই না পান। ৮ম পংক্তিও আশ্চর্যরকম দেশী এবং বেশি মূল্যবান হয়ে উঠেছে বায়ুকে 'নীলকান্ত' এই বিশেষণে ভূষিত করায়। নীলকান্তমণিখচিত বালা বাহুগোলকে ঘিরে থাকবে এটিই স্বাভাবিক। কিন্তু 'নীলকান্ত' কথাটি সুধীন্দ্রনাথ তো শেকসপিয়রের কাছ থেকে পান নি, পেতে পারেনও না, কারণ শেকসপিয়র এই সজ্জাকে সার্থক রূপসজ্জা বলতে কুণ্ঠিত। কিন্তু অনুবাদক সুধীন্দ্রনাথ শেকসপিয়রের এই কুণ্ঠা সবলে জয় করে মনের মতো করে, যেন সানন্দে, দামী অংগরাগ রচনা করেছেন। তাই সন্দেহ জাগে, সুধীন্দ্রনাথ কি সত্যিই অনুবাদ করতে বসেছেন, না অন্য কিছু? 'প্রেমে সত্যসন্ধ' তিনি কি অনুবাদেও সত্যসন্ধ? যদি তিনি সত্যসন্ধই হবেন, তবে 'my love is as fair as any mother's child' কে তিনি কেন করলেন—

'অন্য কোনও মনুষ্যদুহিতা
আমার প্রিয়ার চেয়ে নয় বটে অধিক রূপসী' ?

শেকসপিয়র তাঁর স্নেহভাজন পুরুষ-বন্ধুকেই 'love' বা বঁধূ বলেছেন, কিন্তু

সুধীন্দ্রনাথ সজ্ঞানে 'দুহিতা', 'প্রিয়া' এবং 'রূপসী' এই তিনটি স্পষ্ট স্ত্রীবাচক শব্দ এখানে ব্যবহার করেছেন। যেন ২১ সংখ্যক সনেট ও উপরে আংশিক উদ্ধৃত ১৩০ সংখ্যক সনেট দুটিরই উদ্দিষ্ট ব্যক্তি একই। ১৪৪ সংখ্যক সনেটে শেকসপিয়ার খুব পরিষ্কার করেই বলেছেন :—

> Two loves I have of comfort and despair,
> Which like two spirits do suggest me still :
> The better angel is a man right fair,
> The worser spirits a woman, colour'd ill.

শেকস্‌পিয়রের দুই পৃথক প্রেমাস্পদকে অনুবাদক সুধীন্দ্রনাথ অবলীলায় একাকার করে দিয়েছেন, এবং এখানে "মাত্রাজ্ঞানে আমার প্রমাণ" (১৩০ সংখ্যক সনেটের শেষ পংক্তির অনুবাদ দ্রষ্টব্য) এই উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণ করতে পারেন নি। অনুবাদক ব্যাখ্যাতা হতে পারেন (তাঁকে ব্যাখ্যাতা হতেই হয়), কিন্তু তিনি যদি ভুল ব্যাখ্যাতা হন তবে সেই ব্যাখ্যান অনুবাদ নামের যোগ্য হয় না। দ্বাদশ পংক্তির 'gold candles fix'd in heaven's air' সুধীন্দ্রনাথের কলমে "অমরার হৈম দীপান্বিতা"য় রূপান্তরিত হয়ে এমন দেশী ও বেশি হয়ে গেছে যে এর গৌরব স্বতন্ত্র রচনার। দীপান্বিতা বলতে যে দেওয়ালির আলোকসজ্জা মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে, candles বলতে তেমন কিছু হয় না। এই ধরনের অভাবিত স্বীকরণ ও জাতীয়করণ সুধীন্দ্রনাথের অনুবাদের এক অপরূপ বৈশিষ্ট্য। 'O ! let me, true in love, but truly write' (৯ম পংক্তি) এই সহজ উক্তির একটি সহজ অনুবাদ নিশ্চয়ই করা যায়। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ সেই সহজ পথের পথিক নন, তিনি যে পংক্তি সৃষ্টি করলেন তা হচ্ছে—'প্রেমে সত্যসন্ধ আমি, অপলাপে ফুরাব না মসী'। 'সত্যই লিখবো' কে তিনি 'মিথ্যা লিখবো না' এই নঞর্থক বাক্যরূপ দান করলেন এবং সেই নঞর্থক বক্তব্যকেও আবার সুধীন্দ্রীয় বাগ্‌বিভূতি দ্বারা ডাকের সাজে সজ্জিত করলেন। 'সত্যসন্ধ' 'অপলাপ' এবং 'মসী' একত্রে সুধীন্দ্রনাথের মৌলিক রচনার আবহই সৃষ্টি করেছে। এবং প্রকৃত প্রস্তাবে, অনূদিত সনেটটিই হয়ে উঠেছে একটি স্বয়ম্ভর সনেট যার রচয়িতা হচ্ছেন সুধীন্দ্রনাথ,—অনুবাদক সুধীন্দ্রনাথ নন, কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। মূলকে অনুবাদ ছাড়িয়ে উঠেছে, 'ছাড়িয়ে' অতিক্রম করে, এবং পৃথক হয়ে, এই দুই অর্থেই। অনূদিত সনেট মূলের উপর নির্ভর করেই যদি দাঁড়িয়ে থাকত, তাহলে শেকস্‌পিয়রের পুরুষ—

বস্তু সুধীন্দ্রনাথের প্রিয়ায় রূপান্তরিত হতে পারত না। শেকসপিয়রের সনেটগুচ্ছ থেকে এক একটি সনেট সুধীন্দ্রনাথ এমনভাবে ছিঁড়ে নিয়েছেন যে বোঁটায় বা নাড়ির টান আর অবশিষ্ট থাকেনি। শেকসপিয়রের এক একটি সনেটের উপর যেন এক একটি নতুন কবিতা রচনা করেছেন সুধীন্দ্রনাথ। এমনভাবে রচনা করেছেন যাতে মূলের সঙ্গে মিলিয়ে পড়বার কোনো প্রয়োজনই না থাকে। ইংরেজি মূল সনেট যেন বাংলায় আরেকটি মূল সনেট রচনার অজুহাত মাত্র। যদি কেউ মিলিয়ে পড়তে চান তবে তার জন্যও সুধীন্দ্রনাথ রচনা করে রেখেছেন পংক্তিতে পংক্তিতে চমৎকার সারপ্রাইজ! যেন শেকসপিয়রের পংক্তিগুলিকে চ্যালেঞ্জ করবার জন্যই তিনি কলম ধরেছেন। যেন সুন্দরকে আরো-সুন্দর করার কারিগর তিনি। শেকসপিয়রের কবিতার সঙ্গে পরিচয় থাকুক বা না থাকুক সুধীন্দ্রনাথের অন্যান্য কবিতার সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে তিনিই এই অনূদিত সনেটগুলির রস গ্রহণ করতে পারবেন। এই রস একেবারে মৌলিক রস; কারণ সুধীন্দ্রনাথের অনুবাদ একেবারে মৌলিক অনুবাদ, এতই মৌলিক যে সম্ভবত তাকে আর অনুবাদই বলা চলে না। এবং অনুবাদ যখন আর অনুবাদ থাকে না তখনই তা হয় শ্রেষ্ঠ অনুবাদ, মৌলিক অনুবাদ।

আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

সুধীন্দ্রনাথের হাইনে

'বিশ্ব ইতিহাস এমন-কি হাইনের চেয়েও বড়ো কবি', মার্কসকে এই মর্মে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন এঙ্গেল্‌স। অনেকেরই মনে হয়েছে, মার্কসের প্রিয় এই 'বিপ্লবী' কবি তাঁর রচনায় মার্কসীয় মুদ্রা ও মনন প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন, অনেকেই আবার এরকম ধারণায় আদৌ সায় দেন নি। ভাবুক, বলে উঠেছেন কেউ, ভৌম সময়ের অন্তঃশীল দুঃখতা চিরে চিরে নাকি দেখিয়ে দিয়েছেন। আবার ভল্‌ফ স্টের্ণবের্গের তো ভাবনা-চিন্তার এরকম কোনো ভারাক্রান্ত দায়ভাগই তাঁর ভিতরে দেখতে পাননি। রাজনীতি আর দর্শন বিন্দুমাত্র বুঝতেন না বলেছেন যাঁরা তাঁদের সিদ্ধান্ত যুক্তিতর্কে ছিন্ন করতে প্রয়াস পেয়েছেন অন্ত-শিবিরের সমালোচক দল। 'ধর্মহীন' বলেছেন কেউ; ধার্মিক সৌন্দর্যবাদী বলে উঠেছেন অন্যেরা। ব্যক্তিগত জীবনদেবতায় আশ্রিত বলে নন্দিত করেছেন তাঁকে খৃস্টীয় ভক্তকুল, অন্যদল তাঁকে 'স্বনিকেত' চিহ্নিত করেই তৃপ্ত। স্বাধীনতার সৈনিক হাইনে, স্ত্রী-স্বাধীনতার ঘাতক তিনিই, একই মুহূর্তে একই বিচারকের মুখে এ-জাতীয় রায় পাওয়া গিয়েছে।

আসলে এ ধরনের দ্বিপ্রতীপ সিদ্ধান্ত মহাকবির প্রসঙ্গেই সম্ভব। শুধু এদেশেই নয়, ইয়োরোপেও অনেক সময় একজন মহাকবি কতোখানি 'মহান্', সেই মোকাবিলা চলতে থাকে এখনো। তাঁর রচনাবলি নিংড়ে নিয়ে নির্ণয় করা হয় স্মৃতিধার্য ভাবার্থসমূহ। তিনি কবি কিনা, এ-প্রশ্নও অতর্কিতে তলিয়ে যায় অনবগাহ কোন্ অতলে। তবে হাইনের প্রসঙ্গে বিবদমান বিশারদবর্গের আলোচনায় প্রায়ই প্রত্যাশার বেশি একটি ব্যাপার পেয়ে যাই আমরা: সকলেই নিজেদের মেজাজ ও স্বভাবের সঙ্গে কবিকে প্রত্যক্ষত মিলিয়ে নিচ্ছেন। শুধু তো জ্ঞানীরাই নন, দিগ্বিজয়ী সুরশিল্পীরাও। তাই শুবার্ট বেছে নিয়েছেন তাঁর তীব্র ট্র্যাজিক নাটকীয় কবিতা, তার অঙ্গে-অঙ্গে ভরে দিয়েছেন অনর্পিত সংরাগ, আর শুমান সনাক্ত করেছেন শান্তসমাহিত সেই কবিকে, ত্রিতাপ ভেঙে-ভেঙে যিনি ঈশ্বর বানাচ্ছেন।

সুধীন্দ্রনাথের স্বভাবে এই দুই সুরকারের প্রকৃতি এসে মিশেছে। হাইনেকে নির্বাচন করবার মুহূর্তে তাঁর কবিচিত্তে এই দোটানা তীব্র নিখাদে ঝংকার দিয়েছিল। অর্কেস্ট্রা-তেই সুধীন্দ্রনাথের ঋদ্ধ ভারসাম্যের একটা আদল দেখতে পাই আমরা, যদিও অদীক্ষিত পাঠকের চোখেও একথা গোপন থাকেনা যে সেই ঋদ্ধিতে—তাঁরি ভাষায় বলতে গেলে—'নিস্তাপ স্মৃতির অন্তর রোমন্থন' তখনো মেলেনি। 'অনুষঙ্গ' (১৪ এপ্রিল ১৯৩০) থেকে 'উদ্‌ভ্রান্তি' (৪ মার্চ ১৯৩১) পর্যন্ত যদি কেউ কোনো ভাবক্রম খুঁজবার চেষ্টা করেন, তাঁকে বারংবার অভিমুখী ও প্রতিমুখী নানা সংশয়ে বিদ্ধ হতে হবে, তিনি সহজেই ধরতে পারবেন যে কবি এখনো এই মমতাহীন গ্রহের পরিচ্ছন্ন নাগরিক হিসেবে তাঁর বর্ম খুব নিপুণভাবে ধারণ করতে পারছেন না। এই সময়েই তিনি হাইনের কবিতা, স্বরচিত কবিতার উৎক্রান্তির প্রয়োজনেই, আশ্রয় করেছেন। এরকম বললে অত্যুক্তি হয়না, সুধীন্দ্রনাথের স্বরায়ণে যে-'আপেক্ষিক গুরুত্বে'র মূর্ছনামীড় শোনা যায়, যে-লঘুগুরু প্রবণতার সাহায্যে উদাসীন পাঠককেও তিনি জয় করে নেন, তার আড়ালে ক্ষণিকার রবীন্দ্রনাথ ও রোমানৎসেরোর হাইনের ভূমিকা অত্যন্ত অব্যর্থ।

'প্রতিধ্বনি'র উৎসসূত্রে পৌঁছে লক্ষ্য করা যায় শেক্‌সপীয়রের পরেই হাইনের জায়গা। শেক্‌সপীয়রের তেইশটি সনেট, হাইনের ষোলটি গীতিধর্মী কবিতা, যার মধ্যে সেই কবির একটিও 'ফ্রেস্কো-সনেট' নেই। দ্বিতীয়োক্ত কবিকে কোন ধারাবাহিকতার পারম্পর্যে ফেলে যাচাই করার কোন আগ্রহও তাঁর বঙ্গীয় সতীর্থে ছিলনা। তার কারণ, হাইনের কবিতায় যেখানেই গাহন করছিলেন, সেখানেই একধরনের স্বাভাবিক আত্মীয়তার আরাম পাচ্ছিলেন তিনি। অনেকটাই যেন রবীন্দ্রনাথ-আমিয়েল সম্পর্কের মতো তাঁর মধ্যে একটি যুগ্মতা তৈরি হয়ে চলেছিল। শুধু এসময়েই নয়, এক দশক পরে যখন এই সব 'আদি রচনা'র পরিমার্জনা ঘটিয়েছেন, তখনো—কিংবা বুঝি বলা যায় তখনই—এই সম্পর্কের ভিতরে একটি স্বাভাবিক নাটকীয়তার পরিচয় পাচ্ছি আমরা। তাঁর সেই পর্বের কবিতার পরোক্ষ আস্বাদ নিলে এটাও বোঝা যায়, এই সম্পর্কের বীজাংকুর তাঁর কবিপ্রকৃতির মধ্যেই রয়ে গিয়েছিল, ঐ আত্মীয়তা তাঁকে 'তৈরি' করে নিতে হয়নি যেন। যাঁকে কোন কোন ঐতিহাসিক 'উনবিংশ শতাব্দীর সমানবয়সী' বলে মনে করেছেন সেই কবির সঙ্গে তাই 'বিংশ শতাব্দীর সমানবয়সী' বাঙালী কবির সারূপ্য এক স্বাভাবিক ঘটনা।

'ফলত সাম্প্রতিক বাঙালি লেখকের পক্ষে তর্জমা আর মূল রচনার সমস্যা সমান', সুধীন্দ্রনাথের এই অঙ্গীকার এখানেও অনুবাদের একটা মাপকাঠি হিসাবে ধরতে হবে। রবীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে-র হাইনে যদি হন কান্তকোমল, তার সূত্র হিসাবে জানতে হবে ঐ দুই কবির রোমান্টিক-মিস্টিক মানসিকতা। সুধীন্দ্রনাথের হাইনে যদি হন বিষামৃতময়, সেখানে, শেষ পর্যন্ত, একাধারে বেতালসিদ্ধ ও ট্র্যাজিক সুধীন্দ্রস্বভাবই আমাদের ঔৎসুক্যের বিষয় হতে পারে। সেই সঙ্গে যখন আমরা লক্ষ্য করি, তাঁর অনূদিত অন্যান্য কবিদের তুলনায় হাইনের ক্ষেত্রেই তিনিই সবচেয়ে বেশি স্বাধীনতা নিয়েছেন, আমাদের সেই আগ্রহে নতুন একটি মাত্রা এসে অন্বিত হয়। মার্ক ওয়ার্ড্‌লের প্রবর্তনায় তাঁর ভালেরি-ভাষান্তর অথবা মালার্মে-তর্জমায় শুধু রূপের কাছেই নয়, ভাবগত গঙ্গোত্রীর কাছেও কবির আনুগত্য সীমাহীন। এবং সুধীন্দ্রনাথের অনুবাদতত্ত্বের ঔপপত্তিক ধ্যানধারণার সঙ্গে যাঁদের সামান্যতম পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন বিশ্বসংস্কৃতির সাধক এই কবি মৌল সংস্কৃতির স্থানিক বা ভৌম বর্ণিমাকে ক্ষুণ্ন করতে চান নি। মালার্মে-ভালেরির স্থানান্তরণেও তাই আমরা দুই সংস্কৃতির কোনো গুরুচণ্ডালী দেখিনা। তাঁদের বেলায় 'ক্রিসমাসের পরিবর্তে জন্মাষ্টমির ব্যবহার' করতে তিনি অনিচ্ছুক। এর কারণ এমনও হতে পারে, তাঁর থিয়োরির ঘনীভবনের মুখেই তিনি ফরাসী প্রতীক কবিতার দিকে ঝুঁকে পড়েন, তার আগে পর্যন্ত তাঁর প্রধান অভীপ্সা ইংরেজী-জর্মন কবিতায় ন্যস্ত। পরবর্তীকালে, সচেতন হয়ে যখনই এই পর্বের অনুবাদের উচ্চাবচতা পর্যালোচনা করেছেন, তাঁকে মানতে হয়েছে, 'ইংরেজি বা জর্মন দশ অক্ষরে আঠারো অক্ষরের বাংলা লাইন ভরানো এত শক্ত লেগেছিল যে কেবল পাদপূরণের গরজে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের সাধু রূপ গ্রহণ ও বর্জন, তথা আরও অনেক সুবিধাবাদী প্রকরণ, এড়িয়ে যেতে পারিনি; এবং তৎসত্ত্বেও যেখানে মাত্রাগণনায় কম পড়েছিল, সেখানে অগত্যা যে পুনরুক্তি বা বিশেষণ বাহুল্যের শরণ নিয়েছিলুম তাতে ঐ কবিযুগলের মতিগতি প্রকাশ পায় নি'। (প্রতিধ্বনি, প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ১০)।

শুধু কি ঐ প্রাকরণিক সুযোগ সন্ধান? নাকি নিজের জায়মান কবিস্বরূপের জমিন্ রচনা করার তাগিদে ঐ কবিযুগল, বিশেষত হাইনেকে যথেচ্ছ ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন তিনি? ভাব ও রূপ উভয়ত এই দীক্ষার্থী কবি সেদিন তাঁর জর্মন সতীর্থের সমীপে অঞ্জলি মেলে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর অর্থ এই নয়, নিঃশর্ত সমর্পণেই তাঁর উপাংশুব্রত সেদিন ক্ষান্ত হয়েছিল। গুরুদক্ষিণা

দ্বিগুণ মাত্রায় প্রত্যর্পণ করবেন বলে তাঁকে অনেক সময় সরে দাঁড়াতে হয়েছিল দারিদ্র্যময় ব্যবধান মেনে। হাইনের দুর্বলতম কবিতার বই থেকে কবিতা নিয়ে তাকে আক্রান্ত করতে হয়েছিল পুনর্নব অনন্যতায়। গদ্যের অনুবাদক যেখানে মূল রচয়িতার সেবাব্রতী, কবি-অনুবাদক সেখানে মৌল স্রষ্টার প্রতিস্পর্ধী, রুশ সমালোচকের এই অবলোকন এখানে অবান্তর হয়ে যায় না। এই প্রতিস্পর্ধা কতোদূর শিল্পায়ত সার্থকতা পেয়েছে, সে-বিধান যেমন, তাঁর ব্যক্তিত্ব কীভাবে বলয়িত হয়ে উঠেছে, সেটিও তাই তেমনি, প্রাসঙ্গিক। 'প্রতিধ্বনি' থেকে আমাদের প্রিয় তিন-চারটি কবিতার অন্তঃসাক্ষ্যে সেই সন্ধান সূচিত হতে পারে।

যে কবিতা দিয়ে তাঁর হাইনে-পর্যায় শুরু হয়েছে, সেটির কোনো তর্জমা-তারিখ অনুবাদক আমাদের জানান নি। হাইনের 'ঘরে ফেরার বাঁক' (Die Heimkehr)-পর্যায়ের সপ্তম এই কবিতাটির সাত স্তবক 'গোধূলি' নামে আজ আমাদের কবিতার ইতিহাসে একটি আভাবিভূতি বিস্তার করে আছে। স্তবক ধরে ধরে, সুধীন্দ্রনাথের অপ্রতিম ভাষ্যের পাশাপাশি পাংশু পেঙ্গুইন গদ্যে তার ভাষান্তর সমান্তর সাজানো যেতে পারে:

১ মাঝি-মাল্লার বৈকালী সভা:
আকাশ, বাতাস, গোধূলি মাথে:
তার পাশে ব'সে, বাহিরে তাকাই,
যেখানে সিন্ধু অসীমে ডাকে॥

২ জলে একে একে দিশারী প্রদীপ,
আলোক মঞ্চ অভয়ে ভাসে;
দূর দিগন্তে বিবাগী জাহাজ
এখনও দৃষ্টিগোচরে আসে॥

৩ আলোচনা হয় নাবিক জীবন
তুফানে কী করে নৌকো ডোবে;
শূন্যে ও জলে যেরা কাণ্ডারী,
দ্বিধাটলমল খুশিতে ক্ষোভে॥

১ আমরা বসেছিলাম ধীবরের কুটিরের পাশে,/
আর তাকিয়েছিলাম সমুদ্রের দিকে;/
সান্ধ্য কুয়াশাপুঞ্জ এসেছিল, /
উঠেছিল ঊর্ধ্বমুখে। /

২ বাতিঘরে আলোগুলি/
ক্রমশ দীপিত হতে থাকল,/
আর দূরাতিদূরত্বে/
ব্যক্ত হয়ে উঠল আরো একটি জাহাজ।/

৩ আমরা বলাবলি করছিলাম ঝড় আর জাহাজ ডুবির, /
নাবিকের কথা, আর কী করে সে বাঁচে /
আর আকাশ ও জলের মাঝখানে,/
আর ভয় ও খুশিতে স্পন্দমান।/

অভাবনীয়ের লীলা নিকেতন অবাচী, উদীচী, প্রতীচী, প্রাচী : আচারে, বিচারে বিপরীত মতি, মানবসমাজ সব্যসাচী ॥	৪ আমরা বলাবলি করছিলাম দুরন্ত সৈকতাবলির,/ দক্ষিণের আর উত্তরের,/ আর অদ্ভুত অধিবাসিদের আর তাদের অদ্ভুত যতো রীতিনীতি নিয়ে ।/
৫ স্রোতে প্রতিভাত লক্ষ মাণিক মত্ত মলয় বকুল বনে, গঙ্গার তীরে সৌম্য পুরুষ সমাধিমগ্ন পদ্মাসনে ॥	৫ গঙ্গার কূলে সুগন্ধিময়, ভাস্বর,/ আর দৈত্যেরমতো গাছগুলি বিকচ/ আর সুন্দর, সমাহিত মানুষেরা/ নতজানু হয় পদ্মফুলের কাছে ।
৬ ল্যাপ্ দেশীয়েরা বামনের জাতি, নোংরা, হাঁ বড়, চ্যাপ্টা মাথা, আগুন পোহায়, মাছ সেঁকে খায়, কথা কয় না তো, ঘোরায় যাঁতা ॥	৬ ল্যাপ্ল্যাণ্ডে থাকে নোংরা লোকেরা,/ মাথা মোটা, থ্যাবড়া-মুখো, ক্ষুদ্রাকার ; আগুন ঘিরে উবু বসে থাকে,সেঁকেনেয়/ মাছ, আর কিচির মিচির করে, আর চেঁচামেচি জুড়ে দেয় ।
৭ যে যা বলে, সে তা কান পেতে শোনে, তার পরে মুখ খোলে না আর ; দেখা যায় না সে বিবাগী জাহাজ, বাহিরে গভীর অন্ধকার ।	৭ মেয়েরা শুনছিল একাগ্র গভীর, / শেষে আর কেউ আর কিছুই বলল না;/ জাহাজটা আর রইল না দৃষ্টিগোচর,/ অন্ধকার ঘনালো খুব বেশি ।/

শুধু যতিচিহ্ন প্রয়োগে নয়, স্তবকের অন্তর্লীন প্রবাহমানতাকে সুধীন্দ্রনাথ যতোদূর সাধ্য পংক্তিসংবৃত করার ফলে অনুবাদে একধরনের বিদগ্ধ সংহতিগুণ এসেছে, সন্দেহ নেই। অনুবাদক যে ইতিমধ্যেই 'হাইনেনামাঙ্কিত স্তবকে'র (Heinestrophe) মন্ত্রগুপ্তি আয়ত্ত করে তাকে বাংলা ভাষায় সুদে-আসলে খাটিয়ে নিতে পারবেন, সে বিষয়েও সংশয় করা চলে না। শেষ স্তবকের মায়াবী বহুবচন সে—সর্বনামের একবচনে সংকুচিত হয়ে হয়তো একটি বিশেষিত ধ্বনিমহিমা এনেছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা থাকে, এই 'সে' কে ? কোথায় যেন 'সোনার তরী'র অনুশ্রুতি আমাদের একবার অনিশ্চিতভাবে ছুঁয়ে যায়। আমরা সুধীন্দ্রীয় মন্ত্রের মায়ায় চোখ বুজে আত্মসমর্পণ করতে গিয়েও ভাবি, এর বৃহদংশই হয়তো রাবীন্দ্রিক। না কি ভারতীয় ? হাইনে যেমন হের্ডের-

গ্যোয়ঠে-হেল্ডারলীনের পথেই কল্পিত ভারতবর্ষের দিকে হাত বাড়িয়ে দিতে গিয়ে কালিদাসের দুয়েকটি চিত্রকণা লোভীর মতো কাজে লাগিয়েছিলেন, সুধীন্দ্রনাথ যেন এখানে হাইনের হাত ঘুরে একটি আশ্চর্য অলীক ভারতীয়তাকেই অর্জন করতে চেয়েছেন। মালার্মের কাছ থেকে বৌদ্ধ নির্বেদ ও প্রতীত্যসমুৎপন্ন শূন্যবাদ অঙ্গীকার করছেন তিনি, সে অনেক পরের ঘটনা। এই পর্বে তিনি তাঁর নিজস্ব অন্তর্জ্বালা বিসর্জন না দিয়েই মনে প্রাণে ভারতীয় হতে চেষ্টা করছিলেন, সেকথা বললে কি অন্যায় হবে ?

আর তাই অব্যবহিত পরবর্তী 'তত্ত্বকথা' (Doktrin) কবিতার প্রথম স্তবকে 'Das ist der Bücher tiefster sinn' 'বেদ-বেদান্তে নেই কিছু তার বাড়া' এবং শেষ স্তবকে 'Das ist die Hegelsche Philosophie' 'যা বলেছেন শঙ্করাচার্য'-তে পরিণত হয়েছে। 'অধঃপাত' (Entartung) নির্বাচনের মূলেও কাজ করেছে স্বভাব ও ধর্মের মধ্যে একটি সমন্বয়ের সাধনা :

অনাচারে ডোবে নিসর্গসুন্দরী—
মানবধর্মে নিয়েছে কি সেও দীক্ষা ?

যদি কারো উৎসের

Hat die Natur auch Verschlechtert ;
Und nimmt die Menschenfehler an ?

প্রারম্ভিক এই শ্লোকাংশ এখানে মনে আসে, তাঁকে মানতেই হবে প্রতীপ-সম্মিতি বা ambivalence-এর কবি সুধীন্দ্রনাথ ঈষৎ প্রশ্রয় আর কর্ষিত ভর্ৎসনার ভঙ্গিতে প্রকৃতিতে অদ্বৈতবাদীর দৃষ্টিতে প্রাতিভাসিক সুন্দর বিভ্রম আরোপ করছেন। আর মূলে উল্লিখিত 'মানুষের ভুল বা রিপুকে' মানবধর্মে রূপান্তরিত করেছেন, যদিও রবীন্দ্রপ্রদর্শিত মানুষের ধর্মের সঙ্গে তার কোনোই যোগ নেই। পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবে আপাতত জানবার উপায় নেই দশমীর প্রাক্-পূর্বেই আলবালের মুহূর্তে এই ভাবান্তরগুলি সুধীন্দ্রনাথ অনুবাদের শরীরে সাধিত করেছিলেন কিনা। শুধু একটি অনুমান এখানে দ্বিধান্বিত নিশ্চয়তা নিয়ে উচ্চারণ করা যেতে পারে। অরুণকুমার সরকার বলেছেন, দশমীর যুগেই কবি তাঁর সব খেলাধুলো সাঙ্গ করে রবীন্দ্রনাথ ও হীরেন্দ্রনাথের কুলায়ে ফিরছিলেন। মনে হয়, কালপুরুষের সেই ফেরার টান শুরু হয়ে গিয়েছিল অনেক আগেই, শুরুর মধ্যেই ছিল শেষের রুদ্রাক্ষরক্তিম অভিমান। তাই বেদান্তের প্রস্থান ভূমিকা থেকে প্লেটোর প্রাক্‌রূপলোক অতিক্রম করে বৌদ্ধ

বিহারে কিছুদিন বাস করে পুনর্বার বৈদান্তিক জীবন্মুক্তির অসাধ্য বাসনা তিনি শিরায়-শিরায় অনুভব করেছিলেন বলে মনে হয় (সেই নক্ত পর্বে, আশ্চর্য, তুলসীদাসের দিকেও, একই কারণে, মুগ্ধ বিষণ্ণ চোখ পড়েছে তাঁর)। অনূদিত হাইনের আরো দুয়েকটি জায়গায় ভারতীয়তা আরোপণ কখনো কখনো জ্যোতিরিন্দ্রের 'হঠাৎ নবাব' অনুবাদের দেশজ মাধ্যাকর্ষ দোষ মনে পড়ায়। সীতা (Lucretia), শকুন্তলা, কালিদাসের (die Heniade Voltaires), কাদম্বরী (Klopstocks Messiade), কৃষ্ণ (der Sohn den Thetis), তানসেন (Alexander Dumas) প্রভৃতি নামাবলিতেই নয়, তাদের যাবতীয় অনুষঙ্গকে মাটিসুদ্ধু উপড়ে এনে কর্কটক্রান্তির গৌর-শ্যামল অঙ্গনে রোপণ করার দৃষ্টান্ত রসাভাস নিয়ে আসে।

'মহাকাব্য' (Das Hohelied) এই ধারার শ্রেষ্ঠ কবিতা। কিন্তু ভারতীয় ভাবানুষঙ্গ জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার ফলে তার নন্দনমূল্য বাড়েনি। 'বিশ্বমহাভারতের অন্তর্গত গীতা' (ins grosse Stammbuch der Natur) থেকে 'মহাকাব্য সরস সার্থক' (Das Hohelied der Lieder)—এই বীক্ষণে বাঁক নেওয়ার মুখেই পাঠকের কাছে ধরা পড়ে অমরু-বিহ্লন গোবর্ধন আচার্যের ঘরাণার রাজসভাশ্রিত শৃঙ্গারাশ্রিত কবিতার আবহকেই এখানে ছেঁকে নিচ্ছেন তিনি। আর তাই মহাকাব্য ও খণ্ডকাব্যের দুই দ্বিধাবিভাজিত জগতের মধ্যে যে-অবিশ্বাস্য দূরত্ব আমাদের সংস্কারে প্রোথিত, তাকে অতিক্রম করতে অনেকখানি সময় লেগে যায়। শেষ পর্যন্ত আমাদের মনে জেগে থাকে, অত্যাশ্চর্য প্রয়াসের বিয়োগফলের মতো, ব্যবহৃত অন্ত্যমিলের কারুকলার সপ্রশংস স্মৃতি!

স্তবকের সঙ্গে অন্ত্যমিলের নিগূঢ় সম্বন্ধের সমাচার জানতেন হাইনে, সুধীন্দ্রনাথ। দুজনেই ব্যাপকপরিমাণে প্রান্তপ্রাস ব্যবহার করেছেন, স্বয়ংসম্পূর্ণ স্তবকের গাঁথুনি অটুট রাখবার জন্যে। এঁদের দুজনেরই কবিতায় অপ্রত্যাশিত অন্ত্যমিল এসেছে আরো একটি কারণে। স্তবকের স্থাপত্য অক্ষুন্ন রেখে, তারি মধ্যে—রঁসার ও বীরবল যেমন তাঁদের সনেট-অবরোহের বিবিক্ত প্রথম দ্বিপদী-অংশে—জীবন সম্পর্কে তীক্ষ্ণ অনৃজু নানা নিরীক্ষণ এঁরা নিপুণভাবে অনুস্যূত করে নিয়েছেন। এই ঈক্ষণ প্রধানতঃ স্যাটায়ারশাণিত এবং ভাবানুগ অন্ত্যমিলগুলি ক্ষিপ্রতায় এতই সপ্রতিভ যে মাঝে-মাঝেই মনে হতে থাকে এই বুঝি স্তবকের আরামে রাখা নিরাপত্তামূলক তাদের ঘরখানি ভেঙে পড়ল।

আমাদের অভ্যস্ত সংস্কার ভেঙে দিয়ে এমনকী কবিতার অন্তঃশরীরেও ফাটল ধরিয়ে দেয় এই সব আচমকা প্রান্তমিল। এই কি ছিল সুধীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত ? এটা যে অন্তত অবচেতন অভিপ্রায় ছিল, বিবেকী পাঠকের তাই মনে হতে থাকে। এই অনুমিতি এক এক সময় এতটাই প্রবল হয়ে ওঠে যে বলতে ইচ্ছা করে, দশমী-র পরে যদি সুধীন্দ্রনাথ আরো কিছুকাল ধরে কবিতাটা করতেন, তাঁকে অনিবার্যত মেনে নিতে হত একরকমের ঢিলেঢালা চাল। প্রায় গদ্যকবিতার কাছাকাছি, যার প্রতি তিনি আজন্ম বিরূপাক্ষ ছিলেন। দশমীতে তাঁর কবিতায় আলংকারিক পরম্পরা (Poetic convention) এমন একটি সিদ্ধির শেষাদ্রিচূড়ায় পৌচেছে যেখানে অতঃপর দুটিমাত্রই পথ কবির সামনে খোলা থাকে: সংহারময় আত্মপ্রত্যাহার, অথবা অর্জিত সার্থকতাকে অল্পস্বল্প এলিয়ে দিয়ে সমতলপ্রয়াণ। দ্বিতীয় পথটি যে গোপনে তাঁকে টানছিল তার প্রমাণ তাঁর জীবনের শেষ কাজ আপাতবিস্রস্ত হোল্‌ট্‌হুজেন অনুবাদের নির্ভার জল্পনার মুক্তধারায়, যা অনুভূতির প্রতিলিখন ধর্মে কোথায় যেন আমাদের শেষ লেখা-র উদাসীন ধ্রুবতায় তছ্‌নছ্‌ করে দিয়ে যায়।

অন্ত্যমিল আর প্রবহমানতার মধ্যে একটি সহজ সেতু রচনার কথা যে অনুবাদক ভেবেছেন তার প্রমাণ 'অবিশ্বাসী' (Der Ungläubige) কবিতায়। প্রত্যেক স্তবকে চার লাইন এবং তার চারটি স্তবকে সম্পূর্ণ এই কবিতায় হাইনে যে প্রাকৃত কৌলিন্যের দক্ষতা দেখিয়েছেন, সুধীন্দ্রনাথের প্রতিমানেও তার নিদর্শন। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ মূলের চার লাইনকে ভেঙে সবসময়ই পাঁচ লাইনে পরিণত করেছেন এবং প্রথম তিনটি স্তবকের শেষে হাইনের আত্মপ্রতীতিসূচক পূর্ণচ্ছেদের জায়গায় প্রশ্নচিহ্ন স্থাপন করেছেন :

সুধীন্দ্রীয় তর্জমায় প্রথম স্তবক	হাইনে থেকে সরাসরি
পাব আমি আজ তোমাকে আলিঙ্গনে!	তুমি আজ আমার বাহুবন্ধে শমিত
সুখের উৎস, অবরোধ টুটে,	হবে! / উত্তাল আনন্দে বাধাবন্ধ /
বারে বারে তাই বুকে নেচে উঠে ;	কাঁপিয়ে লয় আর ধিকিধিকি
তাই বিমোহন স্বপনের রং ধরেছে মনে।	জ্বালায় আমার সমগ্র হৃদয়/এই মোহিনী
সত্য পাব কি তোমাকে আলিঙ্গনে ?	ভাবনার আবেশে। /

মাত্রাবৃত্তের পংক্তিভিত্তিক মসৃণতা বাঁচিয়ে রেখেও যে পরিবেশে 'আঁজাব্‌সা'র অন্তঃস্রোত উশ্‌কে দেওয়া সম্ভব, এ তারি অব্যর্থ উদাহরণ।

'স্মৃতিবিষ' (An Jenny) কবিতায় সেটিই মূলাতিগ স্বাচ্ছন্দ্যের দরুন, আত্মসচেতন আলাপচারিতার ঘরোয়া-জড়োয়া বিরোধাভাসে।

'প্রতিধ্বনি'তে হাইনে মাত্রাবৃত্তে ৯, অক্ষরবৃত্তে ৪, স্বরবৃত্তে ২, আর স্বরমাত্রিকে ১ ('প্রায়শ্চিত্ত')—এই পরিসংখ্যার মধ্যে দ্বিতীয় বর্গে শব্দব্যবহারের অমিতব্যয়িতাসত্ত্বেও সুধীন্দ্রনাথের অমিত শক্তি প্রকাশ পেয়েছে। এদের মধ্যে 'আত্মপরিচয়' (Enfant perdu) সেই কবিতা যার মধ্য থেকে পঞ্চম-ষষ্ঠ দশকের বেশ কয়েকটি শক্তিশালী কবিতার নিষ্ক্রমণ সম্ভব হয়েছে। কবিতাটি হাইনের জীবনকে যেমন, সুধীন্দ্রনাথের অনতিগোচর ব্যক্তিপুরাণকে তেমনিই, মিতালেখ্যে ধরে রেখেছে। বিশেষণ বাহুল্য, অব্যয়ের অপব্যয়ে হাইনেকে তিনি এখানেও বিকেন্দ্রিত করেছেন। সর্বশেষ চরণগুলিতে তার বিশদ অভিব্যক্তি :

সুধীন্দ্রীয় তর্জমা	হাইনে থেকে সরাসরি
অনাথ দুরান্ত দুর্গ ; রক্তগঙ্গা আহত প্রহরী ; বন্ধুরা নিহত, কিংবা অগ্রগামী, নচেৎ বিমুখ ; মরণেও অপরাস্ত, অবশেষে খাতে ট'লে পড়ি ; ভাঙেনি আমার অস্ত্র, শুধু জানি ফেটে গেছে বুক ॥	একটি ঘাটি শূন্য—আমার সমস্ত ক্ষতগুলি উন্মুক্ত— / একজন পড়ে যায়, অন্যেরা পিছনে ধায়— / অবশ্যই অবিজিত আমি পড়ে যাই, আমার অস্ত্রশস্ত্র / ভেঙেচুরে যায় নি—শুধু আমারই হৃদয় ভেঙে গিয়েছিল। /

দশমীতে আমরা যে বলিষ্ঠ নৈরাশ্যবাদের দাহদ্যুতি দেখতে পাই, এখানে কি তার একটি পূর্বাংকুর পাচ্ছি না ? শুধু তাই নয়, দশমীর পঙ্গু নাবিকের পঙ্গু পাখায় বিষাদমণ্ডিত প্রাণনপ্রেতির দাক্ষিণ্য কি হাইনেরই উপহার নয় ?

ফরাসিভাষায় হাইনের আপন রচনার স্বকৃত অনুবাদ ও সুধীন্দ্রনাথের ইংরেজি অনুবাদে তাঁর স্বরচিত কবিতার তুলনা করলে চোখে পড়ে এক দুর্জয় নিষ্ঠার ছাপ। সে নিষ্ঠা কখনো কখনো মূল রচনাকে অস্বস্তিকর বিশ্বস্ততার সামীপ্যে অনুসরণ করে। সুধীন্দ্রনাথের হাইনেঅনুবাদে, পক্ষান্তরে, কবি ও কবি-অনুবাদকের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ অথচ পরিসরবহুল সত্তার অবকাশ আছে যা বন্ধুতা, প্রেম ও শিল্পের পক্ষে জরুরী। সুধীন্দ্রনাথের হাইনে তা নাহলে হয়তো আমাদের হাইনে হয়ে উঠতে পারতেন না।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

সুধীন্দ্রনাথ, বাংলা গদ্য

উৎকৃষ্ট গদ্য বললে সারল্য, যাথার্থ্য, স্পষ্টতা, ভারসাম্য—এই কয়েকটি আবশ্যিক গুণের প্রতি ম্যাথু আর্নল্ড এক সময় তর্জনীসংকেত করেছিলেন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার থেকে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত—এই দীর্ঘসময় বাংলা গদ্যের জন্ম-সময় থেকে পরিণতির দিকে যাত্রা। কিন্তু ম্যাথু আর্নল্ড-কথিত সেই পরিণতির দিকেই কি এই যাত্রা? এই জিজ্ঞাসা স্মরণে রেখেই বাংলা গদ্যের বিকাশ ও ঐশ্বর্যের কথা চিন্তা করতে হয়। পদ্যের বাহনে আমরা যে আমাদের সমস্ত বক্তব্য পরিবেশন করতে পারি না—একথা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার বা রামমোহন রায়ের গদ্য দীর্ঘকাল আগেই প্রমাণ করেছে। তবু বাংলা গদ্য স্বাবলম্বী হতে প্রায় দেড়শ বছর সময় লেগেছিল। অগ্রজশোভন বাংলা পদ্যের পদমর্যাদা লাঘব করে যথার্থ গদ্য লিখিত হয় মাত্র গত কয়েক দশক আগে। বাংলা গদ্য পদ্যের নিকৃষ্ট উপকরণ অর্থাৎ অলংকার সর্বস্বতা নিয়ে প্রথম পদচারণা শুরু করে। সেই গদ্য আজ আমাদের নৈমিত্তিক জীবনের সুভাষিতাবলি হয়ে উঠেছে। অলংকার সর্বস্ব বাংলা গদ্য বিভিন্ন লেখকের শিল্পেনিকষে পরীক্ষিত হতে হতে অলংকার-পরিমার্জিত ঋজু সরল গদ্যে পরিণত হয়েছে। ম্যাথু আর্নল্ডের অমোঘ সংকেত সফল করে বাংলা গদ্য আজ কবিতার চেয়েও আমদের নিকটতম পরিভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলা গদ্যের এই আশ্চর্য রূপান্তরে যেসব গদ্যলেখক কৃতিত্বের দাবিদার, তাঁদের মধ্যে কয়েকজনই মূলতঃ কবি—রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের কথা-গদ্যের ঐশ্বর্য ও প্রবন্ধ-গদ্যের ঋজু ভঙ্গী বাংলা গদ্যের শেষ কথা নয়। রবীন্দ্রনাথের হাতে সাধুগদ্যের অমেয় ঐশ্বর্য (প্রাচীন সাহিত্য), সাধুচলিতের সীমান্ত প্রদেশের 'জীবনস্মৃতি'র গদ্য, তৎপরবর্তী চলতি গদ্যের নিপুণ ঝংকারও বাংলা গদ্যের শেষ কথা নয়। গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধ সাধনে দ্বিজেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ও সুধীন্দ্রনাথের শিল্প-প্রয়াস, চলতি গদ্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় বিবেকানন্দ, হরপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর সাফল্য বাংলা গদ্যের অগ্রগতিতে সহায়তা করেছে।

বাংলা গদ্যচর্চায় কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের স্থান কোথায়? এই প্রশ্নের বিচার করতে গিয়ে ইংরেজি গদ্যচর্চায় জন মিল্‌টনের ভূমিকার কথা মনে পড়ছে। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে :

Apart from the outstanding position of Milton as a moulder and exemplar of English poetic diction, he is of interest in at least three ways to the student of the development of the English language. He had ideas on spelling, with which he experimented ; he was a keen student of the language and a supreme practitioner of it ; and he has added a member of words and phrases to the literary vocabulary if not to the spoken. ('The English Language' C.L. Wrenn, E.L.B.S. edition, p. 170)

মিল্‌টন সম্পর্কে এখানে যা বলা হয়েছে, তা সুধীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও বলা যায়। বাংলা শব্দের গঠন ও প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিল গভীর, বানান সম্পর্কে ছিলেন অত্যন্ত সচেতন; তিনি ছিলেন বাংলা গদ্য ভাষার নিপুণ শিল্পী, একনিষ্ঠ সেবক; বাংলা সাহিত্যের শব্দভাণ্ডারে তিনি দিয়েছেন অনেক শব্দ। মিল্‌টন যখন কেমব্রিজে ছাত্র ছিলেন তখন দর্শন বিজ্ঞানচর্চা প্রভৃতি উচ্চ কোটি চিন্তার বাহন ছিল ল্যাটিন। সেদিন নেটিভ ভাষা ইংরেজির প্রতি অনুরাগ দেখিয়েছিলেন মিলটন। সংস্কৃত ও ইংরেজিতে সুধীন্দ্রনাথের ছিল স্বচ্ছন্দ অধিকার, কিন্তু বাংলা চর্চায় তাঁর অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে গোড়া থেকেই। বাংলা গদ্যের চর্চায় তিনি ছিলেন এক চক্ষুষ্মান অনুরাগী; অন্ধ সংস্কারানুগত্যে সংস্কৃত বা ইংরেজির দাসত্ব তিনি করেন নি। প্যারডাইস লস্ট মহাকাব্যের সঙ্গে সংযুক্ত বক্তব্যে ('দি ভর্স') মিল্‌টন গদ্যভাষায় সংগীতের কথা উত্থাপন করেছেন। গদ্যভাষার অন্তর্নিহিত সংগীত সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথ সচেতন ছিলেন। শব্দনির্মাণে ও ব্যবহারে মিলটনের উৎসাহ ও দক্ষতা সুধীন্দ্রনাথেরও ছিল। pandemonium শব্দটি মিলটনই প্রথম ব্যবহার করেন প্যারাডাইস লস্ট মহাকাব্যের প্রথম সর্গে ৭৫৬ চরণে। এটি তাঁরই তৈরি—গ্রীক শব্দ pan (all) + daimon (devil)-যোগে এটি নির্মিত। প্যারাডাইস লস্ট-এর অনেক বাক্যাংশ অধুনা ইংরেজি গদ্যভাষায় গৃহীত—যেমন 'Precious bane' (I, 692), 'from noon to dewy eve' (I, 743),

'secret conclave' (I, 795), 'the gorgeous East' (II, 3), 'prove a bitter morsel' (II, 808), 'confusion worse confounded' (II, 996), 'hide their diminisht heads (IV, 35); 'a heaven on earth' (IV, 208), 'wild work in heav'n' (VI, 698), 'to save appearances' (VIII, 82), 'a pillar a state' (II, 302).

দৈনন্দিন ব্যবহারে এই সব বাক্যাংশের প্রয়োগ প্রমাণ করে মিলটন ইংরেজি গদ্যভাষা কত গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। ইংরেজি বাইবেল আর শেকসপীঅরের মতোই মিলটন ইংরেজি গদ্যভাষাকে ব্যাকাংশ (ফ্রেজ) দ্বারা প্রভাবিত করেছেন। যারা কোনদিন মিলটন পড়েনি তারাও না জেনে তাঁর বাক্যাংশ ব্যবহার করে থাকে।

তা ছাড়া মিলটন আঞ্চলিক ভাষার শব্দ ও অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করেছেন অনায়াস নৈপুণ্যে। 'Charm' (Paradise Lost, IV, 642), 'Scrannel' (Lycidas, 124), 'rathe' (England's Helicon', 142), 'dingle' (Comus, 312)-এই শব্দ তিনি আঞ্চলিক ভাষার অর্থেই প্রয়োগ করেছেন।

শব্দ নির্মাণ ও প্রয়োগে, আঞ্চলিক ভাষার শব্দ আদি অর্থে ব্যবহারে, সংহত বাক্যাংশের নিপুণ প্রয়োগে সুধীন্দ্রনাথ মিলটনের মতোই সুদক্ষ ছিলেন। সুধীন্দ্রনাথের গদ্যভাষা সম্পর্কে যে আপত্তি (সংস্কৃত-নির্ভরতা ও সিনট্যাক্সের জটিলতা) ওঠে, মিলটনের গদ্যভাষা সম্পর্কে অনুরূপ আপত্তি উঠেছিল।

সুধীন্দ্রনাথের পিতা হীরেন্দ্রনাথের ইচ্ছানুসারে তাঁর দুই পুত্র সুধীন্দ্রনাথ ও হরীন্দ্রনাথ কাশীতে প্রেরিত হন ও তাঁদের জ্যেঠামশায়ের বাড়িতে থেকে অ্যানি বেশান্ত প্রতিষ্ঠিত কাশীর থিওসফিক্যাল স্কুলে সংস্কৃত ও অন্যান্য বিদ্যা শিক্ষা করেন। কাশীতে বিশেষভাবে সংস্কৃত শিক্ষা করবার পরও পিতার কাছে পুত্রেরা কালিদাস পড়েছেন। সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনে, পারিবারিক কারণে, সুধীন্দ্রনাথের সহজ অধিকার ছিল। স্কটিশচার্চ কলেজে ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ক্লাসে ইংরেজি সাহিত্য তাঁর পঠনীয় বিষয় ছিল। এছাড়া বিভিন্ন য়ুরোপীয় ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা তিনি করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি পাশ্চাত্য দেশে ভ্রমণ করেন। বিশ্ব-ইতিহাস, সাহিত্য ও দর্শন সম্পর্কে তাঁর মনে গভীর অনুরাগ সঞ্চারিত হয়। এই বিশ্বমনস্কতা ও ও বৈদগ্ধ্যের ফল দেখা গেল তৎ-সম্পাদিত 'পরিচয়' ত্রৈমাসিক পত্রিকায়।

তিনি বাংলা গদ্যপদ্য দুই-ই লিখেছিলেন। মিলটন ও মধুসূদনের প্রতি তাঁর আন্তরিক আকর্ষণ ছিল, যেমন ছিল রবীন্দ্রনাথ ও প্রথমসমরোত্তর পাশ্চাত্য সাহিত্য সম্পর্কে। গদ্যশিল্পী সুধীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত আলোচনায় এই সব তথ্য জরুরী। তাঁর বিশ্ববীক্ষা, তাঁরই কথায়, 'বাংলার ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক চতুঃসীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল'।

সুধীন্দ্রনাথের গদ্য ও পদ্য একই দীপ্তিমান মনের বহিপ্রকাশ। তাঁর গদ্য কবিতা থেকে খুব একটা দূরবর্তী নয়। যে গদ্যকে সুধীন্দ্রনাথ কবিতা রচনার আদর্শ হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন সে তার নিজেরই গদ্য। তাঁর গদ্য, কবিতার মতই, দুর্বোধ্য নয়, দুরূহ; সুললিত নয়, চিন্তাসাপেক্ষ; ভাবাকুল নয়, যথাযথ; এলায়িত নয়, সংহত, সাংকেতিক পরিভাষানির্ভর; কৃত্রিম সাধু নয়, কথ্যরীতি-নির্ভর।

নিজস্ব গদ্য সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথের নিরাসক্ত বিশ্লেষণ স্মরণযোগ্য:

"আমার পূর্বতন গদ্যে অনুশোচনার হেতু অপেক্ষাকৃত দুর্বল, এবং সে-জন্যে কৃতজ্ঞতাভাজন প্রসঙ্গ ও পদ্ধতির সন্নিকর্ষ, যাতে স্বপ্রাধান্যের অবকাশ নিতান্ত নগণ্য। অর্থাৎ 'স্বগত'-এর প্রায় প্রত্যেক প্রবন্ধ সত্য সত্যই নিজের সঙ্গে বাদানুবাদ; এবং আপন ভুল ভ্রান্তির উচ্ছেদ সে তর্কের মুখ্য অভিপ্রায় বলে, সেখানে বক্তার চেয়ে বক্তব্য বড়। ফলত আমার অল্পবয়স্ক গদ্যে, রূপের আভাস না থাক, রীতির ইঙ্গিত হয়তো আছে; এবং ফরাসী সমালোচকদের মতে রীতি আর রচয়িতা অভিন্ন বটে, তবু প্রকারী নিশ্চয় তখনই প্রকারের প্রয়োজন বোঝে, যখন বাধে বহির্বিশ্বের সঙ্গে স্বোপলব্ধির বিবাদ। তারপর শিল্পী যে শৈলীর শরণ নেয়, বিষয়ীর বিষয়নিষ্ঠাই তার উপজীব্য; এবং উদ্দেশ্য আর উপাদানের সহযোগ যেমন সাহিত্য নামে পরিচিত, ব্যক্তিস্বরূপ তেমনই আত্ম-পরের সন্ধি।" ['পুনশ্চ'। ১৮ জুন ১৯৫৬। স্বগত। ২য় সং]

সুধীন্দ্রীয় গদ্যরীতির প্রকৃতি এখানে আভাসিত। এই নির্মোহ আত্মবীক্ষা-মূলক প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে তিনি যে অর্থবহ মন্তব্য করেছেন, তা মূল্যবান:

"অবশ্য শব্দের অপপ্রয়োগ, ব্যাকরণবিভ্রাট, অপটু বাক্যবন্ধের দোষে অর্থের নিপাতন ইত্যাদির সংশোধন 'স্বগত'-এর দ্বিতীয় সংস্করণে নেহাৎ নগণ্য নয়; এবং কোথাও কোথাও অদল-বদল আরও ব্যাপক। কিন্তু জোরালো কথাকে ঘোরালো করে তোলার অভ্যাস পঁচিশ বছরের আত্মধিকারেও কাটেনি; এবং তির্যক রীতির বিপদ এই যে তার ভঙ্গুর অঙ্গবিন্যাসে যোগ-বিয়োগের

ভার সয় না, পরিবর্তনের ইঙ্গিতে সে অভিপ্রায়ের বোঝা ছত্রাকারে ছড়িয়ে চলার পথে মুখ থুবড়ে পড়ে। তবে আমার উৎকট গতি জ্ঞানত কোনও বিদেশীর পদানুসরণ থেকে উৎপন্ন নয়; এবং শত চেষ্টায় বর্তমান লেখাগুলোর একটাকেও আমি ইংরাজী অনুবাদের ছকে ফেলতে পারি নি, যদিচ আমার কয়েকটা কবিতা অনুরূপ রূপান্তর অল্পাধিক মেনেছে। সুতরাং আমার চিন্তাপ্রণালী অন্তত তাঁদের কাছে বঙ্গীয় লাগবে, যাঁদের অভিজ্ঞতায় ভাব ও ভাষা যমজ; এবং আমার কাব্য কদাচিৎ সার্বজনীন আবেগের প্রসাদ পেয়ে থাকলেও, আমার প্রবন্ধে ব্যক্তিস্বরূপে দ্বন্দ্ববিমুখ ধারণা, আর্যসত্যের প্রতি নির্বোধ পক্ষপাত, এমনকি কবিদের বিষয়ে দুর্মর ভাববিলাস—এ সমস্তের উদ্ভব স্বদেশী কৈবল্যের অনির্বচনীয় নির্বিরোধে।" (পুনশ্চ। স্বগত। পৃঃ ১৯৯।)

আপন গদ্যভাষার চারিত্র্য বিচার করে সুধীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তার মূল কথা:

১: তাঁর চিন্তাপ্রণালী ও গদ্যভাষা একান্তভাবেই বঙ্গীয়। ইচ্ছে করলেই তাঁর প্রবন্ধের বাক্য নিবন্ধকে ইংরেজীতে অনুবাদ করা যায় না।

২: তাঁর ভাষারীতি সংস্কৃতবহুল গৌড়ীরীতি। এ রীতিকে বলেছেন তির্যকরীতি।

৩: জোরালো কথাকে ঘোরালো করে ফেলার অভ্যাসের কাছে তাঁর আত্মসমর্পণ কবুল করেছেন।

সেই সঙ্গে এই প্রবন্ধে তিনি আরও বলেছেন—

৪: যে ভাষা যথার্থই স্বকীয়—যার সাহায্যে নিজের কথা নিজের কাছে পৌঁছায়, তাতে সাধু সাহিত্যের কৃত্রিম শুদ্ধি অচল।' প্রাকৃত ভাষার প্রতি পক্ষপাত এখানে ব্যক্ত।

সুধীন্দ্রীয় গদ্য সম্পর্কে আরও একটি বক্তব্য—

৫: তিনি গদ্য পদ্যের নির্বিরোধ চেয়েছিলেন।

এক্ষেত্রে তিনি পথিকৃৎ নন। ঈশ্বর গুপ্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ, বিবেকান্দ, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী সাধু গদ্যের কৃত্রিম শুদ্ধি থেকে বাংলা গদ্যকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ঈশ্বর গুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ আর প্রমথ চৌধুরী গদ্য-পদ্যের অদ্বৈতচর্চার প্রয়াস করেছিলেন, যদিও তা সজ্ঞান পরীক্ষা-নিরীক্ষার

বিষয়ীভূত হয়নি। সজ্ঞান প্রয়াস করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। সুধীন্দ্রনাথ এই পথেই তাঁর চলবার সংকেত পেলেন। 'সংবর্ত' কাব্যের (১৯৫৩) ভূমিকায় তারই স্বীকৃতি : "বিশ বৎসর যাবৎ আমি যদিও জ্ঞানত গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধ চাই, তবু এখনও আমার সাধ ও সাধ্য মাঝে মাঝে পরস্পরের বাদ সাধে। ফলত ছন্দোরক্ষার খাতিরে অথবা মিলের গরজে সাধু ও প্রাকৃত ভাষার সংমিশ্রণ, নামধাতুর বাহুল্য, বিভক্তি-বিপর্যয়, ইত্যাদি বাংলাকাব্যের অনেক অভ্যাসদোষ একাধিক কবিতায় রয়ে গেল।"

সুধীন্দ্রনাথের গদ্যভাষার প্রকৃতিবিচারে এই ঘোষণা ও স্বীকৃতি স্মরণযোগ্য।

এলিঅট একদা বলেছিলেন, কবিরা স্বভাবত গদ্যের সুলেখক। তাঁর মতে, গদ্যরচনায় কবিদের সিদ্ধি তাঁদের বিচিত্রগামী প্রতিভাকে প্রমাণ করে না, বরং এই সত্যকেই প্রতিষ্ঠা করে যে শিল্পচর্চা প্রকারভেদের মুখাপেক্ষী নয়। কবি যখন গদ্যরচনায় প্রবৃত্ত হন, তখন স্বকীয় চিন্তাধারার সরলবাহন হিসাবে তিনি গদ্যকে গ্রহণ করেন না। তার মধ্যে কাব্যশোভন লাবণ্যের আবিষ্কারে যত্নশীল হন। এবং তা থেকেই প্রমাণ হয় যে গদ্যপদ্য আসলে একই উৎসজাত, গদ্যচর্চাও শিল্পচর্চা। এর প্রথম সফল প্রয়োগ লক্ষ্য করি শেকসপীঅরের সনেটে, তারপর পোপ, ডান, বার্নস, ওঅর্ডসওঅর্থ, হুইটম্যান, ডিকিনশন, এলিঅটের কবিতায়।

আজও ভারতীয় সমাজজীবনে বর্ণাশ্রম ধর্ম যেমন দৃঢ়ভিত্তিক, আমাদের সাহিত্য সমাজে গদ্য পদ্যের বর্ণাশ্রম তেমনি দুরপনেয় হয়ে আছে। কয়েকটি সুলভ ভ্রান্তি আজও আমাদের পরিচালিত করে। যেমন,—কবিতা বলতে সমিল কবিতার অনন্য সমাদর, শব্দ ব্যবহারের ও বিন্যাসসঙ্গতির প্রতি বিমুখতা, মাত্রাবিন্যাসই গদ্যপদ্যের পার্থক্য-সীমা বলে বিশ্বাস, গদ্য ও পদ্যের স্বতোবিরুদ্ধতায় আস্থা। এসবই ভ্রান্ত ধারণা।

'ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ' (১৯৩৩/'কুলায় ও কালপুরুষ') প্রবন্ধে সুধীন্দ্রনাথ গদ্যপদ্যের নির্বিরোধ সন্ধান করেছেন, দুয়ের অদ্বৈত শিল্পরূপে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন।

এলিঅট কাব্যে কথ্যরীতিকে যোগ্য মর্যাদা দিয়েছেন। কবিতায় গদ্যের ধর্ম ও কথ্যরীতির স্পন্দন রক্ষা করেছেন, এবং আমাদের মানতেই হয় কথ্যরীতি তাঁর কবিতার অবশ্যম্ভাবী লক্ষণ, এবং তা উন্নীত চৈতন্যেরই ভাষা। এলিঅটের কবিতার ভাষা আটপৌরে কথ্যভাষা নয়, তা কথ্যরীতির ভাষা, এবং গদ্য-পদ্যের

যোজক। কবির আত্মসংগ্রামেরই বাণীমূর্তি ; আত্মসংগ্রাম যত তীব্র হবে, কবিতা ততই কথ্যরীতির দিকে ঝুঁকবে, কবি-প্রসিদ্ধির কুসুমশয়ন ছেড়ে গদ্যেই কঠিনোজ্জ্বল ধর্মের মধ্যেই পাবে অন্বিষ্ট উৎসকে। এলিঅটের নিম্নধৃত কবিতায় কথ্যরীতির শিল্পরূপ লক্ষণীয়—

After such knowledge, what forgiveness ? Think now
History has many cunning passages, contrived corridors
And issues, deceives with whispering ambitions,
Guides by varities. ['Gerontion', T. S. Eliot.]

এই কবিতাংশে গদ্যের ধর্ম ও কথ্যরীতির স্পন্দন সুরক্ষিত। তার পরিচয় cunning passages, contrived corridors শব্দাবলীর অভিঘাত। (দ্রষ্টব্য দেবতোষ বসুর 'গদ্য-পদ্যের ঐতিহ্য ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত', সাহিত্যের খবর, বর্ষ ১০, সংখ্যা ৯)। এলিঅটের এই শিল্পোসাফল্য গদ্য-পদ্যের বিরোধ ও ভ্রান্ত ধারণার অপনোদনে সক্ষম হয়েছে।

'কুলায় ও কালপুরুষ' গ্রন্থভুক্ত 'ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ' এবং 'অদ্বৈতের অত্যাচার' প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে যেসব মূল্যবান মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত সুধীন্দ্রনাথ করেছিলেন, তা থেকেই তার নিজস্ব ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১. 'গদ্য-পদ্যের মধ্যে কোনও প্রকৃতিগত বিরোধ আমি আজ অবধি ধরতে পারিনি। বরং অনেক সময়ে ভেবেছি যে ওই দুই ধারার সঙ্গমই সাহিত্যতীর্থ নামে সুপরিচিত।' ('ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ'। ১৯৩৩।)

২. 'আমার বিবেচনায় প্রাত্যহিক জীবনে পদ্যের স্থান খুব নগণ্য নয়। কাজেই মুক্তচ্ছন্দেও পদ্যের প্রভাব প্রচুর। এমনকি আমরা এতদূর পর্যন্ত মানতে বাধ্য যে তাতে যে-গদ্য ব্যবহৃত, তা একেবারে সাংসারিক গদ্য নয়। কারণ কবিতার প্রসঙ্গ যতই সামান্য হক ; তার তলায় তলায় একটা অসাধারণ আবেগের উৎস থেকেই থাকে ; এবং আবেগজাত বাক্য যেহেতু উচ্ছ্রিত বাক্য, তাই মুক্তচ্ছন্দের ভাষাও গৃহকর্মের ভাষা নয়, মানুষের উন্নীত চৈতন্যের ভাষা।' (ঐ)।

এলিঅটের 'দি মিউজিক অব্ পোয়েট্রি' প্রবন্ধে (পৃ ৩১) এই বক্তব্যই সবিস্তারে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

৩. 'শব্দের অভিধাকে উড়িয়ে দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয় ; কিন্তু আমার মতে সাহিত্যের শব্দ অভিপ্রায়ের জন্য গৃহীত হয় না। গৃহীত হয় রূপের

তাগিদে; এবং সেখানে প্রত্যেক শব্দ এক একটি ধ্যান, তেমনই ধ্যান বলে' প্রত্যেক শব্দ স্বাধিকার গুণে আনন্দদায়ক।' ('অদ্বৈতের অত্যাচার', ১৯৩৪)।

এইসব মন্তব্য থেকে সুধীন্দ্রনাথের গদ্যপদ্যের অদ্বৈতচিন্তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গদ্যের শব্দ, অন্বয়, বিন্যাসপদ্ধতি বা চরিত্রলক্ষণ বলতে যা বোঝায় তা সুধীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছেন তাঁর কবিতায়। আবার পদ্যের সযত্নলালিত অনুষঙ্গ ও আবেদনও তাঁর গদ্যে সংরক্ষিত হয়েছে।

ভাবগত ছেদ ও বাগ্‌যন্ত্র নির্দেশিত ছেদ যে যথাক্রমে গদ্য ও পদ্যের মৌল বিচ্ছেদ লক্ষণ, ব্যাকরণের এই অনুশাসনে সুধীন্দ্রনাথের আদৌ আস্থা ছিল না। কবিতায় আটপৌরে শব্দ অবাধে ব্যবহার করেছেন, কথ্যরীতি কবিতার অম্বিষ্ট বলে মেনেছেন, অথচ অন্ত্যমিল, ছন্দের কঠিন বন্ধন, চিত্রকল্পরচনার শিল্পীমন্য তাগিদ প্রভৃতি কবিতার যাবতীয় নিয়ম ও শৃঙ্খলাকে মেনেছেন, এবং তা মেনেও স্বরচিত কবিতায় গদ্যের স্বভাবধর্ম সংরক্ষণ করেছেন, কখনো মনে করেন নি গদ্যের চরিত্রলক্ষণ সংহতিচর্চার বিপক্ষ, এবং কখনো গদ্য কবিতার স্বৈরাচারের হাতে আত্মসমর্পণ করেন নি।

তাঁর কবিতার সামান্য উদাহরণে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন—

কখনো ওঠে পাতাল ভেদ করে অসম্ভূত অমা।
বায়ুর বেগ সহসা যায় মরে দ্রাঘিমা দেয় ক্ষমা।

এখানে কথ্য বাগ্‌ধারা, মৌখিক আলাপের শব্দের সঙ্গে দুরূহ আভিধানিক শব্দের আত্মীয় বন্ধন নিবিড় হয়ে উঠেছে। 'মরে যাওয়া' বা 'ক্ষমা দেওয়া' সহজেই 'অসম্ভূত অমা' ও 'দ্রাঘিমা' শব্দের পাশাপাশি বসেছে। অথচ কবিতায় ধ্রুপদী সংহতি বা ভাবগাম্ভীর্য ক্ষুন্ন হয় নি। কবিতার যাবতীয় প্রসিদ্ধি, নিয়ম ও শৃঙ্খলাকে মেনেও এখানে গদ্যের স্বভাবধর্মকে তিনি রক্ষা করেছেন।

গদ্যপদ্যের নির্বিরোধের এই উজ্জ্বল কাব্য-উদাহরণ থেকে আমরা সুধীন্দ্রনাথের গদ্যক্ষেত্রে অনায়াসে উপনীত হই। তাঁর গদ্যরচনা কবিতার বিরোধী নয়। তাঁর গদ্য আধুনিক অর্থে কাব্যধর্মী। সংস্কারানুগ অর্থে সুধীন্দ্রনাথের গদ্য কাব্যধর্মী নয়; তাঁর প্রবন্ধ বক্তব্যের উপস্থাপনামাত্র নয়, বরং একটি শিল্পসমর্থ প্রতিবেশসৃষ্টি। গদ্যের প্রধান চারিত্র্য লক্ষণ—মনন ও যুক্তিনিষ্ঠা—তিনি কখনো বর্জন করেন নি, তত্রাচ, তাঁর গদ্য তাঁর কাব্যের মতোই বিশিষ্ট অনুশীলন, সচেতন শিল্পচর্চা।

একটি উদাহরণেই তা প্রমাণিত হয়।

"স্বপ্নাদ্য প্রতীকের মতোই উৎকৃষ্ট কবিতার চিত্রকল্প দ্বন্দ্বসমাসের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য; এবং সাধ থাকলেও, সাধ্যের অভাববশত আমি-সে-রকমের রচনায় অপারগ বটে, কিন্তু বাংলাভাষার সঙ্গে আমার পরিচয় যেহেতু জন্মগত, তাই উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার শিখতে আমাকে শেকসপীঅরের কাছে ছুটতে হয় না। এদেশের ঝাঁ ঝাঁ রোদেই আমি চোখ কানের ঝগড়া মেটাই। তবে মহাকবিরা জানেন যে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনেক সময়ে স্বকীয় বিশ্ববীক্ষার সর্বনাশ সাধে; এবং সাহিত্য শুধু বিষয়-বিষয়ীর সঙ্কেত নয়, রসসামগ্রীর মায়ামুকুরে দর্শক আবার বহুরূপী।" (মুখবন্ধ, কুলায় ও কালপুরুষ। ১৯৫৭)।

সুধীন্দ্রনাথ গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধ সাধনে কথ্যরীতিকে আশ্রয় করেছিলেন, তার ফলে তাঁর রচনায় আটপৌরে শব্দ, ক্রিয়াপদ ও ইডিয়মের প্রয়োগ অনায়াসলক্ষণীয়: 'ঝাঁ ঝাঁ রোদ', ,চোখকানের ঝগড়া মেটাই', 'সর্বনাশ সাধে', 'শেক্সপীয়রের কাছে ছুট্‌তে হয় না'। গুরু তৎসম শব্দের পাশে এগুলি নিপুণভাবে খাপ খেয়ে গেছে।

শব্দপ্রয়োগ নৈপুণ্যের বিস্ময়কর উদাহরণ 'দ্বন্দ্বসমাস' শব্দটি। পরিচিত বৈয়াকরণিক আবেষ্টনী থেকে সরে এসে এই শব্দটি রসসৃষ্টির উপাদান হয়ে উঠেছে। এই শব্দটি কবিতাতেও ব্যবহার করে সুধীন্দ্রনাথ গদ্য-পদ্যের নিবিড় আত্মীয়তাই স্পষ্ট করে তুলতে চেয়েছেন—

> অবশ্য বুঝেছি আজ এ সিদ্ধান্ত নিতান্তই মেকী;
> কারণ অন্বয়ব্যতিরেকী
> সত্যমিথ্যা, ভালোমন্দ, সুন্দর-কুৎসিত
> এবং সে নিত্যবিপরীত
> দ্বন্দ্বসমাসের সঙ্গে তুলনীয় মেরুবিপর্যয়
> বিকল্প স্বভাবক্ষেত্রে।

কাব্যাস্বাদনের সমস্ত পূর্বার্জিত সংস্কার বর্জনের পরই আমরা এই কবিতাংশের রসাস্বাদন করতে পারি।

কথ্যরীতি-আশ্রয়, গদ্যপদ্যে নির্বিরোধ প্রয়াস, তির্যকরীতির প্রাধান্য, শব্দ নির্বাচন ও নির্মাণে সংস্কারমুক্তি, স্বল্পতম শব্দে অধিকতম বক্তব্য পরিবেশনের ধ্রুপদী সংহতি-নৈপুণ্য, পরিমিতিবোধ ও যাথার্থ্য: সুধীন্দ্র-গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্য। বাংলা ইডিয়ম ('মৌরসী পাট্টা') ও তদ্ভব ক্রিয়াপদ ('চায়, পায়,

যোগায়') গুরু সংস্কৃত শব্দবন্ধের ('অধুনাতনী অবস্থা, প্রতিযোগী মানসিক প্রক্রিয়া') পাশে প্রয়োগনৈপুণ্যে খাপ খেয়ে গেছে নিম্নধৃত বাক্যে—

"অর্থাৎ সভ্যতার অধুনাতনী অবস্থায় বাক্য বস্তুর প্রতিযোগী : সমাজজীবনে উভয়ে মৌরসী পাট্টা চায় ও পায় , এবং উভয়ে ধ্যান তথা অপরাপর মানসিক প্রক্রিয়ার উপলক্ষ যোগায়।" (অদ্বৈতের অত্যাচার। কুলায় ও কালপুরুষ)।

'অর্থাৎ'-যোগে বাক্যের সূচনা, 'এবং'-যোগে দুটি বাক্যের গ্রন্থন সুধীন্দ্র-গদ্যে অবিরল। যেমন, একই গ্রন্থভুক্ত 'উদয়াস্ত' প্রবন্ধ।

আপন গদ্যরচনা সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথের একটি উক্তি পুনঃস্মর্তব্য : শত চেষ্টায় বর্তমান লেখাগুলোর একটাকেও আমি ইংরেজী অনুবাদের ছকে ফেলতে পারি নি।" (পুনশ্চ, স্বগত)। কদাচ ইংরেজি শব্দ তিনি প্রবন্ধে ব্যবহার করতেন না বলে তাঁর সমস্ত গদ্যরচনা এক অর্থে ভাষান্তরণ। শব্দ ও বাক্যাংশ নির্মাণে ও অভিনব প্রয়োগে তাঁর দক্ষতা অসাধারণ। যেমন, 'ট্যুটনী মন' (কুলায় ও কালপুরুষ। পৃ ১০৭), 'দুগ্ধপোষ্য শব্দ' 'প্রাপ্তবয়স্ক শব্দ' (স্বগত। ২য় সং। পৃ ৩১), 'অগ্রণী শোভন', 'রূপকারী বিবেক', সংস্কারসাধ্য দোষ', 'বিধিবদ্ধ মৌলিকতা', প্রথাসিদ্ধ ভাবালুতা', 'রবীন্দ্রনাথের লোকপ্রসিদ্ধ তিরস্কার' (স্বগত। পৃ ২০১)। 'কায়মনোবাক্যের অবৈকল্য ব্যতিরেক' (স্বগত। পৃ ২০২)। 'সমালোচনা বন্দনার সপত্নী', 'আমার কাব্যজিজ্ঞাসা আপাতত দেহাত্মবাদী' (স্বগত। পৃ ১৪), 'ঘনিষ্ঠতাজাত বিতৃষ্ণা' (কুলায় ও কালপুরুষ। পৃঃ ৮১), 'শুনেছি বাংলা উপন্যাসের প্রধান পৃষ্ঠপোষক প্রাকচল্লিশ ডেলিপ্যাসেঞ্জার আর উত্তর-চল্লিশ পৌরস্ত্রী' (কুলায় ও কালপুরুষ। পৃঃ ৮৫)।

শব্দ নির্মাণে সুধীন্দ্রনাথের নৈপুণ্য তর্কাতীত। 'সাহিত্যের শব্দ অভিপ্রায়ের জন্য গৃহীত হয় না, গৃহীত হয় রূপের তাগিদে ; এবং সেখানে যেমন প্রত্যেক শব্দ এক একটি ধ্যান, তেমনই ধ্যান বলে প্রত্যেক শব্দ স্বাধিকার গুণে আনন্দদায়ক।' (অদ্বৈতের অত্যাচার)। এই মন্তব্য মনে রেখে সুধীন্দ্রনাথের তৈরি পারিভাষিক শব্দের কিছু উদাহরণ নিই।

নৈরাত্মসিদ্ধি—negative capability ; প্রাতিস্বিক—individual ; বিপ্রলাপিত—confused ; নৈরাত্ম কাব্য—objective poetry ; প্রতিভাস—illusion ; অনুকম্পা—sympathy ; বহিরাশ্রয়—objective ; অন্তরাশ্রয়—subjective ; ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য—character ; ব্যক্তিস্বরূপ—personality ; sensible—আশুচেতন ; sensitive—আশুবেদন ;

perceptivity—দৃক্‌শক্তি ; superficial—পল্লবগ্রাহী ; one who knows contemporari affairs—সম্প্রতিবিদ্‌ ; classical—ধ্রুপদী ।

সুধীন্দ্রনাথের গদ্য বাংলা গদ্যের স্রোতোধারা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং সংস্কৃত ও প্রাকৃত বাংলার অনুগামী। তার গদ্য দুর্বোধ্য নয়, দুরূহ। এই গদ্য আত্মমগ্ন ব্যক্তিস্বভাবের পরাকাষ্ঠা নয়, সংশিল্পীর নির্লিপ্ত স্বগতোক্তির পরিবাহক। বাংলা গদ্যচর্চায় সুধীন্দ্রনাথ একটি উজ্জ্বল অধ্যায় ॥

---

*এই প্রবন্ধ রচনায় বর্তমান লেখকের 'বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাসে'র উপর নির্ভর করা হয়েছে।

নিরঞ্জন হালদার

সুধীন্দ্রনাথ

"A great writer's errors rescue him from oblivion by first whetting the critical faculty of detractors and then leading them to his ultimate virtues."—Sudhindranath Datta in "Hugo and others." (Quest, July-September, 1960).

ভিক্টর হুগোর ৭৫-তম মৃত্যুবার্ষিকীতে ফরাসী কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যে-কথা বলেছিলেন, আশ্চর্যের বিষয় সুধীন্দ্রনাথের নিজের সম্পর্কেও সে-কথা প্রযোজ্য। কোনও মহৎ লেখকের ত্রুটিগুলিই তাঁকে বিস্মৃতির অতল থেকে পুরোভাগে নিয়ে আসে। কুৎসা রটনাকারীদের অপপ্রচার শেষ পর্যন্ত লেখকের রচনার অন্তর্নিহিত গুণাবলীর দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। সুধীন্দ্রনাথের কবিতা ও গদ্য রচনা দুর্বোধ্যতার অপবাদে নিন্দিত। সেজন্য হয়তো তাঁর নাম মাঝে মাঝে জনপ্রিয় বা বহুপঠিত বাংলা কবিদের তালিকায় থাকে না। দুর্বোধ্য কবি বলে তাঁকে নস্যাৎ করারও চেষ্টা হয়। কিন্তু তাঁর কবিতার অন্তর্নিহিত শক্তি ও প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সচেতন পাঠককে আকৃষ্ট করে। বাংলা কবিতা ও প্রবন্ধ সাহিত্যে তাঁর অবদান এতই বিশিষ্ট যে, বাংলা সাহিত্যের কোনও অবগাহী পাঠকের পক্ষে তাঁকে অবহেলা করা অসম্ভব।

সুধীন্দ্রনাথের রচনার দুর্বোধ্যতার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন,—"সুধীন্দ্রনাথের কবিতা দুর্বোধ্য নয়, দুরূহ এবং সেই দুরূহতা অতিক্রম করা অল্পমাত্র আয়াস-সাপেক্ষ। অনেক নতুন শব্দ বা বাংলায় অপ্রচলিত শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন : তাঁর কবিতার অনুধাবনে এই হল বিঘ্ন। বলা বাহুল্য, অভিধানের সাহায্য নিলে এই বিঘ্নের পরাভবে বিলম্ব হয় না। এবং অভিধান দেখার পরিশ্রমটুকু বহুগুণে পুরস্কৃত হয়, যখন আমরা পুলকিত হয়ে আবিষ্কার করি যে, আমাদের অজানা শব্দ সমূহের প্রয়োগ একেবারে নির্ভুল বা যথার্থ হয়েছে, পরিবর্তে অন্য কোনো শব্দ সেখানে ভাবাই

যায় না। সুধীন্দ্রনাথের কবিতার গঠন এমন যুক্তিনিষ্ঠ, এমন সুমিত তাঁর বাক্যবিন্যাস, পঙক্তিসমূহের পারম্পর্য এমন নির্বিকার এবং শব্দ প্রয়োগ এমন যথার্থ, যে মাঝে মাঝে দুরূহ শব্দ ব্যবহার না করলে, তাঁর কবিতা হ'তো না অমন সুমিত ও যুক্তিসহ, অমন ঘন ও সুশৃঙ্খল—অর্থাৎ তাঁর চরিত্রই প্রকাশ পেতো না।" (সুধীন্দ্রনাথের কাব্যসংগ্রহ-এর ভূমিকা। পৃঃ ১৩।) বুদ্ধদেব বসুর লেখা পড়ে মনে হতে পারে, সুধীন্দ্রনাথের কবিতার আপাত দুর্বোধ্যতা কেবল অপরিচিত বা অজানা শব্দের জন্য। কিন্তু কেবল শব্দের মানে জানার উপর কবিতার অর্থ বোঝা নির্ভর করে না। "অর্কেস্ট্রা" তো বটেই, "সংবর্ত-এর কোন কোন কবিতা কিংবা "দশমী" বা "প্রতিধ্বনি"র অজস্র কবিতায় অনেক পাঠক একটাও দুরূহ শব্দ খুঁজে পাবেন না। অথচ সুধীন্দ্রনাথের কবিতামাত্রই নাকি শব্দের জন্যই দুর্বোধ্য। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় অপরিচিত শব্দের সংখ্যা খুবই সীমিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও, পাঠকের নিকট জীবনানন্দ দাশের কবিতার অর্থ উদ্ধারের জন্য বুদ্ধদেব বসুকেও দীর্ঘকাল কলম ধরতে হয়েছিল। অনেকে মনে করেন, সুধীন্দ্রনাথ ধ্বনি মাধুর্যের কথা ভেবেই শব্দ চয়ন করেছেন। এই অভিযোগ সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, "যে শব্দ কোনও ভাষার অন্তর্গত নয়, যে-শব্দ নিরর্থ ধ্বনির সাহায্যে আবেগ জাগায়, কাব্যের চেয়ে মন্ত্রেই তার প্রয়োগ প্রশস্ত। লেখক ও পাঠকের মধ্যে অনুকম্পার সেতুবন্ধই যদি কাব্যের উদ্দেশ্য হয়, তবে কাব্যের শব্দ চিরদিনই অভিধানের মুখাপেক্ষী থাকবে। (কাব্যের মুক্তি। স্বগত। পৃঃ ৩১)। কিন্তু শব্দ কেবল আভিধানিক অর্থেই শব্দ নয়। শব্দ কোনও কিছুর প্রতীকও বটে। অবশ্য সুধীন্দ্রনাথের মতে, কাব্যে ও গদ্যে শব্দের ব্যবহার এক নয়।…"গদ্য চলে যুক্তির সঙ্গে পা মিলিয়ে; আর কাব্য নাচে ভাবের তালে তালে, গদ্য চায় আমাদের স্বীকৃতি; আর কাব্য খোঁজে আমাদের নিষ্ঠা। রেখার পর রেখা টেনে পরিশ্রান্ত গদ্য যে ছবি আঁকে গোটা কয়েক বিন্দুর বিন্যাসে কাব্যের যাদু সেই ছবিকেই ফুটিয়ে তোলে আমাদের অনুকম্পার পটে। কাব্যের এই মরমী ব্রতে সিদ্ধি আসে প্রতীকের সাহায্যে। শব্দ মাত্রেই দুটো দিক আছে। একটা তার অর্থের দিক, অন্যটি তার রস প্রতিপত্তির দিক। গদ্যের সঙ্গে শব্দের সম্পর্ক ওই প্রথম দিকটার খাতিরে; গদ্যের শব্দগুলো চিন্তার আধার। কিন্তু কাব্যের শব্দ শরণ নেয় ওই দ্বিতীয় গুণের লোভে, কাব্যের শব্দ আবেগবাহী।" (কাব্যের মুক্তি। স্বগত। পৃঃ ২৯)। কিন্তু কাব্যে যে-শব্দ প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত, পরপর শব্দ সাজিয়ে

যে চিত্রকল্প রচিত, তা সব পাঠকের চোখে ধরা পড়ার কথা নয়, পড়েও না। কবি ও পাঠক প্রায় একই ধরণের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে না গেলে কোনও প্রতীক বা চিত্রকল্প পাঠকের চোখে ধরা না পড়াই স্বাভাবিক। অবশ্য এই অভিজ্ঞতা সব সময়ে বাস্তব-অভিজ্ঞতা ভিত্তিক হতে হবে এমন কোন কথা নেই। কোলরিজের "এনসিয়েণ্ট মেরিনার" কবিতা উপলব্ধির জন্য আমাদের সমুদ্রে যাওয়ার দরকার হয় না, কোলরিজ আমাদের যে-জগতে নিয়ে যেতে চান তাঁর সঙ্গে সেই জগতে যেতে রাজী থাকাই যথেষ্ট। এক্ষেত্রে কোলরিজের ভাষাতেই স্বেচ্ছায় অবিশ্বাসকে দূরে সরিয়ে রাখলেই চলে।

স্বধীন্দ্রনাথ ছিলেন ভিন্ন মেজাজের কবি। তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, মানসিক পরিমণ্ডল, চর্চা ও চর্যা আর সব বাঙালী কবি থেকেই ভিন্ন। এজন্য কিন্তু তাঁকে কল্লোল-যুগের লেখকদের মতো রবীন্দ্র-বিদ্রোহের পতাকা তুলে ধরতে হয়নি। এটা তাঁর কাছে স্বাভাবিক মনে হয়েছে। তিনি নিজেই লিখেছেন, "বাঙালী কবি যদি গতানুগতিকতার অপবাদ খণ্ডাতে চায়, তবে রবীন্দ্রনাথের আওতা থেকে খোলা জল-হাওয়ায় বেরিয়ে এসে তাকে দেখাতে হবে যে তিনি বাংলাদেশে বৃথাই জন্মাননি, জন্মে স্বজাতিকে স্বাবলম্বন শিখিয়েছেন।···রাবীন্দ্রিক গন্ধ ছন্দে পয়ার, ত্রিপদী একাবলীর উপযুক্ত মধুর মনোভাব ব্যক্ত করেই আধুনিক বাঙালী কবির রক্ষা নাই, যুগধর্মে দীক্ষা গ্রহণ তার অবশ্য কর্তব্য।" (ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ। কুলায় ও কালপুরুষ। পৃঃ ৪৭)। কেবল বক্তব্য নয়, রবীন্দ্রনাথের পরে লিখতে আরম্ভ করায় শব্দচয়ন, চিত্রকল্প ও ব্যঞ্জনার দিকে বিশেষ সতর্ক থাকতে হয়েছে। অন্যত্র "মালার্মে প্রবর্তিত কাব্যাদর্শ" স্বধীন্দ্রনাথের অন্বিষ্ট হলেও, "কাব্যের আনন্দময় স্বরূপ সম্বন্ধে" রবীন্দ্রনাথই ছিলেন তাঁর "অদ্বিতীয় গুরু।" (দিনান্ত। কুলায় ও কালপুরুষ। পৃঃ ৭৩)। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে থেকেও অমিয় চক্রবর্তী ভিন্ন অর্থে আধুনিক। জীবনানন্দ দাশ, কাজী নজরুল ইসলাম ও মোহিতলাল মজুমদার সরাসরি বিদ্রোহের পতাকা না তুললেও তাঁদের কবিতা রবীন্দ্রনাথ থেকে কত ভিন্ন!

স্বধীন্দ্রনাথ নিজেই এক জায়গায় বলেছেন যে, তিনি স্ব-ইচ্ছায় বাংলা সাহিত্যের অঙ্গণে প্রবেশ করেন। তাঁর বাবা তাঁকে এটর্নী করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি আইন বা এটর্নিশিপ-কোনও পরীক্ষাই দেননি। তারও আগে ক্লাসে অধ্যাপক প্রফুল্ল ঘোষের সঙ্গে তর্কাতর্কি হওয়ায় ইংরেজীতে এম. এ.

পড়াও ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু কী লিখবেন, এ-প্রশ্ন তাঁকে কম আলোড়িত করেনি। এ বিষয়ে তিনি লিখেছেন,—"মানব চৈতন্যের ধারা না বদ্‌লাক, তার জটিলতা নিরন্তর বাড়ছে; এবং ফলে আজকালকার সমাজ শুধু শ্রম-বিভাগে বাধ্য নয়, এমন কি এণ্টোপির প্রক্রিয়ায় পুরাতন স্থৈর্যটুকু এখন অচিন্ত্য। সুতরাং শেকসপীয়রের যুগ দূরের কথা, টেনিসন-এর আমলেও দেশভক্তি, প্রেম, ঈর্ষা, দণ্ড ইত্যাদি নির্বিশেষ বিষয়ে যত সহজে কবিতা লেখা যেত, সাম্প্রতিকদের কলম আর তত অনায়াসে চলে না; এবং সাবেকী বিলাসবস্তু ইদানীং যেমন নিত্যব্যবহার্য আসবাবের কোঠায় নেমেছে, তেমনই প্রাচীন কাব্যের মুখ্য্ উপজীব্য আবেশ আর কারও মুখে রোচে না, পাঠকমাত্রেই খোঁজে অনুভূতির বৈচিত্র্য।" (শিল্প ও স্বাধীনতা। কুলায় ও কালপুরুষ। পৃঃ ১২৯)। আধুনিক জীবনে অনুভূতি ক্ষণভঙ্গুর হলেও, এই অনুভূতিই সুধীন্দ্রনাথের কবিতার প্রধান উপজীব্য বিষয়। আর এই অনুভূতি তিনি খুঁজেছেন সমসাময়িক জীবনযাত্রার মধ্যে। কারণ তাঁর মতে, "সৎসাহিত্যের মায়ামুকুরে অ্যারিস্টটলও ম্যাথু অর্নল্ড-এর মতো সমসাময়িক জীবনযাত্রার প্রতিবিম্ব দেখেন।" (ঐ, পৃঃ ১২৬)।

সুধীন্দ্রনাথের কবিতার তথাকথিত দুর্বোধ্যতা শব্দের অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞতার জন্য ততটা নয়। সমসাময়িক যুগের যে-বিরাট ক্যানভ্যাসের উপর সুধীন্দ্রনাথ কাব্য রচনা করেছেন, তা অনুধাবন করা অনেকের পক্ষেই কঠিন। এটা আরও কঠিন হয় এইজন্য যে, প্রতীক ব্যবহারের জন্য তিনি মাঝে মাঝে সংস্কৃত সাহিত্যের অফুরন্ত ভাণ্ডারে প্রবেশ করেছেন। এবং এই জাতীয় কবিতা পড়বার সময় ভাষার দিক থেকে তাঁকে মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাছাকাছি মনে হয়। ক্রন্দসীর "বর্ষপঞ্চক" কবিতা বা সংবর্তের নিম্নে উদ্ধৃত অংশটি এই প্রসঙ্গে তুলনীয়:

অশক্য পিতা; বলীর কণ্ঠলগ্ন
মাতা বসুমতী ব্যভিচারে আজ মগ্ন;
ক্ষাত্র শোণিত অবগাহি, জামদগ্ন্য
তবু পাতিবে না স্বর্গরাজ্য ভবে।
স্বীয় শক্তিতে হবে যোগ দিতে
শুদ্ধির তাণ্ডবে। (নান্দীমুখ, সংবর্ত)

একটাও দুরূহ শব্দ নেই, এমন কিছু কবিতার অংশ উদ্ধৃত করা যাক।

আমগ্ন তরণী ছেড়ে ঝাঁপাতে পারিনা তবু জলে।
বিফল কৌশলে
ভাঙ্গা হাল ধরে থাকি ; ছেঁড়া পাল সযত্নে খাটাই ;
লুপ্ত প্রায় মানচিত্রে চাই।
ভুলে যাই একা আমি ; সঙ্গে ছিল যারা,
প্রলুব্ধ বন্দরে কিংবা পথকষ্টে আজ আত্মহারা,
কে কোথায় পড়ে আছে, জানিনা ঠিকানা।

অথবা, তবু তার গভীর মায়ায়
পারিনি তলিয়ে যেতে, কৃষ্ণপক্ষ চোখের ছায়ায়,
সিন্ধুর উষর জ্বালা চাইনি জুড়োতে।
বিপরীত স্রোতে
সর্বনাশ নিশ্চিত জেনেও,
ভুলিনি শান্তির চেয়ে স্বধর্মই শ্রেয়। (জেসন, সংবর্ত)।

কিংবা, সহেনা সহেনা
আর দিনগত পাপের স্খালনে নিত্য অনুতাপ ;
বদ্ধমুষ্টি পৃথিবীর উচ্ছিষ্ট কুড়ায়ে সধর্মার
সঙ্গে বিপ্রলাপ ; গোঠে বা শিকারে উদয়াস্ত বৃথা
কায়ক্লেশ ; বুভুক্ষু প্রদোষে ফেরা পৈতৃক কায়ায় ;
মিটাতে বংশের দাবি মধ্যরাত্রে অভ্যস্ত আশ্লেষ ;
(পথ, প্রাক্তনী)

এই ধরণের আর্তির সাক্ষাৎ মিলবে অন্যত্রও

সত্য কেবল বাঁচা, কেবল বাঁচা
সত্য কেবল পশুর মতো মনের বালাই ঝেড়ে বাঁচা,
বাঁচা, কেবল বাঁচা। (বিরাম, ক্রন্দসী)।

এরই পাশে তীব্র অনুভূতিসম্পন্ন "অর্কেস্ট্রা"র কবিতাগুলিও স্মরণ করা যেতে পারে :

চাই, চাই, আজও চাই তোমারে কেবলই।
আজও বলি,
জনশূন্যতার কানে কানে রুদ্ধ কণ্ঠে বলি, আজও বলি—
অভাবে তোমার
অসহ্য অধুনা মোর, ভবিষ্যৎ বদ্ধ অন্ধকার,
কাম্য শুধু স্থবির মরণ। (নাম, অর্কেস্ট্রা)।

অথবা,   অসম্ভব, প্রিয়তমে, অসম্ভব শাশ্বত স্মরণ ;
অসঙ্গত চিরপ্রেম ; সংবরণ অসাধ্য, অন্যায় ;
বন্ধ্যার অন্ধকারে প্রেতের সন্তপ্ত সঞ্চরণ
সাঙ্গ করে ভাগীরথী অকস্মাৎ বসন্ত বন্যায় ॥

(মহাসত্য, অর্কেস্ট্রা)।

অর্কেস্ট্রায় প্রেম উপজীব্য। কিন্তু সে প্রেমের প্রকাশের ধরণ কত স্বতন্ত্র! ক্রন্দসীতে বিশ্ব সংসারের সকল প্রসঙ্গ এসে পড়েছে। আর সংবর্তে বিশ্বসমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে মানবসমাজের প্রতি নিজের বিশ্বাস ব্যক্ত হয়েছে। আবার এও মনে হয়; তিনি অন্য গ্রহ থেকে নির্লিপ্তভাবে পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যা অবলোকন করেছেন। "সংবর্ত" ও "১৯৪৫" কবিতা দুটি পড়বার সময় আমরা পাঠকেরাও একবার কবির সঙ্গে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন ঘটনা দেখতে পাই। যাঁরা ওই কবিতা দুটির বিরাট ক্যানভ্যাসের কথা ভাবতে পারেন না বা জানেন না এবং ইতিহাস সম্পর্কে যাঁদের জ্ঞান খুবই সামান্য, তাঁরা নীচের কয় লাইন থেকে কোন্ অর্থ উদ্ধার করবেন ?

"রুষের রহস্যে লুপ্ত লেনিনের মামি,
হাতুড়ি নিষ্পিষ্ট ট্রট্স্কি, হিটলারের সুহৃদ স্টালিন
মৃত স্পেন, ম্রিয়মান চীন
কবন্ধ ফরাসীদেশ। সে এখনও বেঁচে আছে কিনা,
তা সুদ্ধ জানি না ॥ (সংবর্ত)।

সমকালীন ঘটনা নিয়ে এই বাংলা ভাষাতেও কবিতা লেখার নজীর কম নেই। তবে, ওই সব কবিরাও সুধীন্দ্রনাথের কবিতার গভীরতায় প্রবেশ করতে অসমর্থ। সুধীন্দ্রনাথের মতো অতটা না হলেও জীবনানন্দ দাশও ইতিহাস সচেতন, সময়ের প্রভাব তিনিও এড়াতে পারেননি। কিন্তু দুজনের মধ্যে এর বেশী মিল নেই। সুধীন্দ্রনাথ সমকালীন সমাজে মানুষের আশা-নিরাশা-দুর্ভাবনা, আর্তি, নিঃসঙ্গতা সহজভাবে প্রকাশ করেছেন আর জীবনানন্দ দাশ এই ক্লান্ত পৃথিবী থেকে আশ্রয় খুঁজেছেন এক স্বপ্নের জগতে, রূপসী বাংলায়। অমিয় চক্রবর্তীর বাংলাও স্বপ্ন জড়ানো একটা দেশ, কোনো মানচিত্রে তা খুঁজে পাওয়া যাবে না।

॥ ২ ॥

কবিতার তুলনায় সুধীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের সংখ্যা অনেক কম। অসমাপ্ত আত্মজীবনী ধরলেও ইংরেজী রচনার সংখ্যাও অবিশ্বাস্যরকম কম। মনে হয়, সুধীন্দ্রনাথ লেখার ব্যাপারে তার প্রিয় লেখকদেরই অনুসরণ করেছেন। তিনি বলেছেন, "আমি যে লেখকদের অনুরাগী, তাঁরা যেমন স্বল্পসংখ্যক, তাঁদের গ্রন্থাবলী তেমনই নাতিবহুল" (স্বগত। পৃঃ ১০৭)। সুধীন্দ্রনাথের গদ্য পড়তে গিয়ে অনেকেই স্বগত-এর শেষ প্রবন্ধ, কুলায় ও কালপুরুষ-এর কোনও কোনও প্রবন্ধে এবং কাব্যগ্রন্থের ভূমিকাগুলিতে হোঁচট খান। বক্তব্যের গুরুভার অনুসারে অনেক জায়গায় ভাষাও দুরূহ। সুধীন্দ্রনাথ বিষয়বস্তু অনুসারে প্রবন্ধে বিভিন্ন ধরণের ভাষা ব্যবহার করেছেন। স্বগত-এর বেশীর ভাগ প্রবন্ধ এবং কুলায় ও কালপুরুষের কিছু প্রবন্ধের মধ্যে ভাষার পার্থক্য কম নয়। তাঁর প্রবন্ধগুলিতে যুক্তি নির্ভরতা ও চিন্তার ঠাসবুনুনি দেখলে অবাক হতে হয়। সুধীন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্য কোনও একটি বিশেষ বিষয়ে সীমাবদ্ধ ছিল না। সাহিত্য, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিল অপরিসীম। এমন কী, কোয়ানটাম ফিজিক্স ও পারমাণবিক বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিজ্ঞানীর অবদান সম্পর্কে তাঁর মোটামুটি ধারণা ছিল। বহু বিষয়ে পাণ্ডিত্যের জন্য এক ইংরেজ ঔপন্যাসিক সম্পর্কে লিখতে গিয়েও তিনি ওয়াটসন, প্যাভলভ প্রমুখ আচরণবাদীদের বক্তব্যের সঙ্গে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের পার্থক্যের বিষয় টেনেছেন। তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করা বিষয় ও পটভূমি সম্পর্কে পূর্ব ধারণা না থাকলে সুধীন্দ্রনাথের রচনা দুর্বোধ্য মনে হওয়া অসম্ভব নয়। কুলায় ও কালপুরুষ-এর "উদয়াস্ত" প্রবন্ধটির কথাই ধরা যাক। ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের দার্শনিক অবদান আলোচনা করতে গিয়ে শীল মহাশয়কে "সক্রেটিশ বংশের শেষ কুলপ্রদীপ" আখ্যা দিয়েও তিনি রায় দিলেন: "দর্শনে শীলের অবদান প্রায় নাস্তির কাছাকাছি।" কিন্তু সেখানেই তিনি থামেননি, ডঃ রাধাকৃষ্ণণ, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত সমেত ভারতীয় দর্শনের ধ্বজাধারীদের সম্পর্কেও মন্তব্য করতে ছাড়েননি। যেমন, "এ জনরব একেবারে অমূলক নয় যে, অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণের মতো বিদ্বানও দার্শনিক নন, দর্শনের ঐতিহাসিকমাত্র, এবং প্রসাদগুণ অবশ্য স্বীকার্য বটে, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

মহাশয়ের বিরাট পাণ্ডিত্য সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের মূল বক্তব্যটুকুও বাংলায় বিশদ করতে পারেননি।" আবার "ঈশোপনিষদ আওড়াতে আওড়াতে কামিনী কাঞ্চনের ধ্যান কখনও আমাদের বিবেকে বাধবে না এবং সেইজন্য দিনের পর দিন গলার আওয়াজ চড়াতে চড়াতে আমরা অম্লান বদনে রটাতে পারব যে, প্রাচ্যের সর্বময় সত্ত্বগুণ তামসিক পাশ্চাত্যের স্বপ্নাতীত। হাজার বছরের নিরন্তর দুর্দশাও যেহেতু আমাদের শেখায়নি যে উপায় ও উদ্দেশ্যের সমীকরণ ভিন্ন সুস্থ সংসারযাত্রা অসম্ভব ; তাই ভারতীয় মনীষীদের জানিয়ে লাভ নেই যে পশ্চিম অধঃপাতে গেলে পূর্বের পুনরুত্থান অনিবার্য নয়, বরঞ্চ মানব সভ্যতার সমূহ বিপদ। (কুলায় ও কালপুরুষ। পৃঃ ২০৩-৪)। তীব্র শ্লেষ ও ব্যঙ্গ-মিশ্রিত এই ভাষা আদৌ দুরূহ নয়। তবে, যাঁরা ডঃ রাধাকৃষ্ণণ বা সুরেন্দ্র দাশগুপ্তের নামটুকুই শুনেছেন, ভারতীয় দর্শনের প্রবক্তাদের ভণ্ডামীর সঙ্গে পরিচিত নন, তাঁরা এ প্রবন্ধ পড়ে কোনও মজা পাবেন না।

সুধীন্দ্রনাথের রচনার আর কয়েকটি নমুনা উদ্ধৃত করা যাক্।

"আধুনিক মনোবিজ্ঞানে যাদের আস্থা আছে, তারাই লরেন্স-এর দেহবাদ সমর্থন করবেন। কিন্তু ওয়াটসন, প্যাভলভ ইত্যাদিকে উদভ্রান্ত লাগলেও লরেন্স আমাদের প্রণম্য। সংসার দেহপ্রধান হোক, আর আত্মপ্রধান হোক, দুই নৌকোয় পা রেখে জীবন নদী পেরোনো সকলের মতেই অসম্ভব এবং এ সত্যকে আমরা যদিও বুদ্ধি দিয়ে মানি, তবু কার্যত একাগ্র-নিষ্ঠা আজ আমাদের উপহাস জাগায়। যাঁরা শতমুখ, সহস্রাক্ষ, তাঁরা বর্তমানকালের প্রবক্তা, এবং এই নৈরাজ্যের যুগে; এই বিক্ষোভের মধ্যে অখণ্ডতা ও অবৈকল্য সম্বন্ধে সতর্ক থাকা এত বড় কথা যে, লরেন্স-এর দেহবাদে আমরা কান না পাতি, তাঁর দিব্যদৃষ্টির গুণ গাইতে আমরা বাধ্য। তবে অবৈকল্যের আদর্শ শুধু জীবনে অবশ্য গ্রাহ্য নয়, সাহিত্যেও সেই ধর্মে প্রতিষ্ঠিত ; এবং যেখানে বক্তব্য আর উক্তি দ্বিধাবিভক্ত, সেখানে সাহিত্যসৃষ্টি তো অসম্পূর্ণ বটেই, এমনকি বক্তৃতাই অচল।" (ডি-এইচ-লরেন্স ও ভার্জিনিয়া উলফ। স্বগত। পৃঃ ৬২)।

আবার, "যাঁদের চোখে সোভিয়েট শাসন রাষ্ট্রডায়ালেক্টিকের চরম ও পরম সমন্বয়, তাঁরা নিশ্চয়ই আমাকে ধমকে বলবেন যে ম্যাকসিম গর্কি শুধু বৃদ্ধ বয়সে নৈর্ব্যক্তিক সমাজব্যবস্থার গুণ-গাননি, ১৯০৫ সনের সশস্ত্র রাজদ্রোহেও তিনি সর্বান্তঃকরণে যোগ দিয়েছিলেন। তথাচ তাঁকে হিংসাব্রত বোলশেভিকদের সমপাংক্তেয় ভাবা আমার পক্ষে অসাধ্য। কারণ তৎকালীন জার্মান দার্শনিকদের

সংসর্গদোষে গর্কি ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দেই মার্কসবাদে আস্থা খোয়ান এবং উক্ত সমাজতন্ত্রের শোধনকল্পে কাপ্রি ও বোলানোতে দুটি বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠা করে সহকর্মী লুনাচার্স্কির সঙ্গে লেনিনের কটু কাটব্য কুড়ান"। (ম্যাকসিম গর্কি। স্বগত। পৃঃ ৯৯)। সুধীন্দ্রনাথ এখানেই থামেননি। গর্কি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে হোমর, শেকসপিয়র, য়ুক্লিড, ন্যুটন, এডগর এ্যালেন পো, বোদলেয়র, বাইরন, এলিয়ট, বুয়োর যুদ্ধ, জাপানের অভ্যুদয়, ফাশোদার উপদেশ, শ-প্রমুখ ফেবিয়ান, মার্কস, টেনিসন, সোভিয়েট শাসন রাষ্ট্রডায়ালেক্টিক, কাপ্রি ও বোলানোর বিদ্যাপীঠ, লুনাচার্স্কি, লেনিন, শেলি, কীটস, বুরিদানের গাধা—এত সব নাম ও বিষয় এসে গিয়েছে।

"শিল্প ও স্বাধীনতা" প্রবন্ধে সুধীন্দ্রনাথ দেশ-বিদেশের ৩৬ জন কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, দার্শনিক, শিল্পী ও বিজ্ঞানীর নাম টেনেছেন। লিখেছেন, "এমন কি মার্কস ও জন্মের গুণে অন্ধ নিয়তির অঞ্চলধারী"। কিংবা "মার্কসও আমার বিবেচনায় যথেষ্ট জড়বাদী নন।...সংস্কারমুক্তি যদি বুদ্ধিজীবীর ইষ্টমন্ত্র, তবু মনীষা আর অনুকম্পা অভিন্নহৃদয় এবং সর্বগ্রাহ্য সমবেদনা অমানুষিক ও স্বতোবিরোধী।" (কুলায় ও কালপুরুষ। পৃঃ ১৩৩)।

এখানে উল্লেখ-করা প্রবন্ধ কয়টি যে কোনও সাধারণ পাঠকের পক্ষে অনুধাবন করা যথেষ্ট কঠিন। কারণ সুধীন্দ্রনাথ ডি-এইচ লরেন্স সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লরেন্স-এর উপন্যাসের কাহিনী বর্ণনা করেননি, উপন্যাসে ব্যবহৃত মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে আধুনিক মনোবিজ্ঞান ও বিহেভিয়ারিস্ট স্কুলের কতটা মিল বা পার্থক্য, লরেন্স-এর সাহিত্য আদর্শ, সাহিত্যের প্রকৃত ধর্ম প্রভৃতি বিষয়েও আলোচনা করেছেন। "ম্যাকসিম গর্কি" এবং "শিল্প ও স্বাধীনতা" প্রবন্ধ দুটিতে উল্লেখ করা নাম ও বিষয়ের তালিকা থেকে বোঝা যাবে যে, তিনি কেবল ঐ নামগুলি নয়, তাঁদের রচনা, সাহিত্য ও শিল্পকীর্তি, বিজ্ঞান ও দর্শনে অবদানের সঙ্গে ভালোভাবেই পরিচিত ছিলেন এবং নানান বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য এত ব্যাপক ছিল যে, একটি বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে অজস্র সমস্যা তাঁর মনে এসে ভিড় করত। মার্কস-এর "ডিটারমিনিজম" ইহুদী নিয়তিবাদ থেকে এসেছে কিনা জানতে হলে ইহুদী ধর্মটাও ভালো করে জানা দরকার। আসলে সুধীন্দ্রনাথ পাঠকদের নিকট থেকে অনেক বেশী আশা করতেন।

সুধীন্দ্রনাথের নিকট যুক্তি-নির্ভরতা গদ্য রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভারতীয়

ও ইউরোপীয় বিভিন্ন ভাষা এবং সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজ-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁর যুক্তির ধরনও ভিন্ন হতে বাধ্য। জনপ্রিয়তা অর্জনের বাসনা কখনও তাঁকে লিখতে উদ্বুদ্ধ করেনি। তাঁর পরিচয়-গোষ্ঠীর কম্যুনিস্ট-বন্ধুদের অজ্ঞতা ও গোঁড়ামী দেখে বুঝতে পেরেছিলেন যে, ওইসব তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তির জন্য কোনও কিছু লেখা অর্থহীন, ওরা যাই পড়ুক না কেন, যে-তথ্যের মুখাপেক্ষী হোক না কেন, নিজেদের গোঁড়ামি পরিত্যাগ করে সাবালক হতে একেবারেই অনিচ্ছুক। ওদের সম্পর্কে পরে মানবেন্দ্রনাথ রায়কে লিখেছিলেন, "ঐ সব 'প্রগতিশীল' সমাবেশে বাঁধন-ছেড়ে বেরুতে চায় এমন যুবকদের চেয়ে আপনার মতো মধ্য-বয়স্ক ব্যক্তির মধ্যে আমি অনেক বেশি সজীবতা দেখতে পাই।" তাঁর বেশির ভাগ প্রবন্ধ বিশেষ একশ্রেণীর পাঠকের জন্য। সুধীন্দ্রনাথের কবিতার মতো প্রবন্ধগুলি পড়তে গেলেও এক ধরনের মানসিক প্রস্তুতি দরকার। তিরিশের মার্কসবাদী ঢেউয়ের মধ্যে মাথা উঁচু করে নিজের যুক্তি-নির্ভর বিশ্বাস নিয়ে যিনি হিমালয়ের মতো দাঁড়িয়েছিলেন, মার্কসবাদী বিশ্বাসের জালে জারিত সাধারণ বাঙালী পাঠকের নিকট সেই সুধীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের ভাষা অনেকটা অপরিচিত ঠেকবারই কথা। এখানেও অপরাধ ততটা ভাষার নয়, যতটা বক্তব্যের। কবিতার উপলব্ধিতে একই ধরনের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, কিন্তু প্রবন্ধের ক্ষেত্রে প্রয়োজন আগ্রহের সঙ্গে জ্ঞান ও মননশীলতা। বাংলাভাষায় জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে সুধীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ একটি অমূল্য সম্পদ। যাঁরা শিক্ষিত, বহু বিষয়ে যাদের জ্ঞান আছে ও আগ্রহ রয়েছে, সমাজ ও পৃথিবীর বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে যাঁরা চিন্তিত এমন ব্যক্তিদের জন্যও বাংলাভাষায় পঠনযোগ্য রচনা থাকা দরকার। সুধীন্দ্রনাথের রচনা এই জাতীয় পাঠকদের মননকে শাণিত করতে সমর্থ।

সুধীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ অনেকটা রাজনৈতিক কারণেও। মানুষের স্বাধীনতায় আস্থাশীল, কমিউনিস্ট বিরোধী অথচ নন-কনফরমিস্ট এবং স্ট্যাটাস-কুয়ো বিরোধী এই চিন্তানায়কের লেখার সঙ্গে বেশি লোক পরিচিতি হলে কম্যুনিস্টদের কিছুটা অসুবিধা হওয়ার কথা। তা না হলে সত্যিকারের দুর্বোধ্য ভাষা সত্ত্বেও বিষ্ণু দে'র গদ্য-রচনা সম্পর্কে অত তীব্র অভিযোগ ওঠে না কেন? এই জাতীয় সন্দেহ কেন, নীচের কয়েকটি উদ্ধৃত পড়লেই বোঝা যাবে:

("আমার জানতে বাকী নেই যে, সাম্য ও মৈত্রীর মন্ত্র সেধে মানুষ মুক্তি পায় না, নামে পিশাচের পর্যায়ে।") (স্বগত। পৃঃ ৯৮)।

"শুনেছি ডস্টয়ভস্কির রচনা রুশ কর্তৃপক্ষের বিচারে অপাঠ্য ; এবং এখনও কোন বলশেভিক কথাসাহিত্যিক আমার একাধিক বন্ধুকে তিলার্ধ আনন্দ দিতে পারেনি। (দোটানা। স্বগত। পৃঃ ১০৬)।

"ফ্যাসিজম আর কম্যুনিজম-এর উভয় সঙ্কটে শেষোক্ত নিগৃহনীতিই যথেষ্ট কম অসৎ বলে আমাদের অবশ্য বরণীয় নয় ; এবং সমুৎপন্ন সর্বনাশে অর্ধত্যাগের হিতোপদেশ যতই পাণ্ডিত্যসূচক হোক না কেন, দুটো মন্দের মধ্যে একটার নির্বাচন ন্যায়নিষ্ঠ মানুষের অসাধ্য। এক্ষেত্রে সভ্যতার চিরাচরিত মধ্যপন্থাই হয়তো অগতির গতি। (ম্যাকসিম গর্কি। স্বগত। পৃঃ ১০৩)।

"আসলে কর্তার ইচ্ছায় কর্ম করে যারা স্বাতন্ত্র্য খোয়ায়, হয় তাদের ভিতরে ব্যক্তি স্বরূপের বালাই নেই, নয় তারা কার্যকরী প্রতিভায় বঞ্চিত। অন্ততঃপক্ষে ফলিত মনস্তত্ত্বের মতে বিনা ধাক্কায় চৈতন্য জাগে না, এবং প্রতিকূল পরিবেশের উপর স্বাবলম্বীর স্বাক্ষরই যেহেতু রূপসৃষ্টির অনন্য অভিজ্ঞানপত্র, তাই জার্মান ও ইটালিয়ান সাহিত্যসেবীরা এখনও একেবারে লোপ পান নি। (দোটানা। স্বগত। পৃঃ ১০৯)।

॥ ৩ ॥

কবি অরুণ ভট্টাচার্য, এডোয়ার্ড শিলস, শিবনারায়ন রায় ও আরও অনেকে টি. এস. এলিয়ট সম্পাদিত "ক্রাইটেরিয়ান" পত্রিকার সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত "পরিচয়" পত্রিকার ভূমিকা তুলনা করেছেন। এলিয়ট ইংলণ্ড ও আমেরিকায় ইংরেজী কবিতার ক্ষেত্রে বিপ্লব এনেছেন, ইংরেজী কবিতাকে সমসাময়িক চিন্তাধারার বাহন করেছেন এবং অজস্র প্রবন্ধের মাধ্যমে আধুনিক কবিতাকে সাধারণ পাঠকের নিকট জনপ্রিয় করেছেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত "পরিচয়" কেবল আধুনিক কবিতা ও কাব্য-ধারণাই প্রচার করেনি, একেবারে আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও ইতিহাস পর্যালোচনা করে অজস্র প্রবন্ধ প্রকাশ করেছে। রাজনৈতিক মতবাদের দিক থেকে পরিচয়-এ প্রকাশিত প্রবন্ধের বক্তব্য ইংলণ্ডের বামপন্থী মতামত অপেক্ষাও আধুনিক ছিল। তবে সাহিত্যের

ব্যাপারে ক্রাইটেরিয়ানের ভূমিকার সঙ্গে পরিচয়ের ভূমিকা তুলনীয় নয় এই কারণে যে, এই একই সময়ে বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত ত্রৈমাসিক "কবিতা" আধুনিক বাংলা কবিতাকে জনপ্রিয় ও আরও আধুনিক পর্যায়ে উন্নীত করতে সাহায্য করেছে। প্রায় একই সময়ে সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত "পূর্বাশা" ও বাঙালী শিক্ষিত সমাজের মধ্যে সাহিত্য, রাজনীতি, শিল্প, বিজ্ঞান, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে আধুনিক চিন্তাধারা প্রচারে সচেষ্ট ছিল।

অনেকেই সুধীন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করেছেন। কিন্তু সেই পাণ্ডিত্যের কী স্বরূপ, তাঁর কী জীবনদর্শন, বিভিন্ন বাংলা ও ইংরেজী প্রবন্ধে তিনি কোন্ রাষ্ট্রীয় আদর্শের কথা বলেছেন, একজন মানুষকে তিনি কোন্ চোখে দেখতেন, ভারতের রাজনৈতিক দর্শনের বিবর্তনে তাঁর কোনো ভূমিকা আছে কি না, কম্যুনিস্ট-বন্ধুদের নিয়ে পত্রিকা বের করতে আরম্ভ করেও শেষ পর্যন্ত কেন তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করলেন, এ-সব প্রশ্ন নিয়ে বাঙালী সমালোচকদের ভাবতে দেখা যায়নি। তন্বী প্রকাশিত হয় ১৯৩০ সালে, ১৯৩৫ সালে অর্কেস্ট্রা, ১৯৩৭ সালে ক্রন্দসী, ১৯৪০ সালে উত্তর ফাল্গুনী এবং ১৯৫৩ সালে সংবর্ত। সংবর্ত কাব্যগ্রন্থে আমরা ৪০-দশকের কিছু কবিতা পাই। প্রতিধ্বনিতে ১৯৫৩ ও ১৯৫৪ সালে পরিমার্জিত কবিতাগুলির অনুবাদের তারিখ ১৯৩১ থেকে ১৯৪১। দীর্ঘ ১৩ বছর সুধীন্দ্রনাথ নতুন কবিতা বড় একটা লেখেননি। এই সময়ে তিনি এ-আর-পিতে এবং তারপর অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে স্টেটসম্যান-এ চাকরি করেছেন, নিজের বাড়ির দখল পাওয়ার জন্য আদালতে মামলা লড়েছেন, একটা চাকরি ছেড়ে অন্য চাকরি নিয়েছেন। কিন্তু তাই বলে এই সময়টা তাঁর জীবনের বন্ধ্যাকাল ছিল না। এই সময়ে তাঁকে কবিতার মতোই একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যাপৃত দেখা যায়। ১৯৪৫-৪৬ সাল থেকে সুধীন্দ্রনাথ ও এম. এন. রায়ের যৌথ-উদ্যোগে এবং এম. এন. রায়ের সম্পাদনায় "মার্কসিয়ান ওয়ে" প্রকাশিত হয়। ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত পত্রিকাটি চালু থাকে। তবে শেষ দুই বৎসর পত্রিকাটির নাম বদলে "হিউমানিস্ট ওয়ে" হয়। ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৫৪ সালে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এম. এন. রায় ও তাঁর স্ত্রী এলেন রায় প্রতি শীতকালে কলকাতায় এসে কয়েকমাস কাটাতেন। প্রতি সন্ধ্যায় তাঁরা হয় রাসেল স্ট্রীটে সুধীন্দ্রনাথের ফ্ল্যাটে নতুবা স্টোর রোডে আই-সি-এস সুশীল দে'র বাসায় মিলিত হতেন। এই বৈঠক ও আলাপ-আলোচনা এম. এন. রায়ের রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনার বিবর্তনে সাহায্য করে। এম. এন. রায়ের

মতো দুর্ধর্ষ পণ্ডিত, রাজনৈতিক ও দার্শনিককে যিনি মার্কসবাদী থেকে মানবতাবাদী-দার্শনিকে রূপান্তরে সাহায্য করেছেন, তিনি যে কত বড় চিন্তানায়ক, তা আর নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। দুঃখের বিষয়, বাঙালী কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধিবৃত্তির বেশী মাত্রায় ফারাক থাকায় তাঁরা সুধীন্দ্রনাথের এই ভূমিকা সম্পর্কে কোন খোঁজই রাখতেন না। সুধীন্দ্রনাথের মানসিকতা বোঝার ব্যাপারে "মার্কসিয়ান ওয়ে"-তে প্রকাশিত "লিবারেল রিট্রোসপেক্ট" এবং "ফ্রীডম অব এক্সপ্রেশান" প্রবন্ধ দুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বাবা হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সুধীন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিদেশ যাত্রায় পাঠিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ দেশে ফেরার পরেও সুধীন্দ্রনাথ ইউরোপে থেকে যান। সম্ভবতঃ অধিকাংশ বুদ্ধিমান শিক্ষিত যুবকের মতো সুধীন্দ্রনাথও যৌবনে রুশ-বিপ্লবের দ্বারা আলোড়িত হয়েছিলেন। তিনি প্রথম দিকে মার্কসীয় পদ্ধতিতেই ইতিহাস বিশ্লেষণের একমাত্র পদ্ধতি বলে মনে করতেন। কিন্তু তিনি কখনও পুরোপুরি মার্কসবাদী হননি। সমাজের সামগ্রিক স্বার্থের নামে ব্যক্তির বিকাশের পথ বা মতামত প্রকাশের সুযোগ রুদ্ধ করার ব্যাপারে কোনও দিন তাঁর মন সায় দেয়নি। ইউরোপ থেকে ফেরার আগে সুধীন্দ্রনাথ জার্মানিতে নাৎসীদের হাতে লাঞ্ছিত হন। "হের হিটলার" ধ্বনি দিতে অস্বীকৃতির জন্যই তাঁর ওই লাঞ্ছনা। (দি ওয়ার্ল্ড অব টুইলাইট-এ এডোয়ার্ড শিলস-এর ভূমিকা। পৃঃ xvi)। হিটলারের রাজত্বে তিনি ইহুদী-নিধনের তাণ্ডবও প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই ইউরোপ থেকে প্রধানত নাৎসী-বিরোধী হয়েই দেশে ফেরেন। ওই সময়ে রুশ সরকারের নির্দেশে দেশে দেশে কম্যুনিস্টরা ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট গঠনের রাজনীতি করছে। কম্যুনিস্ট বন্ধুদের সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথ "পরিচয়" পত্রিকা বের করেন ওই সময়েই। সুধীন্দ্রনাথ এত বেশী ফ্যাসি-বিরোধী ছিলেন যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধলে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সক্রিয় সহযোগিতার উদ্দেশ্যে তিনি সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে চেয়েছিলেন (এডোয়ার্ড শিলস। ঐ। পৃঃ xiv)। কিন্তু বেশি বয়সের জন্য সে চেষ্টা সফল হয়নি। তাই তিনি এ-আর-পিতে যোগ দেন। স্ট্যালিন তখনও হিটলারের সুহৃদ। তাই কম্যুনিস্টরা ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সমর্থন করতে রাজী হয়নি। এই সময়ে এম. এন. রায়ের র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টিই যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় ইংরেজদের সমর্থন করত। সুধীন্দ্রনাথ নিজেই উদ্যোগী হয়ে প্রথমে স্টোর রোডে এবং

পরে বেহালায় বীরেন রায়ের বাড়িতে এম. এন. রায়ের সঙ্গে দেখা করেন। ক্রমে তাদের পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ হয়। পরিচয়ের আগেই তাঁর একটা লেখায় এম. এন. রায়ের মতামত উদ্ধৃত হয়েছিল। তিনি লিখেছিলেন, "মানবেন্দ্র রায় মহাশয় সম্প্রতি লিখেছেন যে, ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র মুমূর্ষু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শেষ আস্ফালন হলেও ফ্যাসিস্ট দর্শন নাকি বেদ-বেদান্তের সমবয়সী এবং কিছুকাল পূর্বে অধ্যাপক ক্রসম্যান ভজিয়েছিলেন যে, আসলে প্লেটোই এই অনর্থের জন্মদাতা"। [প্রগতি ও পরিবর্তন (১৯৩৮) ; কুলায় ও কালপুরুষ। পৃঃ ২৫৬-৭]।

যুদ্ধের সময় মানবেন্দ্রনাথ রায়ের যুক্তিতে সুধীন্দ্রনাথ কতটা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তার প্রমাণ মিলবে পরবর্তীকালে লেখা '১৯৪৫' নামক কবিতায়। যাই হোক, হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করলে কম্যুনিস্টরা ইংরেজদের যুদ্ধ-প্রচেষ্টার প্রতি সমর্থন জানায়। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ কম্যুনিস্টদের সঙ্গে নতুন করে আর সম্পর্ক স্থাপন করেননি। পরিচয় পত্রিকা সম্পর্কেও তাঁর আর আগ্রহ থাকেনি এবং পরে ওটা কম্যুনিস্ট মাসিকে রূপান্তরিত হয়।

তাঁর বাড়িতে পরিচয়-গোষ্ঠীর সাপ্তাহিক আড্ডা বসলেও ম্যালকম ম্যাগারিজ বলেছেন, ১৯৩৪ সালে প্রায় প্রতিদিন সুধীন্দ্রনাথের আড্ডায় যাঁরা মিলিত হতেন তাঁরা হচ্ছেন তুলসী গোস্বামী, অপূর্ব চন্দ, শাহেদ সোহরাওয়ার্দি ও ম্যালকম ম্যাগারিজ। সুধীন্দ্রনাথের আড্ডায় বিভিন্ন সময়ে বুদ্ধদেব বসু, সমর সেন, সুশীল দে, অবনী চ্যাটার্জি, এম. এন. রায়, লিণ্ডসে এমার্সনও থাকতেন। যামিনী রায়, সত্যেন বসু, ধূর্জটিপ্রসাদ, বিষ্ণু দে, হীরণ সান্ন্যাল, আবু সয়ীদ আইয়ুব প্রভৃতি তাঁর পুরানো বন্ধুদের কথা তো জানাই আছে। বাঙালী বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র তিনিই সরাসরি জার্মান ও ফরাসিতে বই-পত্তর পড়তে পারতেন, অন্য সবাইকে সব কিছু জানতে হত ইংরেজদের চোখ দিয়ে অথবা ইংরেজী অনুবাদে। সেই সময় ইংলণ্ডের প্রগতিশীল মহলে রুশ বা কম্যুনিস্ট-বিরোধী কোন লেখাই ছাপা হত না। স্পেনের গৃহযুদ্ধে কম্যুনিস্টদের বিশ্বাসঘাতকতার অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখিত "হোমেজ টু ক্যাটালোনিয়া" ছাপতে জর্জ অরওয়েলকে কী অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল, তা আজ অনেকেরই জানা। কোনো কোনো ব্যাপারে সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে অরওয়েলের মতামতের মিলও চোখে পড়ে। সুধীন্দ্রনাথের লেখায় ও চিঠিতে অরওয়েলের নামের অনুল্লেখ আশ্চর্য মনে হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে সুধীন্দ্রনাথ চারিদিকের অবস্থা দেখে বিশেষ

অসুখী বোধ করতে থাকেন। সংবর্ত কাব্যগ্রন্থে তার প্রচুর নিদর্শন রয়েছে। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধের অবসানে দাঙ্গা, দেশ-ভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, গান্ধীহত্যা প্রভৃতি তাঁর মনকে কী ভাবে ভারাক্রান্ত করেছিল, ১৯৫৭ সনে 'এনকাউণ্টার' পত্রিকায় প্রকাশিত "ক্যালকাটা" প্রবন্ধে তার কিছুটা আভাস মিলবে। যুদ্ধের সময় জাপানী বোমার আক্রমণে ডকে প্রায় এক হাজারের উপর শ্রমিক মারা যায়। যুদ্ধকালীন সেনসরের কল্যাণে সে-খবর কোনও সংবাদপত্রে সেদিন ছাপা হয়নি। প্রায় ১৬ বছর পরে 'ক্যালকাটা'-প্রবন্ধেই সুধীন্দ্রনাথ সে-কথা আমাদের জানালেন। ১৯৪৬ সনে কলকাতার হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা তাঁকে এতটা পীড়িত করে যে, তিনি এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার কথাও চিন্তা করেছিলেন। (শিলস। ঐ। পৃঃ xx)। তিনি মানুষকে মানুষ হিসাবে দেখতেন, দাঙ্গায় কোন সম্প্রদায়ের লোক বেশী মরেছে, এ-জাতীয় জঘন্য চিন্তা তাঁর মনে ঠাঁই পায়নি।

সুধীন্দ্রনাথ বর্তমান ব্যবস্থায় অত্যন্ত অসুখী, তিনি পরিবর্তন চান। কিন্তু সে পরিবর্তনের রূপ কী হবে আন্দাজ করতে না পারলে বর্তমানকে ছাড়তে রাজী নন। "আমগ্ন তরণী ছেড়ে পারি না ঝাঁপ দিতে সাগরের জলে" লাইনটিতে তাঁর মনের ভাব স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি তাঁর অজস্র প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, দোষ গুণ মিলিয়েই প্রতিটি মানুষ। এলিয়ট, যিনি ইংরেজী কবিতার জগতে বিপ্লব এনেছেন, তিনিও গোঁড়া রোমান ক্যাথলিক। সুধীন্দ্রনাথ এলিয়টের চিন্তা-ভাবনাকে নিন্দা করলেও কবি এলিয়টকে শ্রদ্ধা করতেন। মিলটন একদিকে মত-প্রকাশের স্বাধীনতার কথা বলেছেন, অপর দিকে ক্যাথলিক-নিধনকেও সমর্থন জানিয়েছেন। মালার্মে-কে তিনি গুরু বলে স্বীকার করলেও ভিক্টর হুগোকে সব চেয়ে বড় ফরাসী কবি বলে মনে করতেন। অথচ হুগোর ব্যক্তিগত নীতি-হীন জীবন সম্পর্কে ব্যঙ্গ করতে পিছপা হননি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর আদিগুরু, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতার দুর্বলতাগুলি একাধিক প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন। তাঁর নিকট প্রতিটি ব্যক্তিই মূল্যবান। একজন মানুষের বিকল্প হিসাবে আর একজন মানুষের কথা তিনি কল্পনাই করতে পারতেন না। তিনি নিজেকে একজন উদারনৈতিক বলে মনে করতেন এবং সম্ভাব্য গোঁড়ামির হাত থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য বিরোধী মনোভাব প্রকাশে উৎসাহ দিতেন। "লিবারেল রিট্রোসপেক্ট" প্রবন্ধে সুধীন্দ্রনাথ নিজের জীবনদর্শন বর্ণনা করেছেন :

A true liberal is a confirmed rationalist who realizing that

instructive behaviour is impersonal, bases his individuality on the integral logic he has taught himself. He, is, therefore, unafraid of opposition which he welcomes, as a corrective to his possible dogmatism.

এই বক্তব্য থেকে বোঝা যাবে, কেন তিনি প্রতিটি মানুষের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করতেন, কেন তাঁর ব্যবহারের মধ্যে মার্জিত রুচি ও নিরহঙ্কার প্রকাশ পেত। তাই তিনি যাঁদের সম্পর্কে লিখেছিলেন, "আসলে কর্তায় ইচ্ছায় কর্ম করে যারা স্বাতন্ত্র্য খোয়ায়, হয় তাদের ভিতরে ব্যক্তি স্বরূপের বালাই নেই, নয় তারা কার্যকরী প্রতিভায় বঞ্চিত"—তাদের সঙ্গেও তিনি সহজভাবে বন্ধুর মতো মিশতেন।

সভ্যতার অগ্রগতির কোনও সিদে রাস্তায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। এ-বিষয়ে তিনি লিখেছেন: "হোয়াইটহেডের মতো আমিও বিশ্বাস করি যে, জবরদস্তির উপর যুক্তির প্রাধান্যের মাধ্যমেই প্রতিটি সভ্যতায় প্রতিটি সত্যিকারের অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। সুতরাং আমার নিকটেও উদারনৈতিকতা একটা বিশ্বজনীন ও চিরন্তন ধারা—উদারনৈতিকতা চরিত্রের উপর ব্যক্তিত্বকে উপস্থাপন করে। যেখানে চরিত্র হচ্ছে প্রকৃতির অযাচিত দান আপনা থেকে পাওয়া, সেখানে ব্যক্তিত্ব হচ্ছে স্বোপার্জিত গুণাবলীর জন্য সক্রিয়ভাবে অর্জিত পুরস্কার। (দি লিবারেল রিট্রোসপেক্ট। মার্কসিয়ান ওয়ে। প্রথম বর্ষ। পৃঃ ১২-১৩)।

সমাজের বিবর্তনে আর্থিক সমৃদ্ধির ভূমিকা স্বীকার করেও কেবল অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দিয়ে গোটা সভ্যতার উত্থান-পতন বিশ্লেষণ তিনি অসম্ভব মনে করতেন। কারণ সমাজে মানুষের কাজকর্ম, মনোভাব শুধু অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা পরিচালিত হয় না। তিনি মার্কসবাদীদের তথাকথিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলেছেন: "...I suspect that the "scientific" determination of the latest school of historians is, at least potentially, as conducive to slavery as the astrological predestination taught by the theocratic tyrannies of old." (ঐ, দি মার্কসিয়ান ওয়ে। পৃঃ ৪)।

কম্যুনিস্টরা ধনতান্ত্রিক সমাজে সমস্ত প্রকার বন্ধন থেকে ব্যক্তির মুক্তিলাভের কথা বলে থাকে। অথচ বিশ ও ত্রিশের দশকে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে ও অন্যত্র,

যেমন স্পেনে, কম্যুনিস্ট প্রভাবিত সরকার কর্তৃক ব্যক্তি-স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়ার যে-কোনও প্রচেষ্টাই সমর্থন করেছে। এক ঈশ্বরের বন্ধন ছিন্ন করে তারা এক নতুন-সৃষ্ট ঈশ্বরের পায়ে মাথা বিকিয়ে দিয়েছে। এদের মানসিকতা ব্যঙ্গ করে সুধীন্দ্রনাথ লেখেন: "Since theirs was the gospel of equality arrived at by introspection alone, the intellectuals of the 1920's wasted their splendid substance in freeing the individual in order that the group could accept totalitarianism without compunction. If there is no god, one must be invented immediately." (ঐ। পৃ: ১৫)। সুধীন্দ্রনাথের এই চিন্তাধারার প্রভাব সবচেয়ে বেশী পড়েছে এম. এন. রায়ের শেষ বই, "রিজন, রোমানটিসিজম অ্যাণ্ড রিভোল্যুশান"-এ।

দীপক গুহরায়

মার্ক্‌স্‌, সুধীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধদর্শন

১

পৃথিবীব্যাপী বহু প্রগতিবাদী লেখকের নিকটই এক সময় রুশ-বিপ্লব সাম্য ও স্বাধিকারের বার্তাবহরূপে উপস্থিত হয়েছিল। ইংরেজ শাসনে বীতশ্রদ্ধ ভারতীয় মনীষার এক বৃহদংশও এই বিপ্লবের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছিল নিপীড়িত মানুষের শৃঙ্খলমুক্তির সঞ্জীবন মন্ত্র। আকর্ষণের আতিশয্যের ফলে রুশ-বিপ্লবের অন্তর্নিহিত স্ববিরোধ এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি তখন অনেকেরই দৃষ্টিতে পড়েনি। বিপ্লব-কাণ্ডারীদের ভাবজগতে মার্ক্‌সীয় দর্শন ছিল একচ্ছত্র আধিপত্যে অধিষ্ঠিত। সার্ত প্রমুখ চিন্তানায়কদের মতো সুধীন্দ্রনাথও ভেবেছিলেন যে 'মনুষ্য ধর্মের শাশ্বত সমস্যা মার্ক্‌সীয় ডায়ালেটিকের সাহায্যে সমাধানসাধ্য'। অবশ্য কোন সিদ্ধান্তে প্রশ্নাতীত আত্মসমর্পণ সন্ধানী মননের ধর্ম নয়। যে প্রখর চিন্তাশক্তি এবং বিশ্লেষণী প্রতিভা অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক ঐতিহ্যের আবহাওয়ায় মানুষ সুধীন্দ্রনাথকে জড়বাদে আকৃষ্ট করেছিল, তা-ই তাঁকে রুশ-বিপ্লবের ক্রম-পরিণতি নিয়ে ভাবিয়ে তোলে। এগিয়ে চলা ইতিহাসের অভিজ্ঞতা তাঁর বিশ্বাসের ভিত্তি মূলেই আঘাত হানল। কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রব্যবস্থায় তত্ত্ব এবং প্রয়োগের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অসঙ্গতি এবং সমতা ও স্বাধিকারের পারস্পরিক পরিপূরণের ভূমিকার পরিবর্তে পরিদৃশ্যমান বিরোধ বহু মনস্বীদের মতোই সুধীন্দ্রনাথের মনেও নানা প্রশ্ন ও সন্দেহের অবতারণা করে। ফলে সুধীন্দ্রনাথ, এমনকী, মার্ক্‌সীয় দর্শন সম্বন্ধেও পুনর্বিবেচনায় প্রবৃত্ত হন।

মার্ক্‌সের দর্শন মূলতঃ দ্বন্দ্বভিত্তিক। জড় ও জীবজগতের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ থেকে শুরু করে মানবিক কর্মপ্রবাহ পর্যন্ত মার্ক্‌স দ্বন্দ্বের এক অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ লক্ষ্য করেছেন। অবশ্য প্লেখানভের বিশ্লেষণাত্মক সংযোজনের পরেও অভিধাটি মার্ক্‌সের স্বপ্রদত্ত নয় বলে মার্ক্‌সীয় দর্শনকে বর্তমানে অনেক মার্ক্‌সবাদী দার্শনিকও 'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ' নামে চিহ্নিত করতে নারাজ। মৌলসত্তায় লোকোত্তরের পরিবর্তে বিবর্তনভিত্তিক প্রকৃতিকে বসালেও

ঘটনাপ্রবাহে মানুষের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা মার্ক্সের নিকট ছিল অচিন্তনীয়। অপরিণতবুদ্ধি ভাষ্যকাররা হেগেলীয় দর্শনের বিরুদ্ধে জেহাদ নিয়ে বহু সোরগোল তুলেছেন, কিন্তু মার্ক্সও প্রকৃতপক্ষে হেগেল প্রমুখ মনস্বীব্যাখ্যাত দ্বন্দ্বভিত্তিক জার্মান দার্শনিক ধারারই উত্তরসূরী। পক্ষ, বিপক্ষ এবং উভয়পক্ষ বা সমন্বয়ে এই দ্বন্দ্বের ক্রমিক বিকাশ। অবশ্য জড়সত্তা থেকে ধারণার উদ্ভাসে মার্ক্স আস্থাশীল ছিলেন, যা হেগেলীয় তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত। আবার জড়সত্তার আধারে মানবমনকে বাঁধা হলেও ঘটনাপ্রবাহের রূপায়ণে তার কোন ভূমিকাই নেই, এই জাতীয় নেতিবাচক চিন্তায় মার্ক্স সচরাচর গুরুত্ব আরোপ করেননি। যান্ত্রিক জড়বাদের বিরুদ্ধে তাত্ত্বিক সংঘাতের সময় অধিকাংশ মার্ক্সবাদী ভাষ্যকার মানুষের ভূমিকা সম্বন্ধে মার্ক্সীয় স্বীকৃতিতেই আশ্রয় খোঁজেন, অথচ কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলির কর্ণধাররা প্রতিকূল পরিবেশের দোহাই দিয়ে শিল্পী-সাহিত্যিক সমেত সর্বস্তরের মানুষের স্বাধীনতার সংকোচনে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। তাছাড়া ক্ষমতার উত্তরোত্তর কেন্দ্রীকরণের পর কম্যুনিজম্-অভিপ্রেত সার্বিক বিকেন্দ্রীভূত সমাজে ঐতিহাসিক উত্তরণ কীভাবে সম্ভব হয়ে উঠবে? অনেক তাত্ত্বিকের উপেক্ষা কুড়োলেও উদ্দেশ্য ও উপায়ের এই বৈপরীত্য সুধীন্দ্রমানসে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। সুধীন্দ্রনাথের ভাষায়—"……বামাচারের উদ্দেশ্য ও উপায়ের বৈপরীত্য তখনও আমাকে দুঃখ দিত; এবং বরাবরই আমার সন্দেহ ছিল যে সে বিরোধের শেষ নেই।"

(কলাকৈবল্যের যুক্তিতে দণ্ডায়মান নিরবলম্ব সাহিত্য সুধীন্দ্রনাথের প্রশ্রয় লাভ করেনি। কিন্তু রচয়িতার স্বাধীনতাই যে মহৎ সৃষ্টির প্রাণবায়ু তা তাঁর অবিদিত ছিল না, তাই রাষ্ট্রশক্তির পদতলে স্বাধিকারের আত্মসমর্পণকে তিনি কোনো যুক্তিতেই গ্রহণ করেন নি।) সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতিকে সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করায় মার্ক্সিম্ গর্কিকে সাধুবাদ জানিয়ে সুধীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"……প্রাপ্যের অধিক পূজা পেয়েও তিনি নিজের গন্তব্য ভোলেননি, আমরণ মনে রেখেছিলেন যে (গ্রাসাচ্ছাদনে, আহ্লাদ-আমোদে, শিক্ষায়-সংস্কৃতিতে শুধু প্রতিভাশালীর আয়ত্তি যথেষ্ট নয়, সর্বসাধারণের উৎকর্ষ সাধনাই সভ্যতার একমাত্র ব্রত।")

এ আদর্শ যে মহান্, অনবদ্য শিল্পসৃষ্টির চেয়ে অকৃপণ সমাজসেবা যে অনেক বেশী উদার, সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। তা সত্ত্বেও ঐ সিদ্ধান্ত সম্ভবতঃ অর্ধসত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত, এবং অর্ধসত্য অসত্যের চেয়েও মারাত্মক।

অন্ততঃপক্ষে এ সংবাদ সকলেরই জানা থাকার কথা যে, অনুরূপ যুক্তির জালেই জার্মানি ও ইটালির স্বাধিকার প্রমত্ত রক্ষণশীলেরা তথাকথিত অসামাজিক সৌন্দর্যজ্ঞান বা শ্রেয়ো বোধের উদ্বন্ধন ঘটাচ্ছে; এবং স্বৈরতন্ত্রের প্রতিবাদেই যখন গর্কির সারা জীবন কেটেছে, তখন তাঁর দৃষ্টান্ত থেকে কখনও প্রজ্ঞাবিসর্জনের কুমন্ত্রণা মিলবে না, স্বাবলম্বী বিচারবুদ্ধিকেই অপরিহার্য লাগবে। কারণ "ফাসিজম্ আর কম্যুনিজম্-এর উভয় সঙ্কটে শেষোক্ত নিগ্রহনীতিই যথেষ্ট কম অসৎ বলে আমাদের অবশ্য বরণীয় নয়; এবং সমুৎপন্ন সর্বনাশে অর্ধত্যাগের হিতোপদেশ যতই পাণ্ডিত্যসূচক হোক না কেন, দুটো মন্দের মধ্যে একটার নির্বাচন ন্যায়নিষ্ঠ মানুষের অসাধ্য। এ-ক্ষেত্রে সভ্যতার চিরাচরিত মধ্যপন্থাই হয়ত অগতির গতি; এবং সে পথে চলতে গিয়ে বুরিদান-এর গাধা অনাহারে মরেছিল বটে, কিন্তু তার দু-পাশে যে দুই বিপরীতমুখী গড্ডালিকা-স্রোত প্রবাহিত, তাদের পরিসমাপ্তি একেবারে প্রলয়পয়োধিতে।" অর্থাৎ স্বাধীন স্বতন্ত্র বিচার বিশ্লেষণের অধিকারকে সামাজিক শ্রেয়বোধের প্রতিযোগী-রূপে সুধীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেননি।

সাধারণতঃ মোহভঙ্গের পর পুরোনো আশ্রয়ের প্রতি অন্ধবিদ্বেষ যুক্তির ধার ধারে না। তত্ত্ব এবং ব্যবহারিক প্রয়োগের ব্যবধান-সঞ্জাত বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া কিন্তু সুধীন্দ্রনাথকে যুক্তিনিষ্ঠা বিসর্জনে উদ্যত করেনি। তাই তাত্ত্বিক পুনর্বিবেচনায় সুধীন্দ্রনাথ মন্থরগতি। 'একাধিক ক্ষেত্রে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির সাফল্য' তিনি লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু তাঁর মতে 'একেবারে নিষ্প্রমাদ মানুষ আজ পর্যন্ত জন্মায়নি।' মনীষার উৎপত্তি উপসংহার যেহেতু জাগতিক, মনীষীর মননও সীমিত এবং তাঁর বাণী স্বভাবতঃই দৈববাণী নয়, ধনতন্ত্রের অমোঘ বিনাশ মার্কসের অভিলষিত হলেও তা 'এ-যাবৎ অনাগত।'

যে বিষম সমাজব্যবস্থায় মানুষ যন্ত্রের অংশবিশেষে পরিণত হয়, তার অবসান ঘটিয়ে মানুষের মনুষ্যত্বকে পূর্ণমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করবার স্বপ্ন নিয়েই সমাজতন্ত্রের যাত্রা সুরু। মার্ক্সও এ স্বপ্নই দেখেছিলেন। অন্য ভাবে বললে এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, খণ্ড মানুষকে মহত্তর মানবিক সংস্কৃতিতে বিধৃত করাই হল সমাজতন্ত্রের নৈতিক প্রেরণা। কিন্তু বিভিন্ন যুগের সংস্কৃতি-সাধকদের অবদান সম্বন্ধে প্রাগুক্ত তত্ত্বের সিদ্ধান্ত কী? সংস্কৃতি সাধকদের মূল্যায়ণ সম্বন্ধেই বা এর বক্তব্য কী? যুগার্জিত সংস্কৃতিকে জনসাধারণের লভ্য করে তোলাই কাম্য হলে সংস্কৃতিচর্চার অবাধ অধিকার থাকবে না কেন?

সুধীন্দ্রনাথও সর্বদা জানতে চেয়েছেন যে 'সাম্যবাদে অবনতের উন্নতি যেমন অবশ্যম্ভাবী, উন্নতের অবনতির তেমনই অনিবার্য কিনা', এবং সুধীন্দ্রনাথের ভাষায়—'আমার আশঙ্কা যে নিছক স্বার্থবুদ্ধির দৈববাণী নয়; তার সাম্প্রতিক প্রমাণ লাইসেঙ্কো, কাদাইয়েভ প্রভৃতির অস্থায়ী প্রতিপত্তি, এবং আমার আস্থা যবেই ম'রে যাক, বুদাপেস্তের সদর রাস্তায় ঘুরে ঘুরে তার ভূত আবার আন্দাজ করেছে যে দু-এক ক্রোড় রুষবাসীর অকালমৃত্যু আর সে দেশের সাধারণ সমৃদ্ধিবৃদ্ধি তৎকালিক বটে, তবু যেহেতু কার্য কারণের ধার ধারে না, তাই খ্রুশ্চেভের রাষ্ট্র ভূতপূর্ব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মতোই পদানতের শোষণে পরিপুষ্ট।' অবশ্যই শোষণমুক্তির শপথ নিয়ে যে মতাদর্শের যাত্রা সুরু, নবতর শোষণে আত্মসমর্পণ তার কাম্য ছিল না। প্রকৃতপক্ষে মার্কসের সঙ্গে পত্রালাপে এঙ্গেল্‌স্ এই স্বীকৃতিও জানিয়েছেন যে, বাস্তবজীবনে উৎপাদন ও প্রত্যুৎপাদন শেষ পর্যন্ত নির্ধারকের ভূমিকা নিলেও বিভিন্ন সমান্তরাল শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াতেই ঐতিহাসিক ঘটনার উৎপত্তি এবং এমনকী, বিভিন্ন রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ধর্মভিত্তিক তত্ত্বনিচয়ের ন্যায় উপরাবয়বের উপাদানগুলিও এই সৃজন-প্রক্রিয়ায় অস্পৃশ্য নয়। অবশ্য তরুণতর লেখকদের অর্থনীতি কৈবল্যের প্রতি অত্যধিক আস্থাপোষণের দায়িত্ব যে তাঁর ও মার্কসেরই তাও তিনি মেনে নিয়েছেন। এ বিষয়ে সুধীন্দ্রনাথের বক্তব্য স্মরণযোগ্য :

'প্রকৃতপ্রস্তাবে, মার্ক্‌স্ কেন, যত দার্শনিক অনেকান্ত জগৎকে একসূত্রে বাঁধার প্রয়াস পেয়েছেন, তাঁদের সকলে অসংখ্য গেরো পাকিয়েছেন বটে, কিন্তু কেউ সারা সংসারকে বাগ মানাতে পারেননি ; এবং সেই জন্যে তত্ত্বজ্ঞানের বিতরণ যাদের ব্যবসায় নয়, অন্তত তারা নানা মুনির নানা মত মনে রেখে পরিণামে সত্যের অভিমুখে আস্তে আস্তে এগোয়, এদিক থেকে দেখলে মার্কসবাদ আদ্যন্ত নিরর্থক বা অসার্থক নয় ; এবং ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা ব্যাপক প্রয়োগের পরীক্ষা না পেরিয়ে থাক, তার সাহায্যে গত একশ, দেড়শ বছরের বহু ব্যাপারকে সরল লাগে। অবশ্য গোড়ায় গলদ শেষরক্ষার পরিপন্থী ; এবং যুক্তিই যদিচ অনুরূপ অপচেষ্টার আদর্শ প্রতিকার, তবু জ্যামিতির মূলানুসন্ধান করে একদল ভাবুক উপরন্তু ভজাতে চেয়েছেন যে শুধু স্বতঃসিদ্ধ ও স্বীকার্যের সংক্ষেপ তথা অন্তঃসংগতি যথেষ্ট নয়, নিরবধিকাল ও বিপুলা পৃথ্বীতে খাটাতে খাটাতেই প্রতীত্য সমুৎপাদের ভুলভ্রান্তি ধরা পড়ে।' তত্ত্বের পরিকল্পনায় সংযোগের পরিবর্তে বিয়োগের প্রাধান্য সুধীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে

মার্ক্সীয় তত্ত্বের 'গোড়ায় গলদ।' হয়তো ঐতিহাসিক কারণেই তাত্ত্বিক পরিকল্পনায় ধনবাদের অবলুপ্তির বিয়োগান্ত দিকটি সমসমাজের গঠনমূলক দিকের চাইতে অধিকতর প্রাধান্য লাভ করেছিল। কিন্তু আজও এই নেতি ও ইতির তুলাসাম্যহীনতার ফলভোগ থেকে সমসমাজের তত্ত্ব রেহাই পায়নি।

মার্ক্সীয় ইতিহাস-বীক্ষণে দ্বন্দ্ব ইতিহাসের প্রাণপুরুষ। পরিণামী সত্যে আস্থাবান মার্ক্সের কল্পনায় গতানুগতিক দ্বন্দ্বের অবসান রাষ্ট্রহীন ও শ্রেণীহীন মানবিক সমাজে। অবশ্য শ্রেণীসমাজে শ্রেণীসংঘর্ষ যেমন অবশ্যম্ভাবী, সুধীন্দ্রনাথের মতে এই 'প্রাণপাত দ্বৈরথে উভয়পক্ষের বিলুপ্তি অমোঘ ব'লেই, তার প্রত্যেক পর্যায়ে অনাহুত স্বৈরীদের অন্তর্বিগ্রহ' অনিবার্য। আজকের প্রেক্ষাপটে পরিবর্তনকামী অগ্রদূতদেরও ক্ষমতাবিস্তৃতির দিকে দৃষ্টিকটু আগ্রহ দেখে নিরাসক্ত বুদ্ধি মানতে বাধ্য যে 'দুর্মর শ্রেণীস্বার্থের মতো স্বয়ংবশ চিত্তবৃত্তিও জড়বাদে বদ্ধমূল।'

মার্ক্‌স্ 'শুভবাদী ভাবিকথক।' শুভবাদী প্রবণতা ও সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা—এই দুই এর সংমিশ্রণজাত আত্মপ্রত্যয়ের ফলে 'সদসদের নিরন্তর দ্বৈত' মার্ক্সের তত্ত্বে যথাযোগ্য স্বীকৃতি পায়নি। যে কোন স্তরেই মানুষের ইতিহাস মানুষের কর্মপ্রবাহেরই ইতিহাস। তাই যে কোন পর্যায়েই ইতিহাস অবিমিশ্র মঙ্গলের আবির্ভাবে ধন্য নয়, বরং মানুষের 'ধর্মে, কর্মে শুভাশুভ নিত্য নিরন্তর'। ফলে তাত্ত্বিক অনীহা, এমনকী, সাম্যভিত্তিক সমাজেও সর্বশক্তিমান একনায়কের আবির্ভাব রোধ করতে পারেনি। অবশ্য আশাহত সুধীন্দ্রনাথ কলাকৈবল্যের নিরাপদ আশ্রয়ে প্রত্যাবর্তন করেননি। সাহিত্যের সামাজিক দায়িত্ব সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকা সত্ত্বেও প্রাগুক্ত দায়িত্ববোধ এবং কোনো বিশেষ রাষ্ট্রশক্তির স্তুতিভাষণে সমার্থ টেনে আনা যুক্তিবাদী সুধীন্দ্রনাথের বিদগ্ধ মননে অসহ্য ঠেকেছে। তাঁর ভাষায়—"রসসৃষ্টির ব্যাপারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় নয়, বরং বিপজ্জনক; এবং আরও অনিষ্টকর ব্যক্তিগত অথবা গোষ্ঠীভুক্ত ক্লৈব্যের জন্য রাজশক্তির বিদূষণ।"

কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রব্যবস্থায় তত্ত্ব ও প্রয়োগের অসঙ্গতি সুধীন্দ্রনাথ বহু পূর্বেই নিরীক্ষণ করেছিলেন। মানবেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত 'দি মার্ক্সিয়ান্ ওয়ে' ত্রৈমাসিক পত্রিকার ১৯৪৬ এর জানুয়ারি-মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত 'ফ্রীডম্ অফ্ এক্স্‌প্রেশন্' প্রবন্ধটি ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রতি সুধীন্দ্রনাথের সমর্থনের দীপ্তিমান্ নিদর্শন। মার্ক্সের মতে, সামগ্রীর উৎপাদনের চক্রাবর্তন যেখানে

শেষ, স্বাধীনতার রাজ্যের সেখানে সুরু। প্রথাগত সমাজে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুর উৎপাদনেই মানুষের অধিকাংশ সময় নির্বাহিত হয়! কাজেই অর্থনৈতিক শক্তি নিচয়ের বল্গাহীন ক্রিয়া-প্রক্রিয়াকে ন্যূনতম পর্যায়ে নিয়ে আসার জন্য কায়িক মেহনতের পরিকল্পিত বিনিয়োগ দরকার। মার্ক্সের অভিলষিত সামূহিক সমাজ তাই স্বাধীনতার শ্রীক্ষেত্রে পরিণত হবে বলে কম্যুনিষ্টরা বিশ্বাস করেন। আর এই শ্রীক্ষেত্রের দিকে মানবেতিহাসের শ্লথগতিকে ত্বরান্বিত করার যুক্তিতে কম্যুনিষ্টরা ধনতান্ত্রিক সমাজে সর্বপ্রকার অধিকার দাবি করে থাকেন। অথচ কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে অপ্রয়োজনীয়তার দোহাই দিয়ে স্বাধিকারের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা হয়েছে! ১৯৪৬ এর একমাত্র সামূহিক সমাজের ভিত্তি স্বাধিকারের তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কর্তব্য-পরায়ণতার কৈবল্যের উপরই প্রাগুক্ত সমাজের অধিষ্ঠান হয়েছে। সুধীন্দ্রনাথ একে দুর্ভাগ্যজনক বলে মনে করেছেন।

'ফ্রীডম্ অফ একস্‌প্রেশন্' প্রবন্ধেই সুধীন্দ্রনাথ গণতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর আস্থা ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে 'বস্তুতঃ বিজ্ঞান ও গণতন্ত্র উভয়েই সত্যনিষ্ঠ'। গ্রহণ-বর্জনের সুযোগ থাকায় বিজ্ঞানের সামাজিক দায়িত্বপালন যথার্থ গণতন্ত্রেই সম্ভব বলে সুধীন্দ্রনাথ মনে করতেন। তাই সুধীন্দ্রনাথের নিকট মার্ক্সের অস্তিত্বনির্ভর চেতনা গোষ্ঠীর পুরোভাগে ব্যষ্টির অধিষ্ঠানরূপে দেখা দিয়েছে। মানবেন্দ্রনাথ রায়ও এই ব্যাখ্যাই দিয়েছিলেন। অবশ্য শুভাশুভের নিরন্তর প্রবাহে শেষ পর্যন্ত মানুষ শুভকেই বরণ করবে; সুধীন্দ্রনাথের এই প্রত্যয় উত্তরকালে শিথিল হয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিস্বাধীনতায় তাঁর আস্থা পরবর্তীকালেও বারংবার ব্যক্ত হয়েছে।

২

নিশ্চিন্ত বৈদান্তিক পিতৃদেবের অভিমত মেনে না নিয়ে সুধীন্দ্রনাথ 'অদ্বিতীয়ের অনির্বচনীয় আতিশয্যে'র বিকল্পরূপে অনেকান্ত জড়বাদের আশ্রয় নিয়েছিলেন। মানসপ্রক্রিয়ায় অলৌকিকের উদ্ভাসের অস্তিবাদী সিদ্ধান্তে তিনি বরাবরই অসম্মতি জানিয়ে এসেছেন। অবশ্য ভারতীয় দর্শনে আস্তিক্য ও নাস্তিক্য নির্ধারিত হয় বেদপ্রমাণের স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতির নিরিখে এবং এমনকী আস্তিক ভারতীয় দর্শনও সৃষ্টিপ্রসঙ্গে লোকাতীত সত্তা ও জড়ের অগ্রাধিকার নিয়ে উগ্র মতান্তরের অবাঞ্ছিত উপদ্রব-সম্পৃক্ত নয়। সবকিছুই

এখানে এক অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে বিধৃত এবং বেদান্তও প্রকৃতপক্ষে স্রষ্টা ও সৃষ্টির অদ্বৈত ঘোষণায় তৎপর। কিন্তু ভাষ্যকারদের ব্যাখ্যানে এই তুলাসাম্য রক্ষিত হয়নি এবং কালক্রমে দর্শনজাত ব্রহ্ম ও লৌকিক ঈশ্বর সমার্থবোধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে ব্রহ্মকৈবল্যের অন্তরালে সর্ববিধজাগতিক ব্যাপারে ঔদাসীন্য ভর করায় জাতীয় জীবন নানাবিধ অসামঞ্জস্যে পূর্ণ হয়ে ওঠে এবং সেই বিড়ম্বনাময় ঐতিহ্য থেকে মধ্যবিত্ত মানসিকতা আজও নিষ্কৃতি পায়নি। সুধীন্দ্রনাথ এই উদ্যমহীনতাকে লক্ষ্য করে লিখেছেন—"...বাংলা ভুলে গেছে অথচ ইংরাজী শেখেনি—এমন ইঙ্গ-বঙ্গ জীব এখনকার আবহে অভাবনীয় হলেও, ইদানিং সেই শ্রেণীর মানুষই সংখ্যাভূয়িষ্ঠ, যাদের কাছে প্রাচ্যবিদ্যা কিংবদন্তি আর পাশ্চাত্য বিজ্ঞান জীবিকাসংগ্রহের অবান্তর উৎপাত। সুতরাং স্বাস্থ্যতত্ত্বের কলেজী বক্তৃতায় জীবাণুর বিভীষিকা দেখিয়ে, বাড়িতে চরণামৃত খেতে আমরা আজও অভ্যস্ত; এবং অনুষ্ঠানের সঙ্গে অধিষ্ঠানের মনান্তর যখন আর ঢাকা যায় না, তখন ভারতীয় দর্শনবিশারদেরা আধ্যাত্মিক আর্যাবর্তের তুলনায় জড়বাদী পশ্চিমের অপকর্ষ ভজান ব্র্যাডলী-প্রমুখ বৈনাশিকদের দোহাই মেনে। অর্থাৎ হিন্দুর বিবেক মন্ময়; এবং জীবন্মুক্তেরা অন্তর্যামীর নিকটে সদাচারের যত প্রেরণাই পাননা কেন, লোকাচারের উন্নয়নে তাঁরা স্বভাবত নিরুদ্যোগ। ফলত এখানে মধ্যপন্থার স্থান নেই; এবং যাঁরা এই অহং সর্বস্ব দেশের পরিচালক, তাঁদের কপালে অকথ্য দুরুক্তি ত আছেই, এমনকি অপঘাতও অসম্ভব নয়। অন্ততঃ গান্ধিহত্যা হিন্দুধর্মে বাধেনি; এবং সে-ঘটনার আগেও রবীন্দ্রনাথ বলতেন যে আমাদের সমাজে মহাপুরুষের আবির্ভাব যে-পরিমাণ অবারিত, জাতিসংগঠন ততোধিক ব্যাহত।"

মানুষের বাস্তব অবস্থার উন্নয়নে লোকাতীত সত্তার ভূমিকা মেনে নিতে প্রস্তুত না থাকায় সুধীন্দ্রনাথ হয়তো রুশ-বিপ্লবের মুক্তিকামী ক্ষমতায় অত্যধিক প্রত্যাশী হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু মোহভঙ্গের পরেও সুধীন্দ্রনাথের আধুনিক মনন যুক্তিনিষ্ঠ জড়বাদ বর্জন করেনি। অবশ্য বহু বিষয়ের মতোই মনস্বীরা কালের সর্বসম্মত সংজ্ঞানির্ধারণে সক্ষম হননি যদিও আধুনিকতা নিয়ে মতান্তরের বিস্তৃতিও নেহাৎ উপেক্ষণীয় নয়। যদি গোঁড়ামিমুক্ত মন আধুনিকতার অন্যতম শর্ত হয়, তবে 'প্রত্যয়ে প্রত্যয়ে' পীড়িত কবি-প্রবন্ধকার সুধীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে আধুনিক। 'কালের বৈগুণ্যে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের মূল্য' তাঁর নিকট ক্রমশঃই বেড়েছে। ফলে তাঁর বহু কবিতাই দেহাত্মবাদী হয়ে উঠেছে—

'মরণের সুধা সঞ্চিত তব আলিঙ্গনে ;
জন্মান্তর নিমেষে ফুরায় ও-চুম্বনে ;
তোমার নিবিড় নিঃশ্বাসবায়ু
করে হিমায়িত শবেরে শতায়ু ;
সন্নিধি তব স্বজন-আকৃতি পরানে ভনে।
আসে তথাগতি তোমার প্রগাঢ় আলিঙ্গনে ॥' (অর্কেস্ট্রা)

অবশ্য সুধীন্দ্রকাব্য প্রায়শঃই তীব্র নাস্তিবোধেও ভারাক্রান্ত—

'তবু মোর মন
চাহে নাই মোহের আশ্রয়।
জানি তুমি মরীচিকা, তোমাসনে প্রাণবিনিময়
কোনওদিন হবেনা আমার।
আমার পাতালমুখী বসুধার ভার,
জানি, কেহ পারিবেনা ভাগ ক'রে নিতে ;
আমারে নিঃশেষে পিষে, মিশে যাবে নিশ্চিহ্ন নাস্তিতে
একদিন স্বরচিত এ-পৃথিবী মম ॥' (নাম)

এই নাস্তিবোধ আধুনিক মননের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিশ্বের জড়-প্রবাহে মানুষের বিকল্পরূপে অপর কোন সমবোধশক্তিসম্পন্ন সত্তার অনুপস্থিতির যন্ত্রণা আজকের ভাবনায় বারংবার প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। বিশ্বাসীর ঐশীস্তুতিতেও আজকের মনন পরাঙ্‌মুখ। সর্বগ্রাসী শূন্যতায় ভাবনার রাজ্য টলমল! 'বিরূপ বিশ্বে' মানুষের নিয়ত একাকীত্বের দুঃসহ বেদনায় সুধীন্দ্রনাথ নানা প্রশ্নের আবর্তে পড়েছেন—

'হেথা যারা পরাজিত, বৈকুণ্ঠে তাদের হবে জয় ?
তোমার স্মারকস্তম্ভে অমর অক্ষরে
লেখা রবে তাহাদের নাম ?
নাম—শুধু নাম
কোন্ ফল সে-অমৃতে ?
পারিবে কি তাহা ফিরে দিতে
পৃথিবীর জল-বায়ু, রৌদ্র-ছায়া, সিদ্ধি ও সাধনা ?' (প্রশ্ন)

সুধীন্দ্রনাথ এ-সব প্রশ্নের নেতিবাচক উত্তরই পেয়েছেন। এই নাস্তি প্রাবল্যই কালক্রমে 'উদগ্র জড়বাদী' সুধীন্দ্রনাথকে ক্ষণবাদী বৌদ্ধদর্শনের

প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। কালের বিচারে বৌদ্ধ-দর্শন প্রাচীন হলেও এই আকর্ষণে আধুনিকতার বিচ্যুতি ঘটেনি, কারণ সুধীন্দ্রনাথ আধুনিক হলেও নিরবলম্ব নন।

'সংবর্ত' কাব্যগ্রন্থের মুখবন্ধে সুধীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'মহাকবিরা নাকি নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথ্বীর পোষ্যপুত্র; এবং তাঁদের পাশে আমি শুধু উদ্বাহু বামন নই, এমনকি তাঁরা যদি রসস্রষ্টা হন, তবে রসজ্ঞ উপাধিও আমাকে সাজেনা। অন্ততপক্ষে আমার লেখায় আধুনিক যুগের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট; এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আর যথাশক্তি অনুশীলনের ফলে আজ আমি যে-দার্শনিক মতে উপনীত, তা যখন প্রাচীন ক্ষণবাদেরই সাম্প্রতিক সংস্করণ, তখন না মেনে উপায় নেই যে আমার রচনামাত্রেই অতিশয় অস্থায়ী। কিন্তু অচির আর অনীহ একই বিশেষণের প্রকারভেদ নয়; এবং বৌদ্ধদের মতো বৈনাশিক বলেই, আমি যেমন কর্মে আস্থাবান, তেমনি আমার বিবেচনায় স্বাবলম্বী কর্তা জগৎ-সংসারের মূলাধার।' পুরাতন মূল্যবোধের অবলুপ্তি অথচ নতুন মূল্যবোধের অনুপস্থিতিজনিত হাহাকার সাম্প্রতিক কালের মানুষ সুধীন্দ্রনাথের কবিতা ও প্রবন্ধকেও স্পর্শ করেছে। লোকাতীত ঈশ্বরে আধুনিক মানুষ সান্ত্বনা খুঁজে পাচ্ছেনা। মানুষের সভ্যতা বার বার সংকটের আবর্তে পড়ছে। ধ্বংস থেকে সৃষ্টির পুনরভ্যুত্থান মানবিক প্রয়াসেই সংঘটিত হচ্ছে, যদিও সব সৃষ্টিই প্রাক্তনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পুনরবলুপ্তির দিকেই ধাবমান্। আবার অমঙ্গলের আধিক্য দেখেও মানুষের স্বকীয় প্রয়াসে আস্থাস্থাপন ভিন্ন গত্যন্তর কোথায়? জীব ও জড়ের বৈনাশিক পরিণতি মনে রেখেও 'আন্তরাগে'ই 'উজ্জীবনের প্রেরণা' খুঁজে পেতে হবে।

অবশ্য বৌদ্ধদর্শনের ব্যাখ্যা নিয়ে ভাষ্যকারদের মধ্যে মতানৈক্যের সীমা নেই। অস্তিবাদী ব্যাখ্যাতারা বৌদ্ধ সাধনমার্গের শঙ্খশুভ্র ব্রহ্মচর্য, নির্বাণ ও পরাশান্তির প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সুধীন্দ্রনাথের পিতাও বৌদ্ধদর্শনকে ক্রমাগত নাস্তির প্রয়োগের মাধ্যমে সার্থক অস্তিতে উত্তরণে বিশ্বাসী বলে মনে করেছেন। আধুনিক পুত্র অবশ্য এই অস্তিবাদী ও পরাশান্তিমূলক সিদ্ধান্তগুলিকে গ্রহণ করেননি। জগৎ-ব্যাখ্যানে 'সর্বংক্ষণিকং', 'সর্বংশূন্যং' প্রভৃতি নেতিবাচক বৌদ্ধ ধারণাগুলিই সুধীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিল।

সুধীন্দ্রনাথের কোনো প্রবন্ধে বৌদ্ধদর্শন নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা নেই। কিন্তু 'দশমী' গ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায় ক্ষণবাদী উত্তরণের সাক্ষ্য সুস্পষ্ট—

'আমি ক্ষণবাদী ; অর্থাৎ আমার মতে হয়ে যায়/নিমেষে তামাদী আমাদের ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ, তথা/তাতে যার জের, সে-সংসারও।' (উপস্থাপন)

ভারতীয় যুক্তিশাস্ত্রের আরম্ভবাদী নৈয়ায়িকেরা কারণের সামগ্রিক বিনাশে কার্যের উদ্ভব হয় বলে মনে করেন। জগৎ-সংসারের মূলকারণরূপে চিরস্থায়ী আত্মার অস্তিত্বকে বৌদ্ধদর্শন স্বীকার করেনি। জগতের সব কিছুই ক্ষণিক। অনাত্মাবাদী বৌদ্ধদর্শন তাই আরম্ভবাদকে গ্রহণ করেছে। কিন্তু কোন ঘটনাই আবার প্রবাহ বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। কারণের ও কার্যের বিনাশের এবং উদ্ভবের ধারা নিরন্তর বইছে। কার্য-কারণতত্ত্বের নিরবচ্ছিন্ন আরম্ভবাদী যুক্তি সুধীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছেন—

অন্তত এতে সন্দেহ নেই আর
অলাতচক্রে ঘুরে ঘুরে, সংসার
অনাদি অমাকে আনে আমাদের গোচরে ;
পুঞ্জ পুঞ্জ ব্যক্তির বুদ্বুদ,
সময়ের স্রোতে অচির, অরুন্তুদ,
মমতার জোট পাকায় এ-চরে, ও-চরে ॥
অভাব হয়তো স্বভাবেরই অগ্রজ ;
নিরবধি তাই প্রভাসে ফুরায় ব্রজ—
প্রতিজ্ঞা রাখে মরণ ত্রাতার বদলে :
বিশৃঙ্খলার পরাকাষ্ঠায় স্থাণু,
পৃথিবী অনাথ ; যথেচ্ছ পরমাণু ;
প্রগতিক শুধু কালভৈরব সদলে ॥ (প্রতীক্ষা)

নৈরাশ্য থেকে মুক্তির আর্তি-সুধীন্দ্রনাথের বিভিন্ন প্রবন্ধে ও কবিতায় প্রতিফলিত, কিন্তু 'সনাতন অমৃত' তাঁকে আশ্বস্ত করেনি। মার্ক্সীয় দ্বন্দ্বেও তিনি মানুষের মৌলিক সমস্যাবলীর সমাধান খুঁজে পাননি। তাই জড়বাদী সুধীন্দ্রনাথ ভারতীয় উৎসসম্ভূত নিরীশ্বর বৌদ্ধদর্শনে ভাবনা-সদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন। মৃত্যুপথযাত্রী গৌতম বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের জীবনের অনাবিষ্কৃত সত্যের অন্বেষণে স্বনির্ভরতায় আস্থাশীল হতে বলেছিলেন। সুধীন্দ্রনাথও দার্শনিক পরিক্রমায় নির্মোহ বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করেছিলেন। তিনি নিজে অবশ্য দর্শনকে তাঁর পক্ষে 'অনধিকার চর্চা' বলে মেনেছেন, কিন্তু তাঁর বহু প্রবন্ধে ও কবিতায় দর্শনের স্বচ্ছন্দ আত্মপ্রকাশ পাঠককে বিস্মিত না করে পারেনা।

সুধীন্দ্র-প্রতিন্যাস কতটা সার্ত্রীয়

উনিশ শ পঁয়তাল্লিশ সালে পারীর ক্লাব ম্যাতঁনঁতে প্রদত্ত 'অস্তিতাপন্থা মানববাদী' শীর্ষক ভাষণে সার্ত (Sartre) বলেছিলেন :

অনাথদশা (কথাটা হাইডেগার- এর খুব প্রিয়) বলতে আমরা এ-ই বুঝি যে ভগবান নেই, এবং তাঁর না-থাকার ভুর্ভোগ পুরোটাই পোয়াতে হবে। যতটা কম খরচে সম্ভব ঈশ্বরকে ছাঁটাই করে দেবার ধান্দায় যেসব লোকায়ত নীতিকেরা ঘোরেন, অস্তিতাপন্থী তাঁদের দু চক্ষে দেখতে পারে না। আঠার শ আশী নাগাদ একটা লোকায়ত নীতিশাস্ত্র চালাতে উদ্যোগী হয়ে ফরাসী অধ্যাপকবর্গ এই গোছের একটা কথা রটিয়েছিলেন :— ভগবান ধারণাটা অকারী অপচয়ী উপকল্প মাত্র, ঈশ্বর ছাড়াই চালাব। অবশ্য যদি নীতি, সমাজ, আর আইন-মানা জগৎ রাখতে হয়, গুটিকতক মূল্যবোধকে গুরুত্ব না দিলেই নয় ; ওদের 'আ প্রিওরি' (আপ্ত) অস্তিতা আরোপ করা দরকার। সৎ হওয়া, মিথ্যে কথা না বলা, বউকে না পেটানো, বাচ্চাদের মানুষ করা ইত্যাদি 'আ প্রিওরি' কর্তব্য বলে মানতে হবে ; কাজেই আমরা বিষয়টি নিয়ে একটু গবেষণা করে দেখাব ও-মূল্যবোধগুলো এখনও সবই আছে, কোনও বোধ্য স্বর্গগাত্রে খোদাই করা, যদিও ভগবান নেই। ফরাসীদেশে যাকে আমরা র‍্যাডিকালিস্ম বলি তার সার কথাটা মনে হয় এই—ঈশ্বর না থাকলে কিচ্ছু বদলাবে না ; আমরা ফের সততা, প্রগতি ও মনুষ্যত্বের একই প্রতিমান খুঁজে পাব, আর বিগামী জমানার উপকল্প হিসেবে বর্জিত ভগবান ধারণাটা চুপচাপ যাবে মিইয়ে। পক্ষান্তরে অস্তিতাপন্থীর বরঞ্চ মনে হয় ঈশ্বর নেই এ-ব্যাপারটা খুবই মুশকিলের, কারণ ওঁর সঙ্গে গেল বোধ্য কোনও স্বর্গে আদর্শ খুঁজে পাওয়ার সকল সম্ভাবনা। আর রইল না তাহলে কোনও 'আ প্রিওরি' শুভ, কেননা সেটা ধারণা করার জন্য পরমপ্রকৃষ্ট অসীম কোনও চেতনা নেই। লেখা থাকল না কোথাও যে 'শুভ' আছে, সৎ হওয়া যে চাই বা মিথ্যে যে বলা

চলবে না, কেননা আমরা এখন এসে পড়েছি সেই পর্যায়ে যেখানে লোকই আছে শুধু। দস্তয়েভস্কি একদা লিখেছিলেন, 'ভগবান না থাকলে সবই করা চলত'; আর এখানেই অস্তিতাপন্থার শুরু। ভগবান না থাকলে সবই করা চলে, মানুষ তাই সঙ্গবিরহিত, নিজের ভিতরে কিংবা বাইরে কোথাও সে নির্ভর করার মতো কিছুই খুঁজে পাচ্ছে না। তখনই সে অবিষ্কার করে, কোনও অজুহাত নেই তার। কারণ সত্যিই অস্তিতা যদি স্বরূপের প্রাগ্‌বর্তী, তবে উপাত্ত কোনও সুনির্দিষ্ট মনুষ্যভাবের দোহাই দিয়ে নিজের কাজের জবাবদিহি কখনোই দেওয়া যাবে না; বাচনান্তরে নিয়তি নেই—মানুষ মুক্ত, মানুষই মুক্তি। ওদিকে, ভগবানের অবর্তমানে, আমাদের আচরণকে বৈধ বলে দেখানোর কোনও প্রতিমান বা প্রত্যাদেশও জুটবে না। মানে কৈফিয়ত বা অছিলার কোনও সম্বল আমাদের পিছনেও নেই, নেই পুরোভাগেও, মূল্যমানের কোনও জ্যোতির্লোকে। আমরা পরিত্যক্ত একা, ব্যপদেশবিহীন। এ-ই বোঝায় যখন বলি মানুষ স্বাধীন হতে বাধ্য। বাধ্য: সে তো নিজেকে বানায় নি, তা সত্ত্বেও স্বাধীন, এ-জগতে এসে পড়ার মুহূর্ত থেকে যা কিছু করে তার জন্য সে দায়ী।[১]

তবে কি অস্তিতাপন্থীর বীক্ষায় প্রতিমানের কোনও স্থান নেই! ঈশ্বরের যে-তিরোধানের গাথা নীটশে রচেছিলেন সেই দুর্ঘটনার সঙ্গে-সঙ্গে কি মূল্যবোধের পাটও চুকে গেছে? তা নয়, যে-পাত্রে রাখা ছিল আদর্শগুলো, সেটা গেছে ফুটো হয়ে, চুঁইয়ে চুঁইয়ে সব বেরিয়ে যাচ্ছে, নিখিল নাস্তির শূন্যে নিরালম্ব। উপমাটা জুতসই হল না অবশ্য: ভগবানকে ভঙ্গুর পাত্র বা ছিদ্রিল তরণী কিংবা স্রোতে নিমজ্জমান অ-সাঁতারুর আঁকড়ে ধরা শেষ কুটো বলে দেখালে মনকে চোখ ঠারা হয়, ব্যাপারটা অত সোজা হলে আজকের দিনে ভগবদ্‌বিশ্বাস নিয়ে কারও কোনও মুশকিল থাকত না। কিন্তু রয়েছে যে! 'আত্মপ্রতিকৃতি' গল্পের লেখক জেনেছেন জগৎ গলে যাওয়ার অনন্য স্বাদ:

> কাকে যেন চিঠি লিখবার ছিল। পোস্ট অফিসে গিয়ে আমি পোস্টকার্ড কিনলাম, তারপর চিঠি লিখবার জন্য স্ট্যাণ্ডের ওপর হেলানো বোর্ডের কাছে দাঁড়িয়ে আমি অনেকক্ষণ ধরে চিঠিটা লিখলাম। তখনো সব কিছু ঠিকঠাক স্বাভাবিক ছিল। যতদূর মনে পড়ে আমার ডান হাতে কলমটা

ছিল, বাঁ হাতে ছিল পোস্টকার্ড। চিঠিটা পড়তে পড়তে ডাকবাক্সের কাছে এসে মুখ তুলেই সেই ঘোর লাল রঙের ডাকবাক্স, সার্জেন্টদের মতো কালো টুপি-পরা, তার নীচে কালো হাঁ-এর মতো গর্ত দেখে—আমি স্পষ্ট টের পেলাম আমার ভিতরে কী একটা গোলমাল হয়ে গেল। আমার এক হাতে কলম ছিল, অন্য হাতে পোস্টকার্ড—দু-হাতে দুটো জিনিস! কিন্তু আমি কোন্‌টা ডাকবাক্সে ফেলবার জন্য এসেছি কিছুতেই ঠিক করা গেল না ; কোন্‌টা কী—এই বাক্সের সঙ্গে কোন্‌টার সম্পর্ক রয়েছে ভেবে না পেয়ে আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। ভাবলাম, অল্প পরেই এই ধোঁয়াটে ভাবটা কেটে যাবে। কিন্তু কাটল না—আমি কলম ও পোস্টকার্ড—দুটো জিনিসের কোনোটাকেই চিনি বলে মনে হল না। ভাবছিলাম কাউকে ডেকে জিজ্ঞেস করা যায় কিনা, 'মশাই, দেখুন তো আমার দুহাতে দুটো জিনিস—এর মধ্যে কোন্‌টা ঐ বাক্সে ফেলা উচিত!' কেউ পাছে আমার ঐ অবস্থা লক্ষ্য করে এই ভয়ে [···]

গল্পটা অবান্তর এখানে, বলেছিলাম শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের বর্ণনা পড়লে বোঝা যায় যে অস্তিতার দর্শনে যাকে আশঙ্কা বলে তার স্বরূপ তিনি জানেন। শুধু কর্মে নয়, অনুভূতিতে, ও জ্ঞানে মানুষকে যে নিরূপণের দায়িত্ব নিতে হয়, অনুভূত জগতের ভিত্তিহীন ইমারত যে অনুভাবীর প্রাক্তন নির্ণয় ও সিদ্ধান্তের উপর চেপে রয়েছে বোঝা হয়ে, নির্ধারণগুলো যে নিরন্তর নিষ্ঠার অপেক্ষা রাখে, ক্ষণিক শৈথিল্য মাত্রেই যে ধস নামবে—উদ্ধৃত বর্ণনাটির মর্মে এই বিশ্ববীক্ষারই সাক্ষাৎ মেলে। অথচ বর্ণনাকারী আস্তিক, আর এদিকে কর্মে জ্ঞানে অনুভবে অস্তিতায় নিরূপণ ও দায়িত্বের ভূমিকা, নিরূপণস্রোতে ভেসে থাকা অমূলক জগৎ, প্রাক্তন নিরূপণ বাতিল হয়ে গেল সে-জগতের বিলয়, আশঙ্কা প্রভৃতি উপকরণ মিলিয়ে হালের অস্তিত্ববাদের দার্শনিক কাঠামোটির রচয়িতা সেই সার্ত যে ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, সেকথা এ-লেখার প্রথমেই বলা হয়েছে।

কেবল ভগবান আছেন কি নেই এ-প্রশ্নটি বাদে আর সব ব্যাপারে শীর্ষেন্দু আর সাত্রের বিশ্ববীক্ষা মেলে—এ-কথাটা মজার শোনাতে পারে, কিন্তু অস্তিত্ববাদী মহলে এরকম আপাতমৌল বিভেদ শুধু অ-বিরল নয়, প্রত্যাশিত। একাধিক সমীক্ষক মনে করেন সাত্রের সবচেয়ে অতুচ্ছ কৃতিত্ব এই যে তিনি কীর্কেগর্ডের (Kierkegaard) দার্শনিক রেখাচিত্রটিকে স্পষ্ট পরিভাষার সাহায্যে এমন একটা গোছাল মত হিসেবে আকার দিয়েছেন যেটা বুঝে যাচাই

করে দেখা অপেক্ষাকৃত সহজ; অথচ যাঁর নাকি সার্ত-যোগ্য ভাষ্যকার সেই কীর্কেগর্ড স্বয়ং যথেষ্ট উগ্র আস্তিক ছিলেন। এরকম কেন হয় সে-প্রশ্নের একটা পুরোনো জবাব আছে। কীর্কেগর্ড বলতেন, (অন্ধকারে লাফিয়ে না পড়ে উপায় নেই, হয় বিশ্বাসের, নয়তো অবিশ্বাসের দিকে; একটা পথ বেছে নিতেই হয়, যারা নেয় না তারা ভীতু।) সুতরাং নির্ভীক অস্তিতাবাদীরা একটা কোনও রাস্তা ধরবেই। রাস্তা যখন দুটো, তখন আপাতভাবে দু দলে ভাগ হয়ে ওরা যাবেই। বর্তমান প্রবন্ধে দেখানোর চেষ্টা করব যে কীর্কেগর্ড-বর্ণিত হয়-নয়ের মোড়ে পৌঁছে অস্তিতাপথের পান্থ কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সেখানে দাঁড়িয়েই ছিলেন, হয়ের গহ্বর কিংবা নয়ের অতল কোনোটাতেই ঝাঁপ দেন নি।

আমি সুধীন্দ্রনাথের কবিতাগুলোকে পদ্যে লেখা দার্শনিক প্রবন্ধ বলে ভুল করছি না, তাঁর লেখার শিল্পগুণের প্রতি দেখাচ্ছি না বিন্দুমাত্র উপেক্ষা। 'সান্দ্র আলসে কাটালেম দিনগুলি, উপভোগে গেছি বেদনার রীতি ভুলি'-র মতন অবিশ্বাস্য শ্লোক লিখে যে কবি 'বেদনা' থেকে নিংড়ে নিতে জানেন শব্দটির প্রাক্তন ব্যঞ্জনা, তাঁর রচনাবলীর শুদ্ধ নান্দনিক আলোচনা কতখানি কাঙ্ক্ষণীয় না বললেও চলে। কিন্তু সম্পূর্ণতা অভীষ্ট হলে সুধীন্দ্রনাথের কবিতার সেরকম আলোচনাও দর্শনের দিকে খানিকটা ঝুঁকবেই; কারণ 'দশমী'র কথা যদি ছেড়েও দিই, ওঁর বেশির ভাগ কবিতার বিষয় রীতিমতো বিমূর্ত: দৃশ্যত-যেখানে তা নয়, যেমন উল্লিখিত 'প্রতিধ্বনি' কবিতাটিতে, সেখানেও গভীর তত্ত্বের ইঙ্গিত আবিষ্কার করতে কষ্টকল্পনার দরকার পড়ে না। দার্শনিক অনুষঙ্গ এড়ানো যাচ্ছেই না যখন, বিশেষত প্রতিভাবান বাঙালী কবিদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ যখন অস্তিতাবাদের অনন্য প্রতিনিধি,* তখন তাঁর কাব্য যে দার্শনিক প্রতিবিন্যাসের অভিব্যক্তি সেটা ঠিক কী রকম এ নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত হওয়া বোধ হয় ভালই।

---

* লেখকের এই বক্তব্যে মতান্তর স্বাভাবিক। কারণ সুধীন্দ্রনাথ ১৯৪৭ সালের ১৪ জুলাই এম. এন. রায়কে লেখেন, 'অস্তিতাবাদ কী বলতে চায় বা সার্ত-প্রচারিত এথিকস কী,' তা তিনি উপলব্ধি করতে পারেননি। অবশ্য সুধীন্দ্রনাথ সার্ত্রের কয়েকটি নাটক পছন্দ করেছিলেন। সুধীন্দ্রনাথ সচেতনভাবে অস্তিতাবাদ বাতিল করলেও তাঁর অবচেতন মানসিকতা ওই দার্শনিক মতবাদের শিকার হয়েছিল কিনা, তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই বিতর্ক উঠতে পারে। —সম্পাদক।

সুধীন্দ্রনাথ ক্ষণবাদী ; অর্থাৎ তাঁর মতে নিমেষে তামাদী হয়ে যায় আমাদের ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ তথ্য, তাতে যার জের, সে-সংসারও, এই যে উধাও লহমা তাঁর কবিতায় সর্বত্র উপস্থিত সে কখনও চাক্ষুষ নয়, কাজেই স্পষ্টতই মানুষের প্রমা পদরেখা পর্যন্ত, অনুমানের ওজন সবটুকুই ফেরারী কপোলকল্পনা কিংবা যুক্তিতর্কের ভার। অন্যান্য রচনার সাহায্যে 'উপস্থাপন'-এর এই ভাষার জট যতদূর ছাড়ানো যায় তাতে বাক্যটির ভাষ্য দাঁড়াবে অনেকটা এইরকম : সুধীন্দ্রনাথ বলছেন, 'এই মুহূর্তে যা প্রত্যক্ষ করছি কেবল সেটুকুই আমি হলফ করে বলতে পারি যে সত্যিই আছে। সুতরাং কোনও কিছুর অস্তিত্বই আমি মানতে পারি না, কারণ ব্যাপারগুলোর অতীত ও ভবিষ্যৎ স্থিতি সম্বন্ধে একেবারে অনিশ্চিত থাকলে বড় জোর তাৎক্ষণিক অস্তিত্বের কথাই ভাবা চলে, সেটার আবার কোনও মানে হয় না—'ছিল' আর 'থাকবে' জুড়লে তবেই তো বলা যায় যে 'আছে'। অতীত ভবিষ্যৎই যখন টিকছে না, সে-দুটোর সাথে বর্তমানকে মিলিয়ে যে বুঝতে পারি সময়টা কেটে যাচ্ছে, একথাটা সুদ্ধ জোর করে বলবার জো নেই। সময়, হয়তো কাটছে না, জগৎটা হয়তো টিকে নেই, অন্তত থাকলেও সে-খবর পাবার সৌভাগ্য হবে না আমার। ঠিক-ঠিক জানার যা একেবারে উল্টো সেই খোয়াব, জগতের আত্মসংগতির উপর সেই ভিত্তিহীন আস্থা, এছাড়া আমার একমাত্র ভরসা এ-মুহূর্তটুকুর প্রত্যক্ষ অনুভূতি, আমার অনন্য প্রমা।'

বেঁচে আছেন কিনা এ-খবরটুকু পর্যন্ত যিনি সঠিক রাখেন না তিনি বাঁচেনই বা কী করতে, কী নিয়েই বা বাঁচেন। জবাব মিলবে 'আর্কস্ট্রা'য় : অতীত ভালবাসার স্মৃতি তাঁর সম্বল। কোনও এক মহিলার প্রেমে ক্ষণিকের জন্য সুধীন্দ্রনাথ মানে খুঁজে পেয়েছিলেন, থেমেছিল কালের চিরচঞ্চল গতি। সে-নিমেষ ফিরবে না আর, পুনর্মিলনের আশা কেবল প্রেমার্ত কল্পনা, 'সে আজ আর কারে ভালবাস'লেও কিছু বলার নেই ; কিন্তু 'কোটি মন্বন্তরে আমি' যে 'কভু ভুলিব না,' এটুকু নিশ্চিত থাকলেই তার উদ্ভাসে অর্থময় সারা বিশ্ব, এমনকী একরঙা জীবনের দিনানুদৈনিক যাপন সুদ্ধ অর্থময় ('অর্কেস্ট্রা'র 'অনুষঙ্গ' এখানে প্রাসঙ্গিক)॥

অতীতের অস্তিত্বই যিনি অস্বীকার করেন স্মৃতিবাদী হওয়া তাঁর সাজে না, কিন্তু সুধীন্দ্র-মানসের বিবর্তনে এই বিসংবাদের উৎস খোঁজা বৃথা : 'অর্কেস্ট্রা'য়ও খুব স্পষ্ট বৈনাশিক-ক্ষণবাদী কবিতা মেলে, যেমন 'কস্মৈ দেবায়', 'পণ্ডশ্রম'

'দৈন্য', ব্যাপারটাকে যে দ্বন্দ্ব হিসেবেই দেখতে হবে তার প্রমাণ রয়েছে, 'উত্তরফাল্গুনী'তে। 'ডাক' কবিতাটির বিষয় সংক্ষেপে এই: প্রেয়সীর চোখে সেই মুহূর্তের-জন্য তিনি তারার প্রতিচ্ছায়া দেখে থাকলেও, যৌন জাদু যে নশ্বর, তাতে অমৃত যে নেই, এ-কথা বুঝেছিলেন সে-দিন, আজও বোঝেন; তবু সেই মুহূর্ত বার বার আসে, আবিষ্ট করে, বুদ্ধির পাত্র ছাপিয়ে উপচে পড়ে; কবি বুঝতে পারেন, প্রকৃতির দেওয়া ভূমানন্দ মেকী তো নয়ই, বরঞ্চ সত্য কেবল দেহের দয়াতেই মেলে; অনুভব করেন, তারার প্রদীপ জেলে তাঁকে প্রাচীন সংকেতে ডাকছে সে নিরাকার নিখিল অন্ধকার যাতে দুর্গ্রহ সব তত্ত্ব ওতপ্রোত। মানুষের বিয়োগধর্মী চৈতন্য শুধু না-এর খবরই রাখে, হ্যাঁ-এর ঠিকানা জানে কেবল শরীর, মনকে সে নির্বাণের পথ দেখায় এই শর্তে যে একটুও পণ্ডিতি ফলানো চলবে না—'ব্যবধান' কবিতায় এ-বক্তব্য ছাড়া আরও আছে প্রতিপ্রাকৃতিক মানুষ কী করে প্রকৃতির প্রাচীন সংকেত বোঝে তার স্পষ্ট নির্দেশ: 'মোদের বিশ্লিষ্ট আত্মা জাতিস্মর দেহের ইঙ্গিতে প্রাক্তন প্রবৃত্তিপথ খুঁজে পেয়েছিল'। এই যে-জাতিস্মর দেহেরই কাছে অমরার চাবি পড়ে থাকলেও থাকতে পারে, কোন্ নৈসর্গিক স্মৃতির পুঁজি তার নির্ভর জানতে হলে 'তন্বী' থেকে সুধীন্দ্র-মানসের বিবর্তনের পরিচয় পাওয়া দরকার, কারণ সে-পশ্চাৎপটে রাখলে তবেই 'দশমী'র মিশরী লিপির পাঠোদ্ধারের কথা ভাবা যায়। বিবর্তনের আলোচনায় কবিতাগুলোর রচনাকালের সূচন (বছর-মাস-দিন: ২৯-১০-০১ মানে উনিশ শ উনত্রিশ সালের অক্টোবরের পয়লা তারিখ) বিরক্তিকর হলেও অপরিহার্য, কেননা 'অর্কেস্ট্রা', 'ক্রন্দসী' আর 'উত্তরফাল্গুনী' খানিকটা আন্তর্লম্বী, সন-তারিখের হিসাবে বই-তিনটি পরস্পরের বেড়া টপকায়।

'মহাসত্য' (২৯-০৮-১৩) আর 'হৈমন্তী' (২৯-১০-০১) কবিতায় যথেষ্ট বিশদ অভিব্যক্তি পেয়েছে 'তন্বী'-'অর্কেস্ট্রা' পর্যায়ে[২] সুধীন্দ্রনাথে প্রতিন্যাস: প্রকৃতি আর প্রেম তাঁকে যা দিচ্ছে তা যদিও ক্ষণিক, বুদ্ধির বিচারে যদিও মেকী, তবু সেটাই আসল, পরম কাম্য, প্রেমের উদ্ভাসে তিনি যে পৃথিবীকে নতুন চোখে দেখেছেন এতেই তাঁর চরিতার্থতা, সে-স্মৃতিই মহাকালের বিরুদ্ধে তাঁর আয়ুধ ('পুনর্জন্ম' ২৯ ১০ ১২, 'অনুষঙ্গ' ৩০ ০৪ ১৪)। এই প্রতিন্যাসের গোড়াতেই যেহেতু দোটানা তাই সংশয় আর নেতি মাঝে-মাঝেই উচ্চারিত: 'নিরুত্তর শূন্যেরে শুধাই [···,] যে-অনুকম্পন বুলাল অমৃতযোগে চারিচক্ষে

পরম চেতন, 'সে কি মাত্র উপপাত, মূলে তার কোনো অর্থ নাই' ('জিজ্ঞাসা'য়) 'সর্বস্বান্ত মর্মে শুধু প'ড়ে রবে অবেদ্য অভাব' ('ভবিতব্য')। এই প্রাতিস্বিক চক্রব্যূহ থেকে কবি বেরোবার প্রয়াস পেলেন 'অমৃত' কবিতায় (৩১ ০৩ ১৩)। এই প্রথম তিনি মুক্ত স্বরবৃত্ত ছন্দে লিখলেন। স্বরীতি অর্জনের এই প্রথম তাঁর লেখায় মানবিক বহির্জগৎ বাস্তবিক প্রবেশ করল: 'হৈমন্তী'র চেয়ে স্পষ্টতই খাঁটি এ-কবিতার অব্যবহিত অনুজ 'ক্রন্দসী'র 'বর্ষশেষ'ও একই মেজাজ আর ছন্দে রচিত (৩১ ০৩ ১৪)। পাঁচ মাস বাদে লেখা 'শাশ্বতী'তে কবি তাঁর স্মৃতিজীবী ও ক্ষণবাদী সত্তার প্রথম আর শেষ সার্থক সমন্বয়ের খুব কাছে এসেছিলেন, কিন্তু অচিরেই তাঁর মন ফের 'ধিক্কার'-এ বিষিয়ে উঠল নিজের নিরর্থতার কথা ভেবে। কবির এ-পর্যন্ত বিবর্তনের কাব্যরূপ ধরে নিয়ে পড়লে 'অর্কেস্ট্রা' কবিতাটি হয়তো ততখানি বিফল মনে হবে না যতটা স্বতন্ত্র মনে হবে কবিতা হিসেবে।

কালের বিচারে 'অর্কেস্ট্রা'র পরবর্তী 'নাম' -এ যদিও দেখি যে ঘুমে বা সজীব প্রতিবেশে আত্মবিলোপের পথে ব্যূহভেদ এখনও অভিমন্যুর সাধ্যে কুলায় নি, তবু এক বার প্রতিবেশ ঘুরতে যিনি বেরিয়েছেন তাঁর কিছু কাব্যপ্রয়াস পরিক্রমী হবেই, তবে আপাতত আলোচ্য সেইসব দিক্‌প্রদর্শী কবিতা যেগুলির পরম্পরায় কবির মনের বিবর্তন প্রকাশ পেয়েছে। 'কাল' (৩২ ০১ ১৯) কবিতায় শুনি স্মৃতির গোলাঘর থেকে সব কিছু লুটে নিয়ে গেছে মহাকাল, অবশ্য কবির জগতের স্মৃতিময় ভিত টলে ওঠায় তিনি যখন অধুনায় আশ্রয় খুঁজেছিলেন এটা সেই সময় থেকেই ছিল অবধারিত। আধান-হারানো স্মৃতি আবার স্পন্দিত হল বৈদান্তিক বন্ধুর আশ্বাসের প্রতিক্রিয়ায় (৩২ ০৬ ১৪ 'প্রতর্ক'), কিন্তু অভেদ্য চক্রব্যূহ থেকে বেরোবার এ-সব প্রয়াসের নিরর্থতা নিয়ে আক্ষেপ 'সমাপ্তি'তে (৩২ ০৬ ৩০) রীতিমতো শ্বাসরোধী। 'বিরাম'-এর (৩২ ০৭ ০৪) ব্যাখ্যা তর্কসাপেক্ষ: 'সাঁচ্চা কেবল হালকা হাওয়া বক্ষে পুঁজি করা' পঙক্তিটি বিষ্ণু দের 'হালকা হাওয়ায় হৃদয় দু'হাতে ভরো'-র তির্যক প্রতিধ্বনি[৩], না 'পশুর মতো মনের বালাই ঝেড়ে ফেলে বাঁচা'-কেই কবি মেনে নিচ্ছেন বা নিতে চান? প্রথম বিকল্পের প্রতি পক্ষপাতের সমর্থন যোগায় এদিকে 'সমাপ্তি' আর ওদিকে 'জাদুঘর' (৩২ ০৭ ২৭)-এর অভিন্ন মেজাজ।

'দ্বন্দ্ব' (৩২ ০৯ ০৪)-র যার পূর্বাভাস মেলে পরবর্তী সেই মোড়ের ফলক 'জাতিস্মর' (৩৩ ০২ ০৮): জুলাই থেকে ফেব্রুয়ারির মধ্যে কোনও এক

বোধের সাক্ষাৎ মিলেছে যাতে উপজ্ঞা আর বুদ্ধি সমন্বিত, প্রাণের বেঁতোয়াক্কা আচরণ বিষয়ে মন রচনা করে নিয়েছে চলনসই যুক্তিনির্ভর ব্যাখ্যা, কতকটা এই ধাঁচের: সংস্কৃতিমান মানুষের জৈব কামনায় যে দায়ভাগের জের, শিকড় তার প্রাকৃত তিমিরে', বিগত জন্মের সে, নীরব, প্রাগিতিহাসিক। এমন সহজবোধ্য, প্রায় মামুলী, অনুভূতি পাঠকের হৃদয়ে অবিকল তীব্রতায় পৌঁছে দেওয়া শক্ত কাজ: 'বসুন্ধরা'য় রবীন্দ্রনাথের ব্যর্থতা স্মরণীয়। সুধীন্দ্রনাথের আপেক্ষিক সাফল্যের মূলে রয়েছে, প্রকরণের উপর দখল ছাড়াও, পরিমিতিবোধ —উপযুক্ত পটভূমিতে অবগ্রহ রচনা করে কবি প্রাকৃসাংস্কৃতিক ছায়াছবি অভিক্ষেপ করছেন, মূর্ত হয়ে উঠতে না উঠতেই প্রেক্ষাগৃহে ঢুকতে দিলেন ভোরের আলো, সম্মোহ যায় কেটে: পূর্ণ সে-মিলন আধুনিক মানুষের নাগালের বাইরে, 'সামান্যাদের সোহাগ'ই তার সম্বল। বর্তমান আলোচনায় যা প্রাসঙ্গিক তা হল, যে-প্রাণপ্রবৃত্তির আদিম ভূমি থেকে মানবিক চেতনার উদ্ভব, প্রেতের পোষাকে সুধীন্দ্র-মঞ্চে সেই আদিম নিশ্চিন্ত নৃসত্তার প্রথম প্রবেশ। সুধীন্দ্রনাথ ইঙ্গিত করছেন, আধুনিক মানুষের সংস্কৃত চিন্তা ও অনুভূতির ভিত্তি যে-শারীরিক ঘটনাবলী এবং ক্রিয়াকলাপ, তার আবহে নিহিত দেহসর্বস্ব মৌলতার অনুসঙ্গের জোরেই সেই ঘটনাকলাপ পরিচয় অর্জন করে; মার্জিতরুচি জনপদবাসী যদি ব্যর্থতাবোধ কাটাতে চায় তবে নিজের জৈব বিবর্তচেতনার কাছে নিতে হবে তাকে সাযুজ্যের দীক্ষা। এভাবে বলায় ব্যাপারটা মার্কসীয় ভিত-ইমারতী কারবারের মতো শোনাচ্ছে, কিন্তু আসলে প্রাসঙ্গিক এখানে প্রতিমানের সার্ত্রীয় রূপণ ('সত্তা ও অভাব', প্রথম অধ্যায়, তৃতীয় ভাগ)। অনুভব করছেন সুধীন্দ্রনাথ, শারীর মিলন যতটা তীব্র, মন দিয়ে ভালবাসা কিছুতেই তেমন ঐকান্তিক হয় না। এই অভাববোধের প্রতিবেদনা বা উহ্য ভিত্তি যে-যথার্থ মিলনের কল্পনা, সে-প্রতিমান্ এত দিন বিমূর্ত অবস্থায় তাঁর প্রাণের স্থিতির ভিত্তিনাশ করছিল, আদিম মানব-মিথুনের মূর্তিকল্পে সে এবার অধিষ্ঠিত, অব্যক্ত প্রতিমানকে সুধীন্দ্রনাথ পেরেছেন প্রায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এমন রূপ দিতে যার বাসস্থান দৃশ্যত অতীত, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে প্রেতলোক।

'নিরুক্তি' (৩৩ ০৪ ০৮)—তে সোহংবাদের দিকে কবির দার্শনিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অনুভূতিনিচয়ের উপর যে-প্রেতের প্রভাব বিস্তার নজরে আসে সে-প্রেতের স্বভাব কিন্তু কিন্নরের চেয়ে যক্ষের সঙ্গেই বেশী মেলে: 'অমূর্তযোগে প্রেতের কানাকানি'। 'মৌনব্রত' (৩৩ ০৪ ১৬) জোর দেয়

ভাষার অনিবার্য নিরর্থতার উপর : 'নীরবতা অক্ষয়, অমেয়'। আরও এক ধাপ এগিয়ে কবির মনে হয় বিশ্রব্ধ-বাক্য-ময়ী প্রেয়সীর সাথে তাঁর 'ব্যবধান' (৩৩ '০৫ ০২) একটা ভাষার দেওয়াল। নিশ্চিন্ত নির্বাক অনামিকার সাথে অবিকল সাযুজ্যের স্মৃতিপূর্ণ এ-কবিতার মেজাজ কতখানি নতুন তা সম্যক বোঝা যায় তৃতীয় স্তবকের সঙ্গে 'শাশ্বতী' বা 'নাম' মিলিয়ে দেখলে। এই পশ্চাদ্‌ভূমি থেকে বিচ্যুত করে পড়লে 'অহৈতুকী'র আক্ষেপ (৩৩ ০৭ ১২) কী নিয়ে, তা আন্দাজ করা সত্যিই কঠিন।

নিশ্চিন্ত নির্বাক অনাম পুরুষ প্রকৃতির সেই স্বভাবের অংশীদার যা বুদ্ধির অগম্য কিন্তু প্রাণকে টানে, কাজেই যাঁর প্রতিমান এই নৃসত্তা বোঝা-ই যায় তিনি কেন ঝুঁকবেন প্রকৃতিতে আত্মনিমজ্জনের দিকে ('লঘিমা' ৩৩ ০৭ ১৫)। সে-নির্বানের ইন্দ্রিয়রূপ যদি নিদ্রা হয় তবে তার স্বরূপ স্পষ্টতই মৃত্যু ('মরাতরণী' ৩৩ ০৭ ২৮, 'মহানিশা' ৩৩ ০৮ ০৩)। যে-নিরর্থ সংসার থেকে কবি মুক্তি খুঁজছেন প্রেমে, তার স্মৃতিতে, অবিকল স্মৃতিতে, আদিম স্মরণে, মৌল স্বভাবে, মৃত্যুর মধ্যে, সে-সংসার তীব্রতম ঝঙ্কার জাগায় তার বাঙ্ময়, সামাজিক মূর্তনে : ভিড়ের সংসর্গ সুধীন্দ্রনাথ সইতে পারেন না, জন সঙ্ঘ তাঁর বিভীষিকা ('প্রতীক' ৩৩ ০৯ ০৭)। 'প্রতীক'-এ এই ধ্বংসস্তূপের ইতিবৃত্ত লিখে সুধীন্দ্রনাথ বলছেন, উপকরণ হাতে না এলে তিনি যদিও নিজে যোগাড় করে নিতে পারবেন না, তবু এ থেকে একটা কিছু তো গড়তে হবেই। গঠনী সংকল্পের বিক্ষিপ্ত বহিঃপ্রকাশ পাই তেত্রিশ সালের 'প্রতিদান' ০৭ ১৮, 'দুঃসময় ০৮ ০১, 'প্রশ্ন' ০৮ ০৪, 'সন্ধান' ১০ ১২ ও 'জন্মান্তর' ১১ ০১ কবিতায়, কিন্তু ব্যবস্থিতি সংহর্তির লক্ষণ ('অনমুতপ্ত' ১১ ০৫) দেখা দিতে না দিতেই ধস নামল ফের ('নরক' ১১ ০৯)। পরের পাঁচটি কবিতা (বিলয়, সৃষ্টি রহস্য, জাগরণ, ডাক, ভাগ্যগণনা) যে-ঢেউএর অভিব্যক্তি তাতে আগের উপাদানগুলোই ফিরে ফিরে আসে : সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথের-মন্তব্য তাঁর নিজের এ-পর্যায়ের কাব্য সৃষ্টি বিষয়ে প্রায় আক্ষরিকভাবে প্রযোজ্য।

পাঁচ বছর অজ্ঞাতবাসের পর আবার যখন কবি আত্মপ্রকাশ করলেন তত দিনে অনুচ্ছায়ী প্রেতের স্বরূপ গেছে পালটে : 'নান্দীমুখ'-এর প্রেত (৩৮ ০৭ ২৭) আর আদিম নয়, মৌল হলেও অন্তত সমকালের পটে মূর্ত। সমরবিধ্বস্ত নগর ঢুকেছে সুধীন্দ্র-কাব্যজগতে, তাঁর প্রাতিস্বিক বিপর্যয়কে তিনি দেখছেন সকলের সর্বনাশের পটভূমিতে। জাতির ইতিহাসের গতি বিষয়ে চিন্তায় তাঁকে

বাধ্য করল সমসাময়িক বীভৎসতা, ভেবে তিনি এই ধরনের মতে পৌছলেন : প্রকৃতির মতো মানবজগতের ঘটনাসমবায়েরও এমন এক অন্ধ নিজস্ব ছন্দ রয়েছে যার রহস্যমোচন ব্যক্তিচেতনার অসাধ্য এবং যার গতি তমোমুখী, আর এই অদৃষ্টের সঙ্গে বিশ্বনিয়তির একটা কোনও সাজশ রয়েছে, উভয়েই কৃতান্তস্বরূপ ; এই বিরূপ বিশ্বে সোহংবাদ ও ক্ষণবাদ যেমন অনস্বীকার্য, কর্মে অনাস্থার পক্ষেও তেমনই কোনও যুক্তি মেলে না। বুদ্ধির বন্ধ্যতা, জৈব দায়ভাগের তমসা এবং বিনাশমুখী ইতিহাস মানা করে ভালবাসতে, তবু জাতিস্মর অভিমন্যুর যোঝা ভিন্ন গতি নেই। কখন অলক্ষিতে সঙ্গিনী অন্তর্ধান করেছে, তার ভাবনা অবান্তর।

এই অসম্ভূত অসমর্থিত তবুর অভিব্যক্তি 'জেসন'-এ সবচেয়ে স্পষ্ট, অপেক্ষাকৃত আগের দিকে লেখা হলেও এখানেই 'সংবর্ত' আর 'দশমী'র সন্ধিস্থল। 'দশমী'তে সুধীন্দ্রনাথ আবার বাঁচার রসদ খুঁজছেন সেই বহির্জগতে যাকে চিনতে জীবনটা গেল কেটে। আপাতভাবে তাই 'উত্তরফাল্গুনী' পর্ব তুলনীয় মনে হতে পারত, কিন্তু ভফাতগুলো বড্ড চোখে পড়ে—এখানে বয়স্ক অবহিত কবি, একা, নিরুচ্ছ্বাস, অধুনায় পরিপার্শ্বে তন্ময় হয়ে খুঁজছেন নিজের অনাম সত্তার, সত্তা নয় স্বভাবের, পরিচয় ('প্রতীক্ষা', 'ভ্রষ্ট তরী')। এ-অন্বেষণের ব্যর্থতা অবধারিত; তবু তাঁকে খুঁজতেই হবে। কোন্ প্রাপ্তির প্রতিভাস তাঁকে প্রেরণা যোগাত, সে-কথা 'নৌকাডুবি'র অন্তিম স্তবকে লেখা আছে : 'তথাচ অভাবে যবে তলাবে নাবিক, তখনই তো স্মৃতির বিদ্যুতে পাবে সে নিজের দেখা, তার পরে মিশে আদিভূতে হবে স্বাভাবিক', সে-স্মৃতি তামসিক না হতেও পারে এমন ইঙ্গিত দেয় 'ভূমা' আর 'উপস্থাপন' : কোনও রহস্যময় উপায়ে মস্তিষ্কের আয়ত্তি নাকি শোণিতে সংক্রামিত হয় বংশানুক্রমে।

নানা রাস্তা ঘুরে উনিশ শ ছাপ্পান্ন সালে সুধীন্দ্রনাথ সেই দশায় উপনীত হয়েছেন যেখানে বিশ্বমানবের উপর, নিজের দেখা পাবার প্রকল্পের প্রতি, ঈশ্বরের অস্তিত্বের সম্ভাবনায়, তাঁর আস্থা ও অনাস্থা অসমাপ্ত প্রতিদ্বন্দ্বে রত। পরিক্রমার পথে তাঁর যে-বিশ্ববীক্ষা গড়ে উঠেছে তাতে কীর্কেগর্ড-সার্ত্রে'র সাথে এই পর্যন্ত মেলে : ঈশ্বর না থাকতেও পারেন, স্বৈর সৃষ্টি হয়তো আজন্ম অনাথ, আপাতত সুধীন্দ্রনাথ আছেন একা এবং এখন ; নিজেকে পরিপূর্ণরূপে অর্থাৎ গোটা জগৎকে, জানতে পারলে অর্থাৎ স্বপ্রতিষ্ঠ আত্মা কিংবা ভগবান হতে পারলে ব্যাপারটা অনেক সুবিধের হত, এ বিষয়ে তিনি সার্ত্রে'র মতোই

সচেতন, কাজেই চেষ্টায় তাঁর কার্পণ্য নেই। অন্য দিকে সার্ত্রের মতো তিনি নিজের আসল সত্তাটাকে বিদেহ মনে করেন না; তাঁর ধমনীতে, তিনি জানেন, সমুদ্রের জল আর যথেচ্ছ পরমাণু নয়, সান্দ্র রক্ত বইছে যুগযুগান্তের বাঁচার ঐতিহ্য নিয়ে; তাঁর সমাজ, তিনি নিজেও, জানেন সুধীন্দ্রনাথ, প্রকৃতিবিধানের মতোই রহস্যময় অন্ধ নিয়তির অধীন, গড্ডলিকায় ভেসে যাবার ঝোঁক তাঁর স্বভাবে বদ্ধমূল; স্বাধীনতা এমনিই আসে না তাকে অর্জন করে নিতে হয়। সার্ত যেকালে বলে থাকেন অমৃতের অংশীদার চেতনা স্বেচ্ছায় তমসাবৃত হয়ে ব্যক্তিত্বে রচনা করে, তার কর্তব্য ঈশ্বরপিপাসা মেটাবার জন্য প্রকল্পের পর প্রকল্পে আন্তরিকভাবে জড়িয়ে পড়া এবং এই কর্মের উদ্‌ভাসে পরিপার্শ্বকে তাৎপর্য দেওয়া, গোটা ব্যাপারখানা নিরর্থ জেনেও এইভাবে চালিয়ে যাওয়া শূন্যতার সয়ে দিনরাত, সেক্ষেত্রে (সুধীন্দ্রনাথ চেতনার ভিত্তিতে স্থান দেন, ধাতব নয়, জৈব অস্তিত্বকে, বলেন আত্মসচেতন সোহংবাদী মন পড়ে আছে উৎকাঙ্ক্ষা আর অবকর্ষের দোটানায়, একটা কাম্য অন্যটা প্রমিত; পৃথিবীর জমিতে আকাশকুসুম ফোটানার আপ্রাণ চেষ্টায় কিছুক্ষণ সে স্বভাবের বিরুদ্ধে চললে স্বভাব ফের যখন তাকে হারিয়ে দেয় তখন তার মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এসব কাণ্ডের কোনও লহমা-পেরনো মানে নেই, সব বুজরুক্রি; স্বাভাবিক বলেই এই ঝোঁকের সঙ্গেও তার লড়াই, যদিও অনবরত ইচ্ছে হবে আপসের, মিটিয়ে ফেলার, জুড়িয়ে যাওয়ার; এই স্বীচিকীর্ষা, এই মেনে নেবার প্রবণতা তার বন্ধুও বটে, শত্রুও। এর তাগিদেই মনোরথের চাকা ঘোরে, একে বুঝতে বুঝতেই মেয়াদ ফুরোয়, মনে হয় প্রতিমায় এ যদি ভর না করে তবে শূন্যগর্ভ সে-মূর্তির কপালে কারও পুজো জুটবে না, অবিরাম নেশার সাহায্যে স্বস্থ স্বীচিকীর্ষার বিরুদ্ধে যুঝে না যাবার শাস্তি মানসিক জাড্য।

এই অস্থায়ী বন্দোবস্তই সুধীন্দ্রনাথের বাঁচার প্রণালী; কীর্কেগড' ধাঁচের চিরস্থায়ী ব্যবস্থায় উনি বিশ্বাস করতেন না। [৪]

টীকা ১। একজিস্টেশিয়ালিজম অ্যানড হিউম্যানিজম। (পৃঃ ৩২-৩৩)

২। 'তন্বী'তে পদ্যের মকশ আর অনুকৃত বাদ দিলে খাঁটি সুধীন্দ্রীয় যা বাকী থাকে তাতে এই প্রতিন্যাসের সূচনাই অনুভূত; বিশেষ করে 'নিকষ' আর 'অভিব্যাপ্তি' প্রণিধানর্হ। 'তন্বী'র সংশয়ী ক্ষণআরাধনা 'অর্কেস্ট্রা'র 'মূর্তিপূজা'র (২৯ ০৫ ০৮) তুঙ্গে পৌঁছবার পর বাদ সাধল অবকর্ষী আত্মচেতনা, অভিব্যক্ত হল 'কস্মৈ দেবায়'র (২৯ ০৯ ১১) অতৃপ্তি: 'তোমার উদীর্ণ

আবির্ভাবে মোর শূন্য পরিপূর্ণ হয় নাই কভু', 'আমার উদ্ধত অর্ঘ্য, প্রেয়সী, তোমার তরে নয়'। হালনাগাদ হিসেব কষলেন 'অপচয়'-এ : যোগফল দাঁড়াল, প্রাণ নিশ্চিত জানে অতীত প্রেমে সে পেয়েছে কোনও পরম সত্যের আঁচলের ছোঁয়া, পথ চেয়ে আছে আবার সে-পরশ পাবে বলে ; বুদ্ধি তর্কে জিতেছে ; স্মৃতি মিথ্যা, পথ-চাওয়া দুরাশা, মানে হয় না কোনও কিছুর, এসব মেনেও কিন্তু প্রাণ পারে না স্মৃতি-দুরাশাকে উড়িয়ে দিতে, তাকে টানে তাই সুনিয়তিতে অন্ধ ভরসা রাখার প্রলোভন। হিশেব স্পষ্টতই অসমাপ্ত : গা এলিয়ে দিয়ে প্রতীক্ষা ছাড়া কি পরম প্রমায় পৌঁছবার আর পথ নেই? উজানের সঙ্গে যুঝে কামের স্বত্ব থেকে নিমেষ ছিনিয়ে এনে সে-নিমেষের কপালে প্রেমের প্রতিপ্রাকৃতিক জয়টিকা আঁকতে পারলে তবেই হয়তো লহমা পরিণত হয় মানুষের অর্জিত মুহূর্তে। 'অর্কেস্ট্রা'-পর্যায়ের 'পুরস্কার' (২৯ ০৯ ১৬)-এর এধরনের ভাষ্য পড়লে বাহ্য নিমেষ ও আন্তর মুহূর্তের কীর্কেগর্ড প্রভেদের কথা মনে না এসে পারে না।

৩। যেমন রবীন্দ্র-পঙক্তির তির্যক প্রতিধ্বনি মেলে 'প্রলাপ'-এর তৃতীয় স্তবকে : 'ভয় নাই, ওরে ভয় নাই'।

৪। 'কালি ও কলম'-এর সুধীন্দ্র-সংখ্যায় এ-প্রবন্ধের একখানা, নামে এক হলেও, বক্তব্য ও বাচনায় আমূল ভিন্ন পূর্বতন সংস্করণ বেরিয়েছিল। সেই থেকে নানা খসড়ার মধ্য দিয়ে লেখাটির ক্রমিক বিবর্তনে যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখ্য অতসী মিত্র, নিরঞ্জন হালদার, শঙ্খ ঘোষ ও সুবীর রায়চৌধুরী।

বুদ্ধদেব বসু

'নৌকাডুবি' : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

'বন্ধু সব মৃত ; — আর নামে না উদার সন্ধ্যা বারান্দায়,
হালকা ভেলা দোলে না উতলঢেউ কথোপকথনে —
খেলা, কিন্তু পরিণামে সামুদ্রিক যান।'

'শরতের সমারোহ প্রকাণ্ড প্রান্তরে' : — পাঠকের মনে একটি গতানুগতিক ছবি জেগে ওঠে — উজ্জলতা, নীলিমা, তৃপ্তি ও সফলতা, এই সব নিয়ে 'শরতের সমারোহ' কোমল চিহ্নের দ্বারা ছবিটিকে ফ্রেমে আটকে দেয়া হ'লো। 'চক্রবালে শুভ্র মেষপাল / নিশ্চিন্তে বেড়ায় চ'রে', — এই মেষপাল কি বীতবৃষ্টি সাদা মেঘ, না কি সত্যিকার চতুষ্পদ প্রাণী? দু-ই সম্ভব, কিন্তু পরবর্তী অংশের সঙ্গে সংগতি রক্ষার জন্য প্রাণী ব'লে ধ'রে নেয়াই ভালো। এর পরেই অনেকগুলি প্রশ্ন জাগে, রাখাল 'বনান্তরে' কী করছে? (সে কি তবে প্রান্তরবিহারী মেষপালের রক্ষণাবেক্ষণ করছে না?) ; সেই 'বনান্তর' স্নিগ্ধ কেন (তা'হলে প্রান্তরটি কি রুক্ষ?) ; সে খুঁড়িয়ে চলে কেন? আর, 'কদাচিৎ' শব্দটি কি বিশেষ্যপদের বিশেষণ, না কি ক্রিয়ার — অর্থাৎ, রাখাল কি আসলে সুস্থ পদের অধিকারী কিন্তু কচিৎ কখনো, কোনো বিশেষ কারণে খুঁড়িয়ে চলে, না কি ঐ 'স্নিগ্ধ বনান্তরে' (যেহেতু বাংলায় একবচন শব্দও বহুবচনের অর্থ ধারণ করে) কদাচিৎ রাখাল দেখা যায়, এবং সেই কচিৎ দৃষ্ট রাখালেরা সকলেই খঞ্জ?

সবগুলি প্রশ্নের উত্তর আমি খুঁজে পাইনি ; তবে এ-মুহূর্তে আমার যা মনে হচ্ছে তা এই। দ্বিতীয় স্তবকে উল্লিখিত পথিকটি 'ভাঙা হাটে' যাত্রা শুরু ক'রে 'খালি গোলাঘরে' তা সমাপ্ত করছে, এর সঙ্গে অন্য, কৃতী ব্যক্তিদের অবস্থার প্রতিতুলনা প্রচ্ছন্ন আছে ব'লে ধ'রে নেয়া যায় ; অতএব অনুমেয় যে প্রথম স্তবকের প্রান্তরটি রুক্ষ নয়, বরং পক্কপ্রায় শস্যে আকীর্ণ ('প্রকাণ্ড' বিশেষণ ও 'সমারোহ' শব্দেও তার ইঙ্গিত আছে), মেষপাল 'নিশ্চিন্তে' চ'রে বেড়াচ্ছে ; ঋতু এখন শমিত ও নির্বিঘ্ন ব'লে রাখালের কর্তব্য বিশেষ কিছু নেই, সে বা তারা (একাধিক রাখালই সংগত) উন্মুক্ত ও রৌদ্রতাপিত প্রান্তর ছেড়ে স্নিগ্ধ (বৃক্ষছায়াচ্ছন্ন) কোনো বনে স'রে পড়েছে, তাদের 'খঞ্জতা' তাদের

কর্মহীনতা বা আলস্যেরই নির্দেশক। 'কদাচিৎ' শব্দটিকে আমি 'রাখাল'-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করছি, 'থোঁড়ায়' ক্রিয়াপদের সঙ্গে নয়; অর্থাৎ, বনে রাখালেরা বিরল, এবং যারা আছে তারা বিশ্রান্ত — অনেকেই হয়তো ছুটি পেয়ে বাড়ি চ'লে গেছে। নিশ্চিন্ত মেষপাল ও কর্মহীন রাখালের উল্লেখে তৃপ্তি ও সফলতার ছবি আরো উজ্জ্বল হ'লো।

'থোঁড়ায়' শব্দের অন্য একটি ব্যাখ্যাও সম্ভব। কবিতাটিতে পর্যায়বদ্ধভাবে অনেকগুলি প্রতিতুলনা ব্যবহৃত হয়েছে; প্রথম স্তবকেই পাচ্ছি প্রান্তরের সঙ্গে বনের, এবং মেষপালের স্বচ্ছন্দ গতির সঙ্গে ('নিশ্চিন্তে বেড়ায় চ'রে') মেষপালকের খঞ্জতার প্রতিতুলনা। পশু নিশ্চিন্ত, কিন্তু মানুষ খঞ্জ; আশ্রিতেরা (অজ্ঞতাবশত) নিশ্চিন্ত, কিন্তু আশ্রয়দাতা (অক্ষমতাবশত) খঞ্জ (ও পলাতক); পরবর্তী স্তবকগুলিতে যে-বৈশ্বিক সর্বনাশ ঘটলো এখানে তারই পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে; রাখালের 'খঞ্জতা'র (বা বিকলতার) দ্বারাই পরে আরো মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হ'লো কবিতার নায়ক; রাখালদের 'বনান্তরে' (বনের অভ্যন্তরে, অন্তরালে) অবস্থান যেন বিশ্বের প্রতিপালকের অভাব সূচনা করছে। এই লেখাটার পাণ্ডুলিপির একজন পাঠক আমাকে মনে করিয়ে দিলেন যে কৃষ্ণও রাখাল, সেই সূত্র অনুধাবন ক'রে এমন অর্থ করা অসম্ভব নয় যে ভগবান সম্প্রতি খঞ্জ হ'য়ে বনের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়েছেন; বিশ্ব অনাথ, এবং শরতের এই 'সমারোহ' প্রতারণামাত্র। (প্রসঙ্গত মনে প'ড়ে যায় যে মহাভারতের কৃষ্ণ একটি বনমধ্যে ব্যাধের তীরে নিহত হন। সেই তীর তাঁর চরণে বিদ্ধ হয়েছিলো।) শ্রী নরেশ গুহ মৌখিক আলোচনা প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্ন উত্থাপন করলেন: রবীন্দ্রনাথের রাখালের সঙ্গে এই রাখালের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা। 'ক্ষণিকা'য় রবীন্দ্রনাথ 'ব্রজের রাখাল বালক' হ'তে চেয়েছিলেন; 'পূরবী'তে ("তপোভঙ্গ") তিনি মহাদেবকে বলছেন 'কালের রাখাল', কিন্তু 'রাখাল' শব্দের সবচেয়ে স্মরণীয় ব্যবহার তাঁর সর্বজনপ্রিয় গানটিতে:

মধ্যদিনে যবে গান বন্ধ করে পাখি,
হে রাখাল, বেণু তব বাজাও একাকী॥
শান্ত প্রান্তরের কোণে
রুদ্র বসি তাই শোনে
মধুরের ধ্যানাবেশে স্বপ্নমগ্ন আঁখি।

('গীতবিতান' ২য় সংস্করণের পাঠ।)

রবীন্দ্রনাথের এই স্তবকে আছে 'প্রান্তর', সেই প্রান্তর 'শান্ত', (ঋতুর পার্থক্য সত্ত্বেও "নৌকাডুবি"র প্রথম দুই পংক্তির আবহ একই ধরনের) রাখাল এখানে স্বস্থ ও বংশীবাদক, এবং ব্যক্তিত্বপ্রাপ্ত 'রুদ্র' (আদিম প্রাকৃত দেবতা) তুচ্ছ রাখালের বংশীধ্বনিতে মনোযোগী। অসম্ভব নয়, যে "নৌকাডুবি" রচনাকালে এই ঈশ্বরপালিত রাবীন্দ্রিক রাখাল সুধীন্দ্রনাথের স্মরণে ছিল; বৈষ্ণব কাব্যে ও রবীন্দ্রনাথে বহুল ব্যবহারের ফলে বাংলা কবিতায় 'রাখাল' এখন 'খঞ্জ' (অচল) হ'য়ে গেছে, ("যযাযি"তে 'রেণু, বেণু, ধেনু,' বিষয়ে মন্তব্য স্মরণীয়) কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ এই রাখালটিকে কবিপ্রসিদ্ধির জীর্ণতা থেকে ছাড়িয়ে এনে একটি নতুন ও বিপরীত অর্থে কাজে লাগালেন। এই আলোচনা আমি এতদূর পর্যন্ত টেনে আনছি এইজন্যে যে 'খোঁড়ায়' শব্দটি বিস্তর ভাবিয়েছে আমাকে; এবং এখন আমার মনে হচ্ছে যে বনান্তরে প্রচ্ছন্ন খঞ্জ রাখালকে অক্ষমতাপ্রাপ্ত অপসৃত ভগবানের চিত্রকল্প হিশেবে গ্রহণ করাটা অযৌক্তিক নয়, কেননা "নৌকাডুবি"র পরবর্তী অংশের সঙ্গে, এবং সুধীন্দ্রনাথের সামগ্রিক জীবনদর্শনের সঙ্গে এর সম্পূর্ণ সংগতি রয়েছে। এভাবে দেখলে আমরা আলোচ্য কবিতার শুধু প্রথম দুই পংক্তিতে শারদীয় (প্রতারক) প্রসন্নতার ছবি পাবো, কবিতার তৃতীয় পঙক্তি থেকেই সূচিত হবে আসন্ন ট্র্যাজেডি।

দ্বিতীয় স্তবকে প্রবেশ করলো কবিতার নায়ক বা অনায়ক; নিঃসঙ্গ, তাকে আমরা প্রথম দেখলাম 'পায়ে চলা পথে' (খেতের আঁলও হ'তে পারে), বুঝে নিতে হবে সে হাঁটছে, 'ভাঙা হাটে' যাত্রা শুরু ক'রে তা শেষ করবে 'খালি গোলাঘরে'। অর্থাৎ, সে কিছুই সঞ্চয় করেনি, এখন পর্যন্ত কিছু উপার্জন করেছে কিনা তাও জানা যায় না; অথচ তার আশা বিরাট ('দু-চোখে সোনার স্বপ্ন') — সোনা: পাকা ধান, প্রভূত ধন, স্বর্ণমৃগ, 'সোনার তরী', সৌন্দর্যের, আনন্দের, অলীকের প্রতীক; এবং সে একেবারে নিঃসম্বল বা নিশ্চেষ্টও নয়; কেননা তেমন সারবান না-হলেও কিছু 'পসরা' তার আছে, এবং হাঁটতে হলেও কিছুটা চেষ্টার প্রয়োজন। কিন্তু অকস্মাৎ, বিনা ভূমিকায়, বিনা আয়োজনে, এবং আপাতত বিনা চেষ্টায় 'পসরার ফাঁকি আর বাকী' হালকা ('অ-গুরু') হ'য়ে গেলো লোকটির কাছে, অন্তর্হিত হ'লো ব্যর্থতাবোধ; কবি যদিও ওখানেই কথাটা শেষ ক'রে দিলেন, তবু সহজেই অনুমেয় যে সে-মুহূর্তে লোকটিকে অধিকার করলে এক দৈব প্রেরণা, সত্তার বিস্তারবোধ, তার পথ চলার এক সার্থক লক্ষ্য যেন প্রতিভাত হ'লো তার সামনে — কবিতা

রচনাকালে, বা রচনার আরম্ভকালে কবির মন থেকে যেমন 'প্রত্যহের ভার' ক্ষণিকের জন্য নেমে যায়, অনেকটা সেই রকম। ('ভাঙা হাট' ও 'পসরা'র পিছনে হয়তো বা ছিলো 'ভাঙা হাটে কে ছুটেছিস / পসরা ল'য়ে?' ('ক্ষণিকা' : "অকালে") এই পঙক্তিটির স্মৃতি; কিন্তু, না-বললেও চলে, এই কবিতার সঙ্গে "নৌকডুবি"র কোথাও কিছুমাত্র সাদৃশ্য নেই।)

তৃতীয় স্তবকের প্রথম শব্দ হিশেবে 'কিন্তু' আমরা সুধীন্দ্রনাথের কাছে আশাই করেছিলাম। 'কিন্তু, বেলা প'ড়ে আসে' : 'সমারোহ' শব্দটির উপর নির্ভর ক'রে ধ'রে নিতে দোষ নেই যে কবিতাটির আরম্ভ মধ্যাহ্নে ('মধ্যদিনে' যবে গান বন্ধ করে পাখি), দিন যখন উজ্জ্বলতম; তৃতীয় স্তবকে সন্ধ্যা পেরিয়ে দ্রুত নেমে এলো রাত্রি ('অমার সরিৎ'); অবশ্য এই সন্ধ্যা ও রাত্রির সাংকেতিক অর্থ খুবই স্পষ্ট। 'দ্রুত উঠে যায় / মহাশূন্যে মাঠের হরিৎ' : 'উঠে' শব্দটি লক্ষ্য করুন; উঠে গেলো, শূন্যে মিলিয়ে গেলো, একটি বায়বীয় ঊর্ধ্বারোহণের ভাব পাচ্ছি এখানে; কিন্তু এই স্তবকেরই শেষ শব্দ হ'লো 'ডোবায়'; দ্রুত পারম্পর্যে দুটি বিপরীত ক্রিয়া সম্পন্ন হ'লো এখানে; আমাদের চেতনায় প্রতিভাত হ'লো আরোহণের পরমুহূর্তের নিমজ্জনের ছবি; একই ক্রিয়ার দুই অংশ, এবং এই দুই অংশ বিপরীত ব'লে কবিতার কঠিন ক্লাসিক বাঁধুনির মধ্য থেকে আমাদের মনে সঞ্চারিত হ'লো অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা। 'নির্ভার আবহে স্ফূর্ত অন্তর্ভৌম অমার সরিৎ / পৃথিবী ডোবায়॥' ; এই অংশের প্রতিটি শব্দ লক্ষণীয়; 'নির্ভার'-এ পূর্ববর্তী 'অগুরু'র ধারণা ফিরে এলো, কিন্তু এবারে তাতে কিছুটা শ্লেষ ধ্বনিত হচ্ছে; যে-নির্ভার আবহে (বাতাসে আর জলকণা নেই, সেই অর্থেও শারদীয় আবহ নির্ভার) লুপ্ত হয়েছিলো অকৃতার্থতার চেতনা ('পসরায় ফাঁকি আর বাকী / সহসা অগুরু')· তাতেই এখন স্ফূর্ত (বিকশিত) হ'লো 'অন্তর্ভৌম অমার সরিৎ'। অন্ধকার নয়, অন্ধকারের নদী; — স্থাণু ও নির্বস্তুক অন্ধকার গতিশীল ও তরল হ'য়ে উঠলো (রবীন্দ্রনাথের 'যেথা অকূল হইতে বায়ু বয় / করি আঁধারের অনুসরণ' তুলনীয়) এবং এই তিমিরবন্যা 'অন্তর্ভৌম', ভূতলবর্তী, অর্থাৎ প্রথম স্তবকে বর্ণিত প্রান্তরের তলে তা আবহমান প্রচ্ছন্ন ছিলো, তার উত্থান ও স্ফূর্তিও অবশ্যম্ভাবী, সেটাই চরম, 'শরতের সমারোহ' ক্ষণকালীন উদ্ভাসমাত্র (এখন বোঝা যাচ্ছে 'সমারোহ' শব্দটি নিতান্ত নিরীহ নয়, তাতে ঈষৎ ব্যঙ্গ ও বেদনা লুকিয়ে ছিল)। 'স্ফূর্ত' শব্দটি সাধারণত আনন্দদ্যোতক, কিন্তু তার নিষ্ঠুর প্রত্যুত্তর পাচ্ছি 'ডোবায়'

শব্দে ; যা 'স্ফূর্ত' হলো তা-ই প্রলয়ের দূত, যা সৃষ্টি সূচক তা-ই কালান্তক ;—এই প্রতিতুলনাগুলি এই অংশের অভিঘাত তীব্র ক'রে তুলছে। অগত্যা পদাতিককে হ'তে হ'লো এক মজ্জমান তরণীর নাবিক ("যযাতি"র 'মজ্জমান বঙ্গোপসাগরে' স্মর্তব্য) ; এই নৌকোই 'অনন্য সম্বল' তার, এটাই সেই মিল্টন-কথিত 'one talent' ; ফুটো হোক, ভাঙা হোক, তলিয়ে যাক, এর কোনো বিকল্প নেই।

চতুর্থ স্তবকের শেষ দুই পঙক্তিতে একটি সমস্যা দেখা দেয়। 'দশমী'তে ও 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্য-সংগ্রহ' বইটিতে যদি কোনো ছাপার ভুল বা অশুদ্ধ পাঠ না-থেকে থাকে, তা'হলে তৃতীয় পঙক্তির 'উত্তরঙ্গ'কে 'জলোচ্ছ্বাস'-এর বিশেষণরূপে গ্রহণ করতে আমি রাজি নই। (কেননা ক্রিয়াপদের অভাবে পঙক্তিটিকে অন্বয়চ্যুত মনে হয়, আর সুধীন্দ্রনাথের কবিতা কখনো ব্যাকরণ লঙ্ঘন করে না।) আমার মতে পঙক্তিটির অন্বয় : 'তাই তার সমগ্র ধরণী জলোচ্ছ্বাসে, উত্তরঙ্গ (বিক্ষুব্ধ, বিলোল, তরলতাপ্রাপ্ত) [হ'লো]।' অথবা যদি 'জলোচ্ছ্বাসে'র বদলে 'জলোচ্ছ্বাস' পড়া যায়, তা'হলে : 'তাই তার সমগ্র ধরণী উত্তরঙ্গ জলোচ্ছ্বাস [-এ পরিণত হ'লো]।' এই পঙক্তির শেষে সেমিকোলন থাকলে ভালো হ'তো, কেননা 'উদ্বৃত্ত মঙ্গল' একটি সম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র বাক্য। 'উদ্বৃত্ত' অর্থ এখানে 'অবশিষ্ট' নয়, এই প্রসঙ্গে তা হ'তেই পারে না ; এখানে 'উদ্বৃত্ত' অর্থ 'উৎক্ষিপ্ত, উদ্‌ঘূর্ণিত'—এই বন্যায় মঙ্গলের সম্ভাবনা সুদ্ধ বিপর্যস্ত হ'লো। অথবা, শ্রী নরেশ গুহর পরামর্শ অনুসারে বলছি, তৃতীয় পঙক্তির শেষে কমা যদি শুদ্ধ পাঠ হয়, তা'হলে 'তার' শব্দের সঙ্গে 'উদ্বৃত্ত মঙ্গল'কে অন্বিত করা সম্ভব ; অর্থাৎ যেমন তার (কবিতার নায়কের) সমগ্র ধরণী এখন উত্তরঙ্গ তেমনি (সেই ব্যক্তির) মঙ্গলও বিনষ্ট। কিন্তু, এই অন্বয় মেনে নিয়েও বলা যায় যে এই সর্বনাশ কারো ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, বৈশ্বিক ; 'উদ্বৃত্ত মঙ্গল'কে স্বতন্ত্র বাক্য ধরলে সেই অর্থ জোরালো হয়, এবং পঞ্চম স্তবকের করাল চিত্রের সঙ্গে চতুর্থ স্তবকের শেষ পঙক্তিটিকে দৃঢ়তর ভাবে সম্পৃক্ত করা যায়। (লক্ষণীয়, পঞ্চম স্তবকে কোনো ব্যক্তিবিশেষের উল্লেখ নেই।)

পঞ্চম স্তবকে নৈরাশ্য আরো গাঢ়, বিলয় আরো আসন্ন। যোগশাস্ত্রে উল্লিখিত একটি নিশ্বাসরোধক ব্যায়ামের নাম 'কুম্ভক', এখানে অবশ্য মৃত্যুর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তাই তা 'অন্তিম' ও 'অপ্রতিকার্য', এবং 'নাস্তির কিনারা'ও (সীমা, তীর) অনুত্তরণীয়। রবীন্দ্রনাথ যখন লিখেছিলেন, 'হয় যেন মর্তের

বন্ধন ক্ষয় / বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি লয়', তখন তিনি 'বিরাট বিশ্ব'কে মঙ্গলময় ব'লে ভেবেছিলেন ('বাহু' শব্দে অভ্যর্থনাসূচক আলিঙ্গনের ইঙ্গিত আছে), কিন্তু তুলনীয় অবস্থায় সুধীন্দ্রনাথের পদাতিক নাবিকটি অসীম শূন্যে মজ্জমান ; 'মর্তের বন্ধনে' সে আশ্রয় পায়নি, অমর্ত্যও তার পক্ষে অস্তিত্বহীন ; তার বৈকল্য এমন ব্যাপক যে জলমগ্ন চুম্বকশৈল, ও ধ্রুবতারা — অর্ণবপোতের এই গুপ্তশত্রু ও প্রকাশ্য বন্ধুও এখন তার কাছে নির্ভেদ,— অর্থাৎ, ধ্বংসের হাতে আত্মসমর্পণ ভিন্ন তার উপায় নেই। 'তুঙ্গী' শব্দটি 'তুঙ্গে'র বিকল্প নয়, জ্যোতিষ-শাস্ত্রের একটি পরিভাষা ; বিশেষ-বিশেষ রাশিতে বিশেষ-বিশেষ গ্রহ অবস্থিত থাকলে তাকে 'তুঙ্গী' বলা হয় ; অর্থাৎ, 'মগ্ন চুম্বক'-এর সঙ্গে যার প্রতিতুলনা করা হচ্ছে তা ধ্রুবতারার সেই অবস্থা, যখন তা সবচেয়ে পরাক্রান্ত ও কল্যাণপ্রসূ। কিন্তু 'তুঙ্গী ধ্রুবতারা'ও নাবিকটিকে বাঁচাতে পারবে না।

ষষ্ঠ ও শেষ স্তবকের আরম্ভে 'তথাচ' শব্দও আমাদের প্রায় প্রত্যাশিত ছিলো, যেহেতু সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় 'কিন্তু'র পরে 'তবু' আমরা বহুবার পেয়েছি। (একটি প্রস্তাব, তার উত্তর, সেই উত্তরের প্রত্যুত্তর, অবশেষে মীমাংসা : তাঁর কবিতার এই জ্যামিতিক গঠন আমাদের সুপরিচিত)। 'অভাবে যবে তলাবে নাবিক' : ক্ষমতার অভাবে, আশ্রয়ের অভাবে, ভগবানের অভাবে, নাস্তির গর্ভে। কিন্তু 'অভাব' শব্দের অন্য একটি অর্থ, 'ধ্বংস' বা 'মৃত্যু'ও এখানে ধ্বনিত হচ্ছে ; 'দশমী'র প্রথম কবিতা "প্রতীক্ষা"র চতুর্থ স্তবকে এই অর্থেই 'অভাব' পাওয়া যায় ('অভাব হয়তো স্বভাবেরই অগ্রজ : / নিরবধি তাই প্রভাসে ফুরায় ব্রজ—'), এ-দুটি কবিতা একই বৎসরে রচিত, এদের মূল বক্তব্যও এক। "নৌকাডুবি"র ষষ্ঠ স্তবকে ব্যবহৃত হয়েছে এই সনাতন সংস্কার যে মৃতুর পূর্বমুহূর্তে মানুষের মনে তার সমগ্র জীবন প্রতিভাত হ'য়ে ওঠে, কিন্তু তার ইঙ্গিতটি নতুন ও বিষয়োপযোগী। 'স্মৃতির বিদ্যুৎ' একটি ছবি দিচ্ছে যেন অকূল অন্ধকারে হঠাৎ ঝলক দিলো বিদ্যুৎ, সংবর্তে (প্রলয়ে) মগ্ন হবার আগে শেষবার ক্রন্দসী (স্বর্গ ও মর্ত্য) উদ্ভাসিত হ'লো ("প্রত্যুত্তর" : 'দশমী', পঙক্তি ১৮ ও ১৯ দ্রষ্টব্য) ; যেন কোথাকার য়োসেফ কা. 'কুকুরের মতো' মরার আগে উচ্চচূড়া থেকে নিঃসৃত আলোকরশ্মি দেখতে পেলো। 'পাবে সে নিজের দেখা' : 'নিজের' শব্দটি ইঙ্গিতময় ; 'ক্রন্দসী'র "সন্ধান" কবিতার সঙ্গে ('আপনারে অহরহ খুঁজি') এর সম্বন্ধ স্পষ্ট ; 'নিজের' — অর্থাৎ, যেটা তার সত্তার সারাংশ বা আদর্শরূপ, যেখানে সে নির্ভেদ, নির্দ্বন্দ্ব, দেহে ও বুদ্ধিতে একান্ত

("সন্ধান" দ্রষ্টব্য), সেই তার নিহিত এবং হয়তো বা অব্যক্ত ও অচরিতার্থ সত্তার সঙ্গে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে তার সাক্ষাৎ হবে। (পূর্বোল্লিখিত "প্রতীক্ষা'র শেষ পঙক্তিও এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয় — 'তথাপি পাব না আমি আপনার দেখা কি ?' "প্রতীক্ষা"র শেষ স্তবকে দার্শনিক উক্তির ভাষায় যা বলা হয়েছে, "নৌকাডুবি"তে তা-ই অনূদিত হ'লো চিত্রকল্পে)। মৃত্যুর পরে পঞ্চভূতে বিলীন হ'য়ে সে হবে 'স্বাভাবিক' — স্বাভাবিক, প্রাকৃত, আদিম, মনোহীন, জড়। 'স্বাভাবিক' — এর এই বিশেষ বোদলেয়ারীয় অর্থ মনে না-রাখলে এই কবিতা পড়া ব্যর্থ হবে।

'নৌকাডুবি'র গূঢ় অর্থ আমার কাছে খুব স্পষ্ট ; কবির অন্তর্জীবনের একটি নাটক এটি। শুধু কবিরই বা কেন, যে-কোনো চৈতন্যবান, মননশীল মানুষের। চৈতন্য জড়ের বিরোধী, এবং বিশ্ব জড় ; অতএব বিশ্বের সঙ্গে অবিরল যুদ্ধচালনাই সচেতন মানুষের জীবন। এই যুদ্ধের চিত্রকল্পস্বরূপ সুধীন্দ্রনাথ বেছে নিয়েছিলেন সাঁতার ও নৌচালনা ('সংবর্তে'র "জেসন" কবিতার প্রথম পঙক্তি : 'বহু কষ্টে শিখেছি সাঁতার' স্মর্তব্য) ; ভূপৃষ্ঠচারী প্রকৃতিচ্যুত মানুষের পক্ষে দুটো কাজই দুরূহ, শিক্ষাসাপেক্ষ, বিপজ্জনক (ভালেরির "Le Rameur" বা "নৌচালক" কবিতা স্মর্তব্য)। "নৌকাডুবি"তে এমন একজনের কথা বলা হয়েছে যে কোনো আকস্মিক প্রেরণার বশবর্তী হ'য়ে কিছুদিনের জন্য কোনো সৃষ্টিকর্মে (সম্ভবত কবিতা লেখায়) সাবলীলভাবে ব্যাপৃত ছিলো (হাঁটার জন্যে ন্যূনতম চেষ্টা শুধু প্রয়োজন, তাই তার পদাতিক অবস্থায় অপেক্ষাকৃত সাবলীলতা ব্যঞ্জিত হচ্ছে) ; কিন্তু যখন বেলা প'ড়ে এলো (বার্ধক্য ? ক্ষমতার অবক্ষয় ? তীব্রতর আত্মচেতনাপ্রসূত বন্ধ্যত্ব ?), তখন সে দেখলে যে 'কিছুই সহজ নয়, কিছুই সহজ নেই আর', তার অনুভূতি হ'লো যেন প্যয়ের তলা থেকে মাটি স'রে যাচ্ছে ; — এই জন্যেই প্রান্তর হ'লো সমুদ্র, পান্থ নৌজীবী, আর তরণীটিও মজ্জমান, কেননা বিশ্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পরাজয় অনিবার্য ; জড় জগৎ কঠিন প্রতিশোধ নিয়ে এবার তাকে প্রলয়তিমিরে ডুবিয়ে দেবে। অথবা এ-ও ভাবা যায় যে পদাতিক অবস্থায় সে অকৃতী হ'লেও সুস্থভাবে বেঁচে ছিলো, যখন কবিতা লেখা শুরু করলে, বা চৈতন্যের দ্বারা অধিকৃত হ'লো, তখনই তাকে নৌকো ভাসাতে হ'লো মারাত্মক জলে। ('ভাঙা হাটে শুরু'-তে এই আত্মজৈবনিক ইঙ্গিত থাকতে পারে যে সুধীন্দ্রনাথ কিছুটা অধিক বয়সে কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন — 'তন্বী' প্রকাশকালে তাঁর বয়স ছিল উনত্রিশ, আর 'অর্কেস্ট্রা' প্রকাশকালে চৌত্রিশ — আর কৈশোর পর্যন্ত ভালো বাংলা জানতেন

না ব'লে প্রথম থেকেই কবিতা লেখার কাজটি ছিলো তাঁর পক্ষে বিশেষভাবে আয়াসসাধ্য। 'খালি গোলাঘরে সারা'-কে স্বীয় রচনা বিষয়ে কবিদের সাধারণ ও স্বাভাবিক অতৃপ্তির অর্থে গ্রহণ করতে দোষ নেই। কিংবা, 'খালি গোলাঘরে সারা, ভাঙা হাটে শুরু'-কে সুধীন্দ্রনাথের সাধারণ জীবনদর্শনের একটি উক্তি রূপেও ধ'রে নেয়া যায়; "প্রতীক্ষা"র 'অনুমানে শুরু, সমাধা অনিশ্চয়ে' পঙক্তিটিতে একই ধারণা ভিন্নভাবে বলা হয়েছিলো)।— কিন্তু শেষ মুহূর্তেও তার মানবিক মর্যাদা সে হারাবে না, 'স্মৃতির বিদ্যুতে' দেখবে সে নিজেকে একবার মুখোমুখি; —সে যা হ'তে চেয়েছিলো তা-ই, যা সম্ভাব্য ছিলো তা-ই, যা হ'তে পারতো কিন্তু হ'লো না তা-ই (ব্যাপ্ত হতাশা সত্ত্বেও, সুধীন্দ্রনাথের আদর্শ জগতে ব্রাউনিঙের চিহ্ন দেখা যায়: 'সেখানে সম্পূর্ণ বৃত্ত, শুধু ভগ্ন কুটিলতা নয়' — 'ক্রন্দসী': "পরাবর্ত")— সেটাই অন্তিম মূল্য তার সত্তার, যদিও বিশ্বের কাছে, প্রকৃতির কাছে, 'জীবনে'র কাছে তা কখনোই স্বীকার্য হবে না। চৈতন্যসম্পন্ন মানুষমাত্রেই আত্মধ্বংসী, তার চেতনাই তাকে সর্বনাশের পথে টেনে আনে। সুধীন্দ্রনাথের সার্বিক বিশ্ববীক্ষা — তার নাম ক্ষণবাদ বা ধ্বংসবাদ বা নাস্তিবাদ যা-ই হোক না — তারও একটি সাংকেতিক ইস্তাহার এই কবিতা। (আমার এক-এক সময় সন্দেহ হয় যে সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রচ্ছন্ন ও প্রতিহত বৈদান্তিক; বুদ্ধির কাছে যা অগ্রাহ্য, তাঁর সজ্ঞান মন ছিলো সেদিকে, 'দশমী'র "প্রতীক্ষা"য় উল্লিখিত 'সোহংবাদীর আর্তি, তাঁরই নিজের; ঐ কবিতার শেষ পঙক্তিতে দুটি অর্থ লুকিয়ে আছে কিনা তা-ই বা কে জানে। 'আপনার' শব্দটি মধ্যম পুরুষেও গ্রাহ্য; ভগবানকে ঈষৎ শ্লেষের সুরে 'আপনি' বলতে বাধা নেই; এই দুই অর্থ যুগপৎ মেনে নিলে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে ভগবানের ও নিজের দেখা পাওয়া একই কথা। অন্তত এটা স্পষ্ট যে তাঁর সমগ্র কাব্য জুড়ে রয়েছে ভগবানের বা পরমের অভাবজনিত এক বিরাট মনোবেদনা)।

নৌকো, নদী, ভ্রমণ, সমুদ্রযাত্রা: উনিশ-শতকী য়োরোপীয় রোমান্টিকদের কবিতায়, এবং রবীন্দ্রনাথে, এই চিত্রকল্পগুলি নিরন্তর পুনরাবৃত্ত। তাঁদেরই বিনীত ও যোগ্য উত্তরাধিকারী সুধীন্দ্রনাথ; তাঁর কবিতা পড়ার অন্যতম প্রধান সুখ এই যে তিনি অনবরত আমাদের অন্যান্য প্রিয় কবিদের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তাঁর উত্তরজীবনের বহু কবিতার অন্তরালে কাজ ক'রে যাচ্ছে দুই পূর্বসূরির দুটি কবিতা: রবীন্দ্রনাথের "নিরুদ্দেশ যাত্রা" ও র‍্যাঁবোর "মাতাল তরণী"। "যযাতি"তে এই দুটি কবিতার স্পষ্ট সন্নিপাত ঘটিয়ে তিনি ভাবী

গবেষকদের জন্ত উদার ইঙ্গিত রেখে গিয়েছেন ; সেই সূত্র অনুসরণ করলে তাঁর অন্ত অনেক কবিতায় এই একই নৌযাত্রার চিত্রকল্প আমরা খুঁজে পাবো। এর প্রথম ক্ষীণ উল্লেখ পাই 'অর্কেস্ট্রা'র "বিকলতা" নামক চতুর্দশপদীর উপান্ত্যপঙ্‌ক্তিতে ('তাই আজি তব স্মৃতি, মগ্নতরী জঞ্জালের মতো') ; ভিন্ন-ভিন্ন রূপ ও অর্থ নিয়ে তা ফিরে-ফিরে এসেছে "মরণতরণী" ('উত্তরফাল্গুনী'), পূর্বোক্ত "জেসন" ও "যযাতি" ('সংবর্ত'), 'সংবর্তে'র "উন্মার্গ" ও "প্রত্যাবর্তন"-এ, এবং 'দশমী'র দশটির মধ্যে পাঁচটি কবিতায় ("নৌকাডুবি", "ভ্রষ্ট তরী", "উপস্থাপন", "প্রত্যুত্তর", ও "অসংগতি")। "উন্মার্গ", "প্রত্যাবর্তন", "ভ্রষ্ট তরী" ও "অসংগতি"তে 'নিরুদ্দেশ' শব্দটিও সচেতন ভাবে, এবং ঈষৎ বক্রভাবে উপস্থিত, — সুধীন্দ্রনাথ আমাদের বার-বার আহ্বান করছেন রবীন্দ্রনাথের সুন্দরী চালিত সম্ভাবনাময় কনকপোতের সঙ্গে তাঁর নিরলম্ব ধ্বংসোন্মুখ নৌকোর প্রতিতুলনা করতে। "যযাতি"তে, এবং দশমী'র পূর্বোক্ত পাঁচটি কবিতাতেই, নৌকোটি 'বানচাল' হ'য়ে গেলো — হয় মগ্ন, নয় মগ্নপ্রায়, নয় আশাহীনভাবে বিপন্ন। "সংবর্ত" ও "যযাতি"র পরে 'দশমী'তে সুধীন্দ্রনাথ আবার চেষ্টা করেছিলেন তাঁর জীবনদর্শনের একটি পরিচ্ছন্ন বিবৃতি দিতে ; কিন্তু "নৌকাডুবি"র মতো কবিতাকে তাঁর আকস্মিক অকাল-মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণীরূপেও বিবেচনা করতে আমরা স্বভাবতই লুব্ধ হই।

[এই নিবন্ধে কবিতার নামে যুগ্ম ঊর্ধকমা (" ") এবং বই-এর নামে এবং অন্য সব ক্ষেত্রে একক ঊর্ধকমা (' ') ব্যবহার করেছি।]

নবনীতা দেব সেন

ANGOISSE—উৎকণ্ঠা—ANGUISH : একটি কবিতার ত্রিমূর্তি

॥ ১ ॥

স্বদেশে আমরা সুধীন্দ্রনাথের প্রথম ছাত্র। মালার্মের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ও সুধীন্দ্রনাথেরই মধ্যস্থতায়। এখন শিক্ষার ফসল তোলা শুরু হয়েছে, পেয়েছি নিজস্ব চোখ। এখন সুধীন্দ্রনাথকে মালার্মেকে আলাদা করে পাশাপাশি দেখবার সময় হয়তো হয়েছে।

এখানে মালার্মে বিষয়ে লিখতে বসিনি, উদ্দেশ্য সুধীন্দ্রনাথকে স্মরণ করা। সেই মধুর মার্জিত হাসি, উদাত্ত কণ্ঠস্বরের সুপটু বাচনভঙ্গী, দীর্ঘকায় সুপুরুষ ব্যক্তিত্বের কিছুই তো এখানে উপস্থাপিত করতে পারছি না। আমার শক্তিও সীমিত, পণ্ডিতির উচ্চাশা কোনো মতেই রাখি না। এ কেবল ছাত্র হিশেবে ব্যক্তিগত গুরুদক্ষিণা দেওয়া। এই নিবন্ধে আমার কাজ সামান্যই। মালার্মের একটি মূল কবিতার সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথকৃত অনুবাদটি মিলিয়ে কেবল দেখব, তার কতোটা সুধীন্দ্রনাথ। এই সঙ্গে পাশাপাশি রাখছি রজার ক্রাই। দ্বিতীয় মতের উদাহরণ হিশেবে।

আমি বেছে নিলাম 'উৎকণ্ঠা'। এই সনেটটির ছন্দ মিলের বিভাগ মূলের সঙ্গে সমানভাবে বজায় রেখেছেন সুধীন্দ্রনাথ; অকটেভে কখ কখ, গঘ গঘ, সেসটেটে ঙ চ চ, ঙ ছ ছ। এখানে নজর করা দরকার যে আক্ষরিক অনুবাদে রজার ক্রাই মিল রাখেন নি, কিন্তু মৌল পংক্তিবিভাগ মেনেছেন। অনুবাদ, বিশেষত মালার্মের মত ঘনত্ব যেখানে বিদ্ধ করতে হয়, মিল এবং পংক্তিবিভাগ দুকূলই বজায় রাখা সেখানে সহজ নয়। যদিও ঘনত্বের সাধনায় মালার্মেকে স্থানে স্থানে হার মানিয়েছেন সুধীন্দ্রনাথ, কিন্তু এই কবিতায় পংক্তিবিভাজন যথাযথ মূলানুগ করা সম্ভব হয় নি মিল বজায় রাখার তাগিদে। কবিতা অনুবাদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করলে কতো কথাই বলবার আছে! ভাষার মেজাজ, কবির মেজাজ ইত্যাদি মৌল অমীমাংসিতব্য গোলমাল বাদ দিলেও, খুচরো অনেকগুলি মুখ্য অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় অনুবাদককে। সেগুলির

মোটামুটি ব্যক্তিগত সমাধান আবিষ্কার করার মধ্যেই অনুবাদকের প্রধান সাফল্য নির্ভর করে। তত্ত্বকথায় না গিয়ে, এখানে আমরা হাতে-নাতে বরং দেখি সুধীন্দ্রনাথ কী করেছিলেন। অনুবাদক সুধীন্দ্রনাথের গুণ ছিল, তিনি কখনো দু-হাত ফের্তা বস্তু নিয়ে কাজ করতেন না। ফরাসিতে ব্যুৎপত্তি ছিল তাঁর— যেমন ছিল জর্মন এবং ইংরেজিতে। এবং ফরাসিকে বাংলায় এনে দেখবার গূঢ় রাসায়নিক প্রক্রিয়াটি ঘটাবার জন্যে তাঁর হাতে ধরা ছিল মাতৃভাষার মূল চাবিকাঠিটি, সংস্কৃত। তার ছোঁয়ায় বাংলাভাষা গলে গিয়ে এক চেহারা থেকে অন্য চেহারায় রূপান্তরিত হয়ে যেত সুধীন্দ্রনাথের লেবরেটরিতে।

॥ ২ ॥

প্রথমে দেখা যাক্ কবিতার নামাঙ্কন। সেখানে আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন দুজনেই। এবার প্রথম অনুচ্ছেদ :

মূল—Je ne viens pas ce soir vaincre ton corps, o bete
En qui vont les pe´che´s d'un peuple, ni creuser
Dans tes cheveux impurs une triste tempete
Sons l'incurable eunui que verse mon baiser :

ফ্রাই—I come not tonight to conquer your body, o hbrute
In whom course the sins of a people, nor hollow
In your tresses' impurity a dismal storm
With the fatal ennui that my kisses pour out :

সুধীন্দ্রনাথ—সমগ্র জাতির পাপ সংক্রান্ত যে-জান্তব শরীরে,
তার নৈশ বলিদানে আজ আমি নই উপনীত ;
জাগাবে না ক্ষুব্ধ ঝড় অপবিত্র কেশের গভীরে
আমার চুম্বন, যাতে দুরারোগ্য নির্বেদ নিহিত ॥

রজার ফ্রাইতে দেখছি শব্দ ধরে ধরে আক্ষরিক অনুবাদ। পংক্তি বিভাজন তো বটেই, শব্দ সাজানোতেও মূলানুগতি লক্ষ্যণীয়। মিল রাখার প্রশ্ন না তুলে ভালই করেছেন—শব্দগত ও অর্থগত বিশ্বস্ততার তুলনা নেই। একবার মাত্র সামান্য শব্দার্থভেদ ঘটেছে ; ছন্দ রাখার জন্য l'incurable শব্দকে fatal শব্দ করেছেন। এমনকী যতিচিহ্নও মূলানুসারী।

সুধীন্দ্রনাথ, প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি মূল থেকে সরে আসতে বাধ্য হলেন, be´te এই শব্দের ভাবগত সম্পূর্ণতা বজায় রাখার দায়ে। নারীকে 'পশু' বলে সোজাসুজি সম্বোধন করতে চাইলেন না, তাই 'জান্তব শরীর' শব্দ ব্যবহার করলেন, এবং শরীরকে উদ্দেশ্য করে কবিতা শুরু করলেন না—ফলে বক্তব্য তৃতীয় পুরুষে পর্যবসিত হল।

দ্বিতীয় তফাৎ, পংক্তির ভাবগত পূর্ণতা ঠিক রেখে চললেও, তৃতীয় পুরুষে কবিতা শুরু করবার ফলে দ্বিতীয় পংক্তিকে আনতে হল প্রথমে—এবং প্রথম পংক্তি চলে গেল দ্বিতীয়ের স্থানে। এখানে একটি বিশেষ শব্দ আছে, যা মূল থেকে অনেকটা দূরে নিয়ে যায় শব্দার্থ, কিন্তু ভাবার্থকে অনেকখানি ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে তোলে। সেই শব্দ 'বলিদান'। vaincre শব্দের তর্জমা বিজয়, বলিদান নয়। কিন্তু 'পশু'র শরীরকে পরাজিত করবার মধ্যে জয়গর্ব ততটা নেই, যতটা আছে বলিদানের নিষ্ঠুরতা। এখানে সুধীন্দ্রনাথের অনুবাদে মালার্মে উজ্জ্বলতর হয়েছেন।

আরেকটি তফাৎ verse এই ক্রিয়াপদের গতিময়তা, ঝরে-পড়া বা ঢেলে দেওয়ার প্রাণচাঞ্চল্য 'নিহিত' এই স্থাবর শব্দে হঠাৎ বন্ধ, স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায়। এই স্থবিরতার শুরু কিন্তু কবিতার গোড়াতেই—

Je ne viens pas ce soir vaincre ton corpse, o bete (আক্ষরিক—'আসি নি এ-রাতে তোর শরীর বিজয়ে, রে পাশবী।') এর মধ্যে যে প্রত্যক্ষতার জোর রয়েছে—সোজাসুজি সম্বোধন এড়িয়ে পরোক্ষ তৃতীয় পুরুষে নিয়ে যাওয়ায় সে গতিময়তার, প্যাশনের কিছুটা হানি হয়েছে বৈকি। এ ছাড়া প্রথমেই 'সমগ্র জাতির পাপ' এই বাক্যবন্ধ যেন মঞ্চ থেকে বক্তৃতা দেবার ঢঙে শুরু, এর মধ্যে 'আসিনি এ রাতে'র মগ্ন ব্যক্তিগত বিলাপ নেই। কিন্তু সমগ্র অনুচ্ছেদটির মধ্যে কথ কথ মিল এবং প্রতিটি শব্দের ভাবগত বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেও, মূলের প্রতি আশ্চর্য বিশ্বস্ততা দেখিয়েছেন সুধীন্দ্রনাথ। এক জায়গায় যেমন 'ni creuser,' এই ক্রিয়ার আক্ষরিক তর্জমা না করে উনি বরং বিপরীত ভাব 'জাগাবে না' এই ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন 'ঝড়' এর সঙ্গে খাপ খাইয়ে, তেমনি 'গভীরে' এই শব্দ যোগ করে creuser ক্রিয়ার ভাবার্থ ফিরিয়ে এনেছেন পংক্তির শেষে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ :

মূল—Je demande en ton lit le loud sommeil sans songes
Planant sous les rideaux inconnus du remords
Et que tu peux gouter apre´s tes noirs mensonges
Toi qui sur le ne´ant en sais plus que les morts :

ফ্রাই—I ask of your bed heavy sleep without dreams
Brooding in curtains unknown of remorse,
Which you too can taste after your black deceits,
You who of Zero know more than the dead :

সুধীন্দ্রনাথ—নিবিড় নিশ্চিন্ত নিদ্রা খুঁজি আমি তোমার শয়নে,
অসন্তাপ প্রাবরণে নির্বাণের শান্ত অবরোহ।
ফুরালে মিথ্যার পালা, রক্ষা পাও তুমি যে-অয়নে,
নিত্য সে-নিখিল নাস্তি ; তার পাশে মৃত্যুও সম্মোহ॥

রজার ফ্রাই যথারীতি আক্ষরিক, একমাত্র তৃতীয় পংক্তিতে 'too' শব্দটি অতিরিক্ত, এবং 'ne´ant' এই শব্দের, পূর্ণ নঙর্থক চেহারাটা 'Zero' এই শব্দে, নাস্তির সদর্থক চেহারায় বদলেছেন মাত্র। এ ছাড়া আর কোনো পার্থক্য নেই।

সুধীন্দ্রনাথ কিন্তু এ অনুচ্ছেদে পংক্তিবিভাগে বিশ্বস্ত থাকলেও শব্দার্থ বিন্যাসে রীতিমতো স্বাধীনতা নিয়েছেন। ৫ম পংক্তিতে—'নিঃস্বপ্ন' (sans songes) শব্দের বদলে 'নিশ্চিন্ত' এই শব্দ—এ ছাড়া কোনো তফাৎ নেই। কিন্তু ৬ষ্ঠ পংক্তিতে মালার্মে যেখানে সরলগতিতে স্বচ্ছন্দ, সুধীন্দ্রনাথ সেখানে দুটি চার অক্ষরের ভারী শব্দে আড়ষ্ট—এবং প্রথম দুটি শব্দেই পুরো পংক্তির ভাবার্থ লিখে ফেলে, বাধ্য হয়েছেন 'নির্বাণের শান্ত অবরোহ' এত কথা যোগ করতে। এ সব কথা একটিও মূলে নেই।

৭ম পংক্তিতে পার্থক্য আছে—

et que tu peux gouter

(আক্ষরিক—'এবং যা তুমি কর আস্বাদন' কিংবা 'এবং যে স্বাদ তুমি নিতে পার')

এর অনুবাদ তো 'রক্ষা পাও তুমি যে-অয়নে' নয়। 'রক্ষা' এবং 'অয়নে' 'আস্বাদনে'র ভাব প্রকাশিত হল না, পরিবর্তিত হল। তারপর ৮ম পংক্তিতেও ভাব বদলাচ্ছে। 'নির্বাণের শান্ত অবরোহ' যেমন মালার্মেতে নেই, সুধীন্দ্রনাথ

নিজে এনেছেন, তেমনি মালার্মে এই ৮ম পংক্তিতে তাঁর সম্বোধিত আন্তব নারীকে যে সম্মান দেখিয়েছেন—

toi qui sur le ne´ant en sais plus que les morts

(আক্ষরিক—'যে-তুমি নাস্তিকে জানো মৃতের চেয়েও বেশী করে') সুধীন্দ্রনাথ তাকে দূর করে দিয়েছেন পুনরপি তৃতীয় পুরুষের তুহিনশীতল তত্ত্বকথায়। এই স্তবকে আমরা মালার্মেকে যতটা পাই সুধীন্দ্রনাথকে পাই তার চেয়ে বেশী পরিমাণে। নাস্তির বিশেষণে 'নিখিল' ও 'নিত্য', মৃত্যুর প্রতিশব্দে 'সম্মোহ', নিজের দায়িত্বে মালার্মেতে না-থাকা এইসব শব্দ ব্যবহার করে তিনি যে নতুন চিন্তার অবতারণা করেছেন, মালার্মে সে ধরনের ব্যাখ্যার দিকেই যাননি। অতএব এখানে সুধীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত ভাষ্যও পাচ্ছি। শুধু মালার্মের নয়, সুধীন্দ্রনাথের নিজস্ব দার্শনিক বিশ্বাসও এই স্তবকে বিবৃত।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ :

মূল—Car le Vice, rongeant ma native noblesse
M'a comme toi marque´ de sa ste´rilite´
Mais tandis que ton sein de pierre est habite´.

ক্রাই—For Vice having gnawed my noblesse inborn
Has marked me like you with its sterility
But whilst in your breast of stone there is dwelling

সুধীন্দ্রনাথ—আমিও তোমার মতো, অভিগ্রস্ত ব্যাপক কলুষে,
অনুর্বর, বীতস্বত্ব, সৌজাত্যের মৌল মর্যাদায় ;
পাষাণহৃদয় তুমি পক্ষান্তরে যেহেতু স্বেচ্ছায়,

এখানেও ক্রাই যথাযথ মূলানুগতি রক্ষা করে চলেছেন। কোথাও কোনো নতুন ভাব বা নিজস্ব শব্দ ব্যবহার করেন নি। পংক্তির বিভাগেও মালার্মের নির্দিষ্ট ভাবসীমা লঙ্ঘন করেননি, শব্দ বিন্যাসে পর্যন্ত একেবারে মালার্মের নিজস্বতা বজায় রয়েছে।

কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ প্রথম দুই পংক্তির স্থানপরিবর্তন করা ছাড়াও, বাচনভঙ্গী আবারও পালটেছেন। মালার্মেতে যেখানে কর্তা 'পাপ' (ক্যাপিটাল অক্ষরে নামাঙ্কিত), 'আমি' কর্মমাত্র, সেখানে সুধীন্দ্রনাথে 'আমি' কর্তা। নবম পংক্তির শুরু 'যেহেতু' বা 'কারণ' দিয়ে হলে এই সেসটেটের কর্মগত চরিত্র বজায় থাকে, প্রথমে অকটেভে যে-ভাবের অবতারণা করেছেন, সেসটেটে তারই পূর্ণ পরিচয়,

ব্যাখ্যা। সুধীন্দ্রনাথ 'আমিও' দিয়ে শুরু করায় সেই যুক্তির তীক্ষ্ণতা থাকছে না। এবং যে-দায়িত্ব ছিল 'পাপ' শব্দের, তা এসে 'আমি' শব্দে বর্তেছে। বক্তব্যের ঝোঁক গিয়েছে বদলে। দশম পংক্তিতে marqué এই ক্রিয়াপদের মধ্যে জান্তব অনুষঙ্গ আছে, গরু বাছুরদের যেমন লোহা পুড়িয়ে ছ্যাকা দিয়ে ছাপ মারা হয়, পাপজ অনুর্বরতার ছাপ যেন তেমনি। 'অভিগ্রস্ত' এই শব্দে কোথায় সেই তীব্র দহন, নীচতায় দংশন? এই দংশনের অনুভূতি আরো স্পষ্ট rongeant ক্রিয়ায়। এই ronger ক্রিয়ার পরের স্তবকে dent শব্দটি আসছে। 'বীতস্বত্ব' শব্দে সে কুরে কুরে খাওয়ার যন্ত্রণা কই?

মূল কবিতায় ৯ম, ১০ম পংক্তিতে মালার্মে খুবই স্পষ্ট।

(আক্ষরিক—'যেহেতু আমার সহজাত পুণ্য কুরে খেয়ে, পাপ

আমাকে তোমারি মতো ঊষরত্বে চিহ্নিত করেছে')

কিন্তু সুধীন্দ্রনাথে পুরো চিন্তা এবং প্রকাশভঙ্গী উলটে গিয়েছে এবং এ কথা অস্বীকার করতে পারিনা যে, ভাবের গতি কিঞ্চিৎ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। এখানে শব্দ ধরে ধরে পার্থক্য দেখিয়ে লাভ নেই—এই দুই পংক্তিকে 'ভাবানুবাদ' বলতে হয়, যথার্থ অনুবাদ বলা যায় না। ১১শ পংক্তিতে আবার মূলের কাছাকাছি ফিরে আসেন সুধীন্দ্রনাথ। 'স্বেচ্ছায়' এই শব্দটি অতিরিক্ত। এ ছাড়া mais শব্দের বদলে 'যেহেতু' শব্দের ব্যবহারটি নজরে পড়ে। ভাবানুবাদেও একটু স্বস্তির অভাব বোধ হয়। 'তোমার পাষাণ বক্ষ যেহেতু রয়েছে অপাপদংশিত এক হৃদয়ের বাসা' এই অর্থটি কিন্তু ঠিক ফোটেনি—'পাষাণ হৃদয়' শব্দের অনুসঙ্গই আলাদা।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ :

মূল—Par un coeur que la dent d'aucun crime ne blesse,
Je fuis, pale, défait, hanté par mon linceul,
Ayant peur de mourir lorsque je couche seul.

ক্রাই—A heart that the tooth of no crime can wound,
I fly, pale, undone, and by my shroud haunted,
And fearing to die if I but sleep alone.

সুধীন্দ্রনাথ—অক্ষত তোমার বক্ষ তাই অপরাধের অঙ্কুশে।
আর আমি পরাজিত, প্রেতভয়ে পাণ্ডু, দ্রুতপদ,
ঘুমাতে পারি না একা, ভাবি শয্যা শবের প্রচ্ছদ॥

ইংরাজি অনুবাদে ক্রাই শেষপর্যন্ত মালার্মেকে ধরে রেখেছেন। কবিতার শেষ শব্দদুটি লক্ষ্যণীয়—je couche seul ('ঘুমাই একাকী')—ক্রাই বিশ্বস্তভাবে অনুবাদেও শেষ শব্দদুটি "sleep alone" রেখেছেন। 'একাকীত্ব' এই কবিতার চাবি এবং 'শয়ন' দ্বিতীয় মূলভাব, যেজন্য জান্তব শরীরের কাছে প্রসাদভিক্ষা। এই দুটি মোক্ষম শব্দ শেষকালে বসিয়ে মালার্মে আমাদের হাতে পুরো কবিতার ভোমরা-ভুমরী তুলে দিয়েছেন।

সুধীন্দ্রনাথের শেষ তিন পংক্তিতে নানাধরনের মূলভাব বিভক্ত হয়ে পড়েছে। যদিও মোটামুটি পংক্তিবিভাগ এবং ভাবসীমার নির্দেশ তিনি মেনে চলেছেন। ১২শ পংক্তিতে 'অঙ্কুশ' বিশেষ্য শব্দ, blessure এই ক্রিয়ার অনুবাদ নয়। এ ছাড়া dent শব্দে আসছে পুনরায় জান্তব অনুষঙ্গ। যে ক্রুদ্ধ দংশনের জ্বালা rongeant শব্দে ছিল, অঙ্কুশের চাবকানিতে সে ধরনের জ্বালা নেই। (এখানে 'দন্ত' শব্দ ব্যবহারের লোভ সুধীন্দ্রনাথ কী করে সংবরণ করলেন?)। ১৩শ পংক্তিতে hanté এই শব্দের ভাবগত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে দুটি শব্দ 'প্রেতভয়ে' এবং 'দ্রুতপদে', ১৪শ পংক্তিতে 'ভাবি' এই ক্রিয়াপদ হঠাৎ ইমোশনের ব্যাঘাত ঘটায়। ভাবনার সময় কই, এই প্রচণ্ড ভীত, তাড়িত, মৃত্যু-উচ্চকিত পলায়নের মধ্যে ভাবনা কোথায়! hanté par mon linceul এর বাংলা করা সত্যি দুঃসাধ্য, কারণ hanter (haunt) এই ক্রিয়াপদের বাংলা নেই, যেমন নেই linceul শবাচ্ছাদনের প্রকৃত কোনো ভাবানুষঙ্গ সংস্কৃত ঘেঁষা বাংলায়। এখানে সুধীন্দ্রনাথের পক্ষে কিছুটা কাব্যিক স্বাধীনতা না নিয়ে উপায় ছিল না। শবের প্রচ্ছদের ব্যাপারটা আনতে হলে, ঠিক সাবলীলতা রক্ষা করা যায় না। কারণ ভাষার চারিত্রিক অনুকূলতা কবির সহায় হয় না। সেজন্যই হয়তো এত সুন্দর কবিতাটির শেষ শব্দাংশে আড়ষ্টতা এসে পড়েছে। তার আগেই চমৎকার ওই "ঘুমাতে পারি না একা"র প্রবল সরল অভিঘাত—যেখানে জৈবিক উদ্বেগ, অযৌক্তিক হৃদয়রহস্যই প্রধান তাড়না, সেখানে অকস্মাৎ 'ভাবি' এই মস্তিষ্ক সম্পর্কিত নীরক্ত শব্দের ধীর গ্রেশিয়ার নেমে কেমন যেন তাল কেটে দেয়।

॥ ৩ ॥

'উৎকণ্ঠা'তে আমরা যেন সুধীন্দ্রনাথকেই মালার্মের চেয়ে বেশী করে পাই। শুনেছি ভালো কবি নাকি ভালো অনুবাদক হন না সবসময়ে, নিজের নিজস্বতা

দাঁড়িয়ে রাখতে পারা অনুবাদ করার চেয়ে কঠিনতর কর্ম হয়ে পড়ে জাত-কবির পক্ষে। সুধীন্দ্রনাথ অনূদিত মালার্মের সবকয়টি কবিতা সম্পর্কেই আমার এই মন্তব্য প্রযোজ্য নয়। আমি নিয়েছি কেবল একটি সনেট। এবং মূলের সঙ্গে মিলের ঢং সমানতালে রাখতে গিয়ে সুধীন্দ্রনাথ নিজে সেধে যে হাতকড়া পরেছেন, তার জন্যই তাঁকে মাঝে মাঝে শব্দগত অনুবাদ থেকে সরে যেতে বাধ্য হতে হয়েছে। তা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ কবিতাটি 'ভাবানুবাদ' নয়, বা মালার্মের অনুসরণেও নয়। অনুবাদই। এবং কোমলে-কঠোরে সুধীন্দ্রনাথের নিজস্ব কলমের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে, মালার্মের কাব্য বাংলাসাহিত্যের রসিকসভায় পরিবেশন।

মালার্মের মূল কথা ছিল 'ক্লার্তে' (clarte') clarity স্বচ্ছতা। সুধীন্দ্রনাথ তো সে মতের অনুগামী ছিলেন না। তাঁর রচনা-চরিত্র ও মালার্মের লেখার স্বভাব তাই দুই ভিন্নমেরু। 'উৎকণ্ঠা' নামের সনেটে মালার্মের ফরাসি অতি স্বচ্ছ, স্বচ্ছন্দ। ঝর্ণার মতো সাবলীল গতিতে এগিয়ে যায় কবিতাটি। বহু চলন্ত ক্রিয়াপদের ব্যবহারে এই গতি আরো দ্রুত হয়। এই গতিময়তা ধরা পড়েছে রজার ক্রইয়ের অনুবাদে। সুধীন্দ্রনাথের দীর্ঘ সমাসবদ্ধ শব্দ ব্যবহারের দার্ঢ্যে, তাঁর ঘনসংবদ্ধতার তেজ গাম্ভীর্যে পাঠককে মাঝে মাঝে ছায়ায় দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিতে হয়। প্রথমে মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে নিতে হয় শব্দার্থ কী—তারপরে ক্রমশ ধরা পড়ে ভাবরূপ। একবার পাঠ সাঙ্গ হলে কিন্তু মূল ভাবটিতে মালার্মের প্রতি বিশ্বস্ততা ঠিকই প্রতিভাত হয় পাঠকের সামনে।

রজার ক্রাইতে আমরা রজার ক্রাইকে পাইনা, পাই মালার্মেকেই, একটু ঘরোয়া পোশাকে, মিল-ছাড়ানো, যেন স্যুটবুট খুলে রেখে, পায়জামা পাঞ্জাবিতে। কিন্তু 'উৎকণ্ঠা'র প্রতিছত্রে মালার্মে যতটা, সুধীন্দ্রনাথও ততটাই উপস্থিত। তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বকে লুকোনো খুব সহজ ছিলনা। যদি মালার্মের সঙ্গে সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথকেও গ্রহণ করতে রাজী থাকি আমরা, তবেই সুধীন্দ্রনাথের মালার্মে অনুবাদের রসমাধুরী আমাদের ভোগে লাগবে। প্রতিকৃতি নিঃসন্দেহে মালার্মেরই। কিন্তু কলমটা যে সুধীন্দ্রনাথের! এ অনুবাদ তো ফোটোগ্রফিক অনুলিপি নয়, এ গুণী শিল্পীর হাতে-আঁকা প্রতিলিপি। পিকাসোর আঁকা ফ্রাঁসোয়াজের প্রতিকৃতিতে যেমন ফ্রাঁসোয়াজ যতখানি স্পষ্ট, অমোঘ পিকাসোও ততই স্পষ্ট, অনস্বীকার্য, এ অনুবাদে তেমনি মালার্মে যেমন স্পষ্ট উদ্ভাসিত, সুধীন্দ্রনাথও তেমনি।

কাদার পিয়ের ফার্লোঁ, এস, জে

সুধীন্দ্রনাথ

[বিস্তারিত আলোচনা নয়, এমনকী, সুধীন্দ্রনাথের যুগ স্রষ্টিকারী সার্থক কাব্যের মূল্য নির্ণয়ের চেষ্টাও নয়। কিছু ব্যক্তিগত প্রতিফলন, বন্ধুত্ব ও শ্রদ্ধা-জ্ঞাপনের ঐকান্তিক প্রয়াস। কবিকে জানতেন ও ভালবাসতেন, তাঁর সম্পর্কে এমন একজন বিদেশীর কিছু ব্যক্তিগত মন্তব্য।]

সুধীন্দ্রনাথের প্রগাঢ়-সমৃদ্ধ ব্যক্তিত্বের মধ্যে অনেক পরস্পর বিরোধী গুণাবলীর আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছিল। বেনারস ও প্যারিস তাঁর বিরাট মানসিকতাকে তৈরি করেছিল। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাচীন জগতের মতো ভলতেয়ার ও দিদরোর অষ্টম শতাব্দীর জগতে তিনি সমান স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতেন। তাঁর রক্তের মধ্যে উপনিষদ ছিল কিন্তু দেকার্ত ও স্পিনোজার রচনাবলীর সঙ্গে বেশী সান্নিধ্যবোধ করতেন। মহাভারত তাঁর কাছে ছিল বিষয় ও রূপকের রত্নখনি। গ্যেটে তাঁর অন্যতম প্রিয় লেখক ছিলেন। তাঁর কবিতা সম্পূর্ণ ব্যক্তি-কেন্দ্রিক ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ হলেও, রবীন্দ্রনাথ ও মালার্মের কাছে তিনি ছিলেন ঋণী। তিনি ছিলেন, এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্তও ছিলেন, বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে আশ্চর্যরকম অনুসন্ধিৎসু। এক বিরাট পাঠক, অসম্ভব বিজ্ঞ। জীবনের বিভিন্ন দিকের সর্বোত্তমদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখতেন। ছিলেন এক বিরাট পর্যটক, যিনি বহুদেশ এবং সেইসব দেশের লোকদের জানতেন এবং ভালবাসতেন। তাঁর গদ্য-রচনা ও কবিতায় প্রবেশ করা সহজ ছিল না। শিল্পী হিসাবে তিনি জনপ্রিয়তা অর্জনের কথা একবারও ভাবতেন না। তাঁর বন্ধু, সহকর্মী ও ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে দৈনন্দিন সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিনি অসম্ভব রকম সহজ ও সুগম্য ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে যে-কথা কখনও ভোলা যায় না, সেটি হচ্ছে তাঁর সরল হাসি যা তাঁর সদাহাস্যময় মুখে সব সময় লেগে থাকত। এক বিরাট অভিজাত এবং একজন সত্যিকারের ভদ্রলোক, তিনি সামাজিক সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতেন। আধুনিক ও উদার মনোভাব সম্পন্ন অথচ ঐতিহ্যে বিশ্বাসী এই মানুষটিকে বিভিন্ন দল ও আদর্শের লোকরাই ভালবাসত। বাইরে থেকে মনে হয় এই পরস্পর-বিরোধী

বৈশিষ্ট্য ও ধারাকে বাহ্যত কোন প্রচেষ্টা ছাড়াই নিজের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের ব্যবস্থা করেছিলেন।

ছেলেবেলা থেকেই তিনি কবিতাকে ভালবাসতেন। তাঁর কবিতার সংখ্যা খুব বেশী নয়। //কিন্তু সকলেই স্বীকার করবেন যে, তিনি বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ এক নূতন জিনিস এনেছিলেন। কিন্তু এই নূতন জিনিস কী, তা খুব সহজে বর্ণনা করা যায় না। এক নূতন ধরনের স্থাপত্যের গুণাবলী, সীমিত কথা, "ধ্রুপদী" গাম্ভীর্য, আবেগ ও অনুপ্রেরণা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য নিরন্তর ও সচেতন প্রচেষ্টা, সমৃদ্ধ তির্যক ভঙ্গি যা তাঁর কবিতাকে অনেক বেশী অর্থবহ করেছে, কবিতার ভাষাকে অপেক্ষাকৃত কম মধুর বা বিষণ্ণ করার দীর্ঘ ও সচেতন প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর কবিতা অনেক সঙ্গীতময় ও সমৃদ্ধ: যাঁরা সুধীন্দ্রনাথের রচনাবলী সমালোচনার দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন, তাঁরা এসব কথা সুস্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন। //মালার্মে ও ভালেরির কবিতার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরা ওঁদের কবিতার সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের কবিতা তুলনা করেছেন। //তিনি মালার্মেকে 'গুরু' বলে জানতেন কিন্তু তাঁর কবিতার মধ্যে এমন জিনিস আছে যাতে ভালেরিকে তাঁর অনেক কাছের কবি মনে হয়। ভালেরির মতোই তিনি আশ্চর্যজনকভাবে প্রতীকের সঙ্গে প্রাচীন সাহিত্যরীতির মিলন ঘটিয়েছেন, শব্দের যাদুময় প্রভাব, যুক্তি-নির্ভর বুদ্ধিবৃত্তি, গভীর নৈরাশ্য ও নৈঃশব্দের শান্তিময়তা। সবচেয়ে সুন্দর কবিতার কয়েকটিতে অর্থহীনতা ও বিষণ্ণতা পিছনে ধাওয়া করে। কিন্তু এই বিষাদময় অবস্থা এমন নিরুত্তাপ ও আবেগহীন ভাষায় বর্ণিত হয়েছে যে কবিতায় রোমান্টিকতার কোনো স্থান থাকে না, কবিতা এমন এক গভীর গাম্ভীর্যময় দার্শনিকস্তরে উপনীত হয় যা সুধীন্দ্রনাথের আগে বাংলা কবিতায় কদাচিত দেখা যায়। //সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ ছাড়াই, তাঁর আবেগহীন বর্ণনার মধ্যে আশঙ্কা ও দুঃখকে গভীরভাবে বোঝা যায়, আরও আবেগ ও রোমান্টিক-সুলভ শব্দের ব্যবহারে ঐ ফল পাওয়া যেত না। য়ুরোপীয় সমালোচকরা তাঁর কবিতা জানলে আপোলোনিয়ান হেলেনিজমের কথা বলতেন। বলতেন তাঁর কবিতায় ভারসাম্য ও সামঞ্জস্যময়, যুক্তিনির্ভরতা ও মানবতাবাদের কথা দুঃখের বিষয়, অনুবাদে সুধীন্দ্রনাথের গতিকে ঠিকমতো পাওয়া যায় না, তাঁর সুনির্দিষ্ট শব্দ চয়ন, শব্দের ধ্বনির প্রতি তাঁর ভালবাসা। //তাঁর নিজস্ব কাব্যের পদ্ধতি এবং পুরাপুরি হিন্দু ঐতিহ্যের প্রতীক ব্যবহারের জন্য তাঁর কবিতা

কোন য়ুরোপীয় ভাষায় অনুবাদ করা একরকম অসম্ভব। তা সত্ত্বেও সুধীন্দ্রনাথ মালার্মে ও ভালেরির কবিতার সুন্দর বংলা অনুবাদ করেছেন। হয়তো কোন বড় য়ুরোপীয় কবি একদিন তাঁর কবিতা অনুবাদ করতে উদ্যোগী হবেন। তিনি নিজে কিছু কবিতা অবশ্য ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন। কিন্তু তাদের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য।

পাসকাল কোথায় যেন বলেছেন যে, কোন কবি কোন বাড়ি বা সভায় ঢুকলে "একজন সার্থক কবি আসছে" বলার মধ্যে কবির প্রতি প্রশংসা বোঝায় না। একজন সত্যিকারের মহান ব্যক্তি একজন কবি বা একজন পণ্ডিত ব্যক্তি হতে পারেন কিন্তু প্রথমেই তিনি একজন মানুষ। পাসকালের ব্যঙ্গোক্তি 'কবিমশাই ভদ্রব্যক্তি নন', একই সত্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একজন কবি কেবল কবি হলেই তাঁকে ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখানোর দরকার হয় না। পাসকালের সংজ্ঞার অর্থ অনুসারে সুধীন্দ্রনাথ আশ্চর্যরকমভাবে 'ভদ্রব্যক্তি' ছিলেন, ছিলেন একজন সত্যিকারের মানবতাবাদী। তাঁর বন্ধু ও ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে ঘরোয়া ও আকর্ষণীয় আলাপ আলোচনার সময় কবির এই মানবতাবাদ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেত। কোন রকম কৃত্রিমতা ও ভান ছাড়াই আলোচনার সময় তিনি সবাইকে মোহগ্রস্ত করতেন। পৃথিবীর সব ব্যাপারেই তাঁর আগ্রহ ছিল। তাঁর সংস্কৃতির চেয়ে তাঁর মানবতাবাদ অনেক ব্যাপক ও গভীর ছিল। তিনি মানুষকে ভালবাসতেন: মানুষের স্বাধীনতার প্রশ্নকে তিনি বিশেষ মূল্য দিতেন। তাঁর কাছে যাঁরা আসতেন, তাঁদের সঙ্গে কীভাবে মানিয়ে নিতে হত, তা তিনি জানতেন। তিনি একজন বড় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী ছিলেন কিন্তু তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ব্যক্তিকেন্দ্রিক অহমিকা ও সংকীর্ণ অহং ভাব থেকে ছিল মুক্ত। তিনি আন্তরিকভাবে এবং গভীরভাবে অপরকে সম্মান করতেন।

অনেকে তাঁর কবিতায় দার্শনিক গুণাবলীর কথা বলেছেন। তাঁর সবচেয়ে তীব্র প্রেমের কবিতার মধ্যেও এই লক্ষণ দেখতে পাওয়া যাবে। একাডেমিক বা বিশেষজ্ঞ সুলভ অর্থে সুধীন্দ্রনাথ দার্শনিক ছিলেন না। মালার্মে ও ভালেরিও ছিলেন না। কিন্তু অষ্টম শতাব্দীর দার্শনিক অর্থে তিনি দার্শনিক ছিলেন, যিনি তাঁর সময়ের সব সমস্যাকে বিশ্লেষণ করে পুনর্মূল্যায়ন করেছেন, যিনি মানব সমাজের বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রশ্ন এবং শিল্পের দর্শন বিষয়ে গভীরভাবে আগ্রহী ছিলেন। যুক্তিবাদী মনই তাঁর দর্শনের ভিত্তি, এটাই আধিদৈবিক ও ধর্মীয় বক্তব্য সম্পর্কে তাঁকে সন্দিহান করেছিল। তিনি ভগবানে অবিশ্বাসী হলেও সত্যিকারের ধর্ম ও প্রকৃত দর্শন সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। অবশ্য তাঁর যুক্তিবাদী ও গ্রহণশীল মন সায় দিত না, এমন কিছু তিনি বিশ্বাস করতেন না। তিনি বড় বড় মিষ্টিকদের লেখা পড়েছেন, ভগবানে বিশ্বাসী

এমন অনেকেই তাঁর ঘনিষ্ঠ ও প্রিয় বন্ধু ছিল, অতীত যুগের বিশ্বাসের প্রতি তাঁর বিষণ্ণ ও অদম্য অন্বিষ্ট থাকলেও তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অবিশ্বাসী ছিলেন। নিরীশ্বরবাদ বা জড়বাদে তাঁর বিশ্বাসের মধ্যে কোন অন্ধ গোঁড়ামি ও সরলীকরণ ছিল না। সৌন্দর্য ও সমগ্রের জন্য সুধীন্দ্রনাথের মধ্যে এক নিরন্তর প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।"

দুর্ভাগ্যক্রমে, সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত যোগাযোগ খুব বেশী দিনের নয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে আমি তাঁর সহকর্মী ছিলাম। তিনি একজন বড় শিক্ষক ছিলেন এবং তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁকে খুব ভালবাসত। কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও অধ্যাপকের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের এমন আকর্ষণ আমি খুবই কম দেখেছি। তাঁর বক্তৃতাকে প্রয়োজনীয় ও আকর্ষণীয় করার জন্য তিনি অসম্ভব পরিশ্রম করতেন। তিনি সহজভাবে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মিশতেন, নিজের বাড়িতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁদের সঙ্গে কথা বলতেন, তাঁদের রচনা ও প্রবন্ধ সংশোধন করতেন, সব সময়ে উৎসাহ দিতেন, মুখে সর্বদা স্বাগত ও সাহায্যকারী হাসি লেগে থাকত। ছাত্রছাত্রীদের কাছ তিনি একজন শিক্ষক থেকে দিকদর্শনকারী ও বন্ধু ছিলেন। তিনি যেমন তাঁর পাঠকদের কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করতেন, তেমনি ছাত্রছাত্রীদের কাছেও অনেক কিছু চাইতেন; তিনি পেয়েছেনও অনেক! তাঁর বক্তৃতা কঠিন হলেও এত আকর্ষণীয় ছিল যে, অন্য কলেজ থেকেও ছাত্ররা তাঁর বক্তৃতা শুনতে আসত। তিনি তাঁর ছাত্রদের ভালবাসতেন, তারাও তাঁকে বুঝত। কবিতায় ও জীবনে সুধীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের মতোই দেশ ও দেশবাসীর সত্যিকারের প্রতিনিধি ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পরে অবিশ্বাস ও নাস্তিকতার যুগে তাঁর জন্ম, যে যুগ সংঘাত ও আশঙ্কার জন্য তমসাচ্ছন্ন, নৈরাশ্য ও হতাশা যে যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং সৌন্দর্যের প্রতি অদম্য ভালবাসার জন্য সন্দেহ ও বিবমিষা সত্ত্বেও তিনি সমসাময়িক কালের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সমগ্রের অনুসন্ধানে তিনি একক, শান্ত ও হাসিমুখে পারিপার্শ্বিকের অসহযোগিতা সত্ত্বেও মানুষের প্রতি বিশ্বাস রেখে এগিয়ে গিয়েছেন। তাঁর সময়ের বীভৎসতা সত্ত্বেও এই বিশ্বাস অটুট ছিল। তিনি একজন বড় শিল্পী এবং তার চেয়েও একজন বড় মানুষ ছিলেন।* অনুবাদ: নিরঞ্জন হালদার।

---

*র‍্যাডিক্যাল হিউমানিষ্ট, 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সংখ্যা'য় (আগষ্ট ২৮, ১৯৬০) প্রকাশিত ইংরেজী প্রবন্ধের অনুবাদ। প্রথম প্রকাশ: কালি ও কলম। অগ্রহায়ণ, ১৩৬৯।

এলেন রায়

সুধীন দত্ত ও এম. এন. রায়

সুধীন দত্ত সম্বন্ধে আমাদের কম-জানা ঘটনাগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে— এম. এন. রায়ের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব। রাজনৈতিক এবং তাত্ত্বিক আন্দোলন ও আলোচনার বাইরে বিশেষ কেউ রায়ের বন্ধু ছিলেন না এবং এই সকল আন্দোলনের মধ্যে তিনি নিজের ভিতর দিয়ে জীবনের বিভিন্ন দিক খুঁজে পেয়েছিলেন। অবশ্য কয়েকটি ক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিগত অনুরাগ তাঁকে রাজনৈতিক বন্ধুত্ব স্থাপনে সহায়তা করেছিল। কিন্তু তিনি দৈবাৎ নিজের অখণ্ড নৈর্ব্যক্তিক চিন্তার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য ব্যক্তিগত সম্পর্কে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন। আর সুধীন দত্তই বোধ হয় এ বিষয়ে বিশেষ ব্যতিক্রম। অবশ্য এমন নয় যে তাঁদের পারস্পরিক পরিচিতির সময় এম. এন. রায়ের ব্যক্তিগত বিশেষ কয়েকটি ভাবধারার সঙ্গে সুধীন দত্তের বিরোধ ঘটেছিল। আমার বিশ্বাস রাজনৈতিক ভাবধারা এবং পছন্দ ও অপছন্দ বিষয়ে সুধীন দত্তের যদি কোন আগ্রহ বা ঝোঁক প্রকাশ পেত, তবে সেটা এম. এন. রায়ের জন্য যতখানি হত ততখানি আর কারও জন্য নয়। সুধীন দত্ত কখনও রায়ের কোন রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অংশ না নিলেও তিনি সেগুলি ভালোভাবেই লক্ষ্য করতেন এবং সমালোচনাও করতেন। কিন্তু তাঁর সমালোচনায় কখনও কোনও বিকল্প মত প্রকাশের কথা আমার বিশেষ মনে পড়ে না। তাঁর প্রশ্নাবলী এবং সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী রায়ের কাছে অনেকটা চ্যালেঞ্জ মনে হয়েছিল এবং রায়কে তাঁর নিজের মন্তব্য ও চিন্তাধারার যুক্তি বিশ্লেষণে ও নতুন সূত্র উদ্ভাবনে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং এ বিষয়ে তিনি সর্বদা কৃতকার্য হয়েছেন। ১৯৪৫ সালে এই দুজনের যৌথ প্রচেষ্টায় "মার্কসিয়ান ওয়ে" এবং পরে "হিউম্যানিস্ট ওয়ে" নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে ভাববিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে পত্রিকাটি প্রকাশের ব্যবস্থা হয়েছিল। পত্রিকাটি প্রকাশের আগেই-এর উদ্দেশ্য বিষয়ে যে বিবৃতি প্রচার করা হয় তা সুধীন দত্তেরই লেখা ছিল। কিন্তু কী তত্ত্বগত, কী বাস্তব কর্মক্ষেত্রে, সুধীনের সাহিত্য-চর্চার ব্যাপক পরিধির মধ্যে রাজনীতির স্থান ছিল

খুবই সামান্ত। এই জন্তই এবং সম্ভবত তাঁর সামাজিক এবং পারিবারিক পটভূমি তাঁকে বাংলার প্রথম দিককার বৈপ্লবিক আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। অথচ এর মধ্য থেকেই রায়ের রাজনৈতিক জীবন এবং পরবর্তীকালের বুদ্ধিমত্তার উদ্ভব হয়েছিল। এই ধরণের বিভিন্ন পটভূমিই সম্ভবত এই দুই ব্যক্তির মধ্যে একটা পারস্পরিক বাড়তি আকর্ষণ সৃষ্টি করে। সুধীন দত্ত সম্পদ, সামাজিক মর্যাদা ও নিরাপত্তার সকল সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিলেন। রায় সুধীনের মার্জিত গুণাবলীকে শ্রদ্ধা করতেন। অপরদিকে সুধীন তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে রায়ের চিন্তাধারার প্রথা-বিরুদ্ধ মৌলিকতা ও বলিষ্ঠ মননের প্রশংসা করেছেন। পারস্পরিক ঐক্য এবং মতবৈষম্য তাঁদের দুজনের পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করেছে। এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, তার পটভূমি ও মানসিক গঠনের দিক থেকে তাঁদের দুজনের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল। এম. এন. রায়ের জীবনের শেষ দশকে তাঁর পুরনো বন্ধুগোষ্ঠীর বাইরে সুধীন দত্ত রায়ের একজন ব্যক্তিগত এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু হতে পেরেছিলেন। তাঁদের এই বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল তাঁদের পরিণত বয়সে এবং রায়ের রাজনৈতিক কাজকর্মের বাইরে। ফলে তাঁদের বন্ধুত্ব এবং ব্যক্তিগত সম্বন্ধের প্রকৃতিটি ছিল ভিন্ন ধরনের এবং সম্ভবত সেজন্যেই আমরা বর্তমানে যাঁদের কাছ থেকে এম এন রায়ের জীবনী লেখা আশা করতে পারি, তাঁদের সকলের থেকে সুধীন দত্ত রায়কে গভীরভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং বিভিন্ন দিক থেকে তাঁকে জেনেছিলেন।

১৯৫৪ সাল থেকেই আমি এই কথা ভাবছিলাম। কিন্তু তারও আগে আমার মনে হয়েছিল যে সুধীন দত্ত এম. এন. রায়ের জীবনী যদি নাও লেখেন তবে যাঁরা তা লিখবেন তাঁদের সঙ্গে সুধীনের যুক্ত থাকা উচিত। কিন্তু পরিহাসপ্রিয় এবং বাহ্য নৈরাশ্যবাদী হলেও আবেগ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সুধীন ছিলেন লাজুক, প্রকাশবিমুখ এবং মৌন। তাই আমি ভালোভাবেই জানতাম যে তাঁকে দিয়ে কাজটি এখনই করিয়ে নিতে চাইলে আমার ইচ্ছা ফলবতী হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এখন সেটা অত্যন্ত দেরি হয়ে গিয়েছে। ১৯৫৫ সালে আমি যখন লনডনে, তখন ওখানকার একটি প্রকাশক রায়ের জীবনী লেখার জন্তে আমার কাছে একটি প্রস্তাব পাঠান। কিন্তু প্রকাশক ও আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য এমন কোনো লেখকের নাম আমরা পাইনি। সুধীনও আমার সঙ্গে ঐ প্রকাশকের কাছে যান। কিন্তু আমাদের আলোচনা বিশেষ ফলপ্রসূ

হয় নি। এই বিষয়টি নিয়ে তখন আর আমি কথা বলিনি। আমি জানতাম, যে এম. এন. রায় সংগ্রহশালা তৈরির কাজ শেষ হলে অনেক নতুন তথ্য জানা যাবে, তখন তাঁর জীবনী লেখায় সেগুলি খুবই সহায়ক হবে।

গত বছরের শেষদিকে যখন আমাদের ধারণা অনুযায়ী সংগ্রহশালার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছিল আমরা তখন তাঁর জেলে লিখিত অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিগুলির সম্পাদনার কথা ভাবছিলাম। দীর্ঘদিন বিদেশে থাকার পর সুধীন তখন সবে ভারতে ফিরে এসেছেন। এই সময় রায়ের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিগুলির সম্পাদনার কাজে যুক্ত থাকার জন্য আমি সুধীনকে অনুরোধ করি। ১৯৫৪ সালে এম. এন. রায় স্মৃতি তহবিলের জন্য যখন প্রথম আবেদন করা হয় তখনই সুধীন সংগৃহীত লেখাগুলো নিয়ে স্মারক-সংস্করণ প্রকাশের বৃহত্তর পরিকল্পনার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। এমন কী, সেই সময় তিনি রায়ের স্মৃতিকথার প্রথম কয়েকটি অধ্যায় সম্পাদনার কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন। পরে অবশ্য স্মৃতিকথা প্রকাশের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। জেলে লেখা অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার কাজটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরী। সুধীন ঐ নয় খণ্ড পাণ্ডুলিপির কথা জানতেন এবং কয়েকবার দেরাদুনে গিয়ে সেগুলি দেখেওছিলেন। আমার অনুরোধে তাঁর সাড়া ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। ঐ অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিগুলির প্রধান অংশে এমন বিষয়ের আলোচনা ছিল যে বিষয়ের উপর তালিকাভুক্ত সম্পাদকদের কেউই সুধীন দত্ত অপেক্ষা যোগ্যতর ছিলেন না। কারণ একজনের পেশা রাজনীতি এবং অপরজনের পেশা সাহিত্য হওয়াতে পরস্পরের পেশার প্রতি তাঁদের আগ্রহ ছিল সামান্য। কিন্তু তাঁদের দুজনের আগ্রহ ও বুদ্ধিবৃত্তির পরিধি এত ব্যাপক ছিল যে দুজনের পেশাগত আগ্রহের মধ্যে পার্থক্য অপেক্ষা মিল ছিল অনেক বেশী। ছয় বছর ধরে জেলে এম. এন রায় যা লিখেছিলেন তার নাম দেওয়া হয়েছিল 'দি ফিলসফিক্যাল কন্‌সিকোয়েন্সেস অব মডার্ণ সায়েন্স।' ঐ পাণ্ডুলিপির আলোচ্য বিষয়ই ছিল তাঁদের দুজনের বহু রাত্রির আলোচনার বিষয়বস্তু যা তাঁদের দুজনকে গভীরভাবে ভাবনার রাজ্যে নিয়ে যেত এবং উভয়ের চিন্তাধারার বিনিময় ঘটাত। ঐ সব রাত্রির আলোচনায় যাঁরা উপস্থিত থাকতেন এবং এই দুই ব্যক্তির মৃত্যুর পর যাঁরা আজও জীবিত, তাঁদের স্মৃতিতে সেগুলি অক্ষয় সম্পদ হয়ে থাকবে।

তাঁদের দুজনের জ্ঞান ও মানসিক বিস্তৃতি ছিল বিশ্বকোষের মত। কাজ-

ও সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তাঁদের দুজনের মস্তিষ্কের যে পরিচয় পাওয়া যায় আমার কাছে তা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ও সুন্দরতম বিস্ময় বলে মনে হয়েছিল। এই ধরনের দুই ব্যক্তিত্বের মিলন কদাচিৎ ঘটে থাকে। আমরা আমাদের জীবদ্দশায় এরকম অভিজ্ঞতালাভ আর কেউ করতে পারব বলে মনে হয় না। প্রকৃতির কী বিরাট অপচয়! এই দুইজন তাঁদের রচনা এবং কাজের মধ্যে বিরাটত্বের বিস্ময়কর অবদান রেখে গেলেও, আমরা যারা তাঁদের চিনতাম, তাদের কাছে তাঁরা জীবিতকালে কী ছিলেন, সে ধারণা ধীরে ধীরে আবছা হয়ে যাবে। দুজনের রচনা ও কাজের মধ্য দিয়ে বিরাটত্বের যে ছাপ তাঁরা রেখে গেছেন এবং জীবিতকালে তাঁরা যত বিরাট পুরুষই থাকুন না কেন এখন তার পরিমাপের একমাত্র মানদণ্ড হচ্ছে দুঃখ এবং তাঁদের হারানোর বেদনা। স্মারক হিসাবে আমাদের মনে ভেসে উঠছে ছবির পর ছবি। মনে পড়েছে অজস্র দ্রুতগামী মুহূর্ত, তর্কাতর্কি এবং অন্যান্য পরিবেশের কথা, বাস্তব ঘটনার মাধ্যমে ওইসব মুহূর্তের বাণী একেবারেই অর্থহীন। কারণ কোন ঘটনার নাটকীয়তা বা গুরুত্ব বর্ণনা করে ওইসব মুহূর্তের তাৎপর্য বোঝানো যাবে না। আলোচনা, তর্কবিতর্কের পরিবেশ ও মানসিক পরিমণ্ডলই সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। খুব ভোরে দুজন থারমোডাইনামিক্স অথবা অন্য কোন বৈজ্ঞানিক বিষয় কিংবা ধর্ম-নিরপেক্ষ নীতিবোধের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কথা বলছেন, কথা বলতে বলতে নিজেদের আসন থেকে উঠে দাঁড়াচ্ছেন, চিন্তাধারার গতিশীলতার জন্য শারীরিক অস্থিরতা প্রকাশ, কথা বলতে বলতে হাঁটা এবং দুজনের কাছে গ্রহণযোগ্য নতুন চিন্তার হদিস পেয়ে হঠাৎ হেসে ওঠা—সমস্যাকে এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা—এসব কি বর্ণনা করা সম্ভব?

আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয় স্টোর রোডে বীরেন রায়ের ফ্ল্যাটে। সুধীন শীলা ব্যানার্জী—অডেনের সঙ্গে এসেছিলেন। তারপর বীরেন রায়ের বেহালার বাড়িতে। সেদিন তাঁর সঙ্গে সম্ভবত একজন কম্যুনিষ্ট অধ্যাপক ছিলেন। তারপর তিনি তাঁর "পরিচয়" পত্রিকার সাহিত্যিক গোষ্ঠীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য আমাদের নিমন্ত্রণ করেন। ঐ সভাতেই ভারতীয় কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে আমাদের প্রথম উত্তেজনাহীন আলাপ আলোচনা হয়। কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে যুক্ত না থেকে সুধীন তাঁর পত্রিকার ভার কম্যুনিষ্টদের হাতেই ছেড়ে দেন। "পরিচয়" পত্রিকার সাহিত্যিক গোষ্ঠীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পরই সুধীন এস. কে. দের সঙ্গে আমাদের চাঁদনী চক অফিসে আসেন। প্রথম দিককার

সাক্ষাতের মধ্যে ব্যবধান খুব কমই ছিল এবং তারপর থেকে আমাদের যোগাযোগ খুব নিয়মিত ও ঘনিষ্ট হয়। তার কিছুদিন পরে আমরা নববিবাহিত স্ত্রী রাজেশ্বরীসহ সুধীনের কলকাতা আগমনের জন্য অপেক্ষা করে থাকি। ইতিমধ্যে আমরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে গিয়েছি এবং প্রতিটি সন্ধ্যা হয় সুধীনের ফ্ল্যাটে নতুবা এস. কে. দে-র বাসায় কাটত। সুশীল দে তখন কলকাতা বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত, সুধীন দত্ত কাজের দিক থেকে সরকারীভাবে দে-র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে সুধীন পুরোপুরি অ-রাজনৈতিক ছিলেন না। অন্তত এই অর্থে যে কল্যাফলের ব্যাপারে জনসাধারণের দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি খুবই সচেতন ছিলেন।

প্রথম পরিচয়ের পর তাঁর মনে আমাদের সম্পর্কে বিশেষ ধারনা সৃষ্টি হয়েছিল, তা-ই পরবর্তী এক দশক আমাদের বন্ধুত্বকে ঘনিষ্ঠ করে। সুধীন দত্ত বা এম. এন. রায় দুজনের কেউই বিতর্কের জন্য অপ্রস্তুত ছিলেন না। তখন দুজনেই সুপরিচিত এবং কিছু লোক ছিলেন দুজনেরই বন্ধু। দুজনের বন্ধুত্বের সম্পর্কের মধ্যে আশাতীতভাবে কিছু ঘটেছিল। রাজনীতিকের মধ্যে বিজ্ঞানে আগ্রহ ও জ্ঞান এবং মানুষের অস্তিত্বের মূল সম্পর্কে আগ্রহান্বিত দেখে কবি হয়তো বিস্মিত হয়েছিলেন। এবং রাজনীতিকও দেখলেন যে কবিতাও একই উৎস ও গতি থেকে প্রেরণা পেতে পারে। কলকাতার সেই উদ্দীপনাময় ও উৎসাহব্যঞ্জক রাত্রির আলোচনাগুলিই রায়ের শেষ ও বড় মৌলিক রচনা দুই খণ্ডে সমাপ্ত "রিজ্‌ন, রোম্যানটিসিজম্ অ্যাণ্ড রিভোলিউশন" গ্রন্থের ভাবধারা গড়ে তুলতে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে।

দুজনেই সব সময় কিছু চিন্তা করতেন। চিন্তা ছাড়া তাদের এক মুহূর্তেও চলত না। যুক্তি যে প্রেরণার উৎস হতে পারে,—সেকথা তাঁদের জীবন প্রমাণ করেছে। ক্ষতি তো নয়ই বরং মানুষের আবেগকে আরও তীব্র করতে পারে। তাঁদের বন্ধুত্ব দুজনের মধ্যেই সীমিত ছিল না। রাসেল স্ট্রীটে অথবা দেরাদুনে রায়ের 'সেকুলার আশ্রমে' (এক বন্ধুর উক্তি) তাঁরা নিভৃত আলোচনায় পরস্পরের সাহচর্য উপভোগ করলেও তাঁদের ক্রমবর্ধমান বন্ধুগোষ্ঠীর মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তাঁরা নিজেদের পূর্ণতাকে সবচেয়ে ভালভাবে প্রকাশ করতেন এবং এইভাবে দুজনেই নতুন নতুন বন্ধু লাভ করতেন।

অনুবাদ: গণেশ শাসমল। ["র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট" পত্রিকার **'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত'** সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধের বাংলা অনুবাদ।]

মধুসূদন চক্রবর্তী

রাজনৈতিক মঞ্চে সুধীন্দ্রনাথের কবিতা

সুভাষচন্দ্র তখন কারাগারে। ১৯৪০ সাল। জাতীয় কংগ্রেসের দক্ষিণ-পন্থী নেতৃগোষ্ঠীর মতবাদের সঙ্গে সুভাষের বিরোধের ফলে তিনি কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত এবং ফরওয়ার্ড ব্লক নামে আলাদা দল গঠন করেছেন। বাঙলার প্রাদেশিক কংগ্রেস তখন সুভাষগোষ্ঠীর দখলে। বাঙলার জনমানসেও সে সময় সুভাষচন্দ্রের অসামান্য প্রভাব। হাজার হাজার লোক সমবেত হত সুভাষগোষ্ঠী কংগ্রেসের আহূত সভাগুলিতে—কী শহরে, কী গ্রামে, সর্বত্রই বিপুল সমাবেশ।

এরূপ জনসভাগুলিতে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক মতাদর্শের বিশ্লেষণ করে বক্তৃতা দিতেন নবদ্বীপের একজন খ্যাতিমান সাহিত্যিক, নাট্যকার ও রাজনৈতিক কর্মী শ্রীনিতাই ভট্টাচার্য। সে সময় তাঁর মতো বাঙলায় এত ভালো বক্তৃতা—বিশেষ করে রাজনৈতিক বক্তৃতা—কম লোকই দিতে পারতেন। রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণে, ভাষা বিন্যাস এবং বাগ্মিতায় তিনি ছাত্র ও যুব-মনের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারতেন। নিতাই ভট্টাচার্যের কণ্ঠে তখন শুনতাম কবি সুধীন্দ্রনাথের কবিতা। সমবেত জনতাকে উদ্দেশ্য করে তিনি রাজনৈতিক ঘটনাবলী পর্যালোচনা করতে গিয়ে মাঝে-মাঝে উদ্ধৃত করতেন সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতার কখনও দু'এক লাইন—কখনও পংক্তির পর পংক্তি অথচ খাপছাড়া লাগত না। মনে আছে তাঁর কবিতার একটি পংক্তি: "তাই অসহ্য হয়েছে আত্মরতি, অন্ধ হলে প্রলয় বন্ধ থাকে?" এতকাল পরে অবশ্য মনে নেই কোন্ পটভূমিকায় বা পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ওই লাইনটির উল্লেখ করতেন। শ্রীভট্টাচার্য তখন প্রাদেশিক কংগ্রেসের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক নদীয়ার তারকদাস বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক আদর্শ প্রচারে সারা বাঙলা চষে বেড়াচ্ছেন। সুভাষচন্দ্রের বিপ্লবী ও গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার সঙ্গে দেশাত্মবোধের আদর্শ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একের পর এক সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা আবৃত্তি করতে এর আগে কোনও রাজনৈতিক বক্তাকে দেখিনি।

অবশ্য মাঝে মাঝে তিনি রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের কবিতাও আবৃত্তি করতেন। দেশাত্মবোধ প্রচারে এবং আত্মশক্তিতে বলীয়ান হওয়ার আহ্বান জানিয়ে জনচিত্তকে উদ্বুদ্ধ করতে সুধীন্দ্রনাথের কবিতা সেদিন ছিল নিতাইবাবুর প্রধান হাতিয়ার।

সে সময় সুধীন্দ্রনাথের কবিতা সাধারণ লোকের মধ্যে তেমন প্রচার না হলেও বিদগ্ধ সমাজে, রবীন্দ্র পরবর্তী পর্যায়ের কবিগোষ্ঠীর মধ্যে সমাদৃত ছিল। অনেককে বলতে শুনেছি সুধীন্দ্রনাথের কবিতা দুর্বোধ্য! কিন্তু নিতাইবাবু বলতেন, "না, তাঁর কবিতা প্রাণধর্মী, জীবন্ত।" কূপমণ্ডূকতা থেকে মনকে উদ্ধার করে তাকে সুরুচি ও স্নিগ্ধতায় ভরে তোলার প্রয়াস ছিল সুধীন্দ্রনাথের মধ্যে। সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আসরে তাঁর কবিতা আবৃত্তি ও আলোচনার অর্থ উপলব্ধি করিতে পারি। কিন্তু সাহিত্য আসরের চৌকাঠ পেরিয়ে সে কবিতা রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হবে এটা অভাবনীয়। সুধীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব হয়েছিল। সেদিন রাজনৈতিক সভামঞ্চ থেকে তাঁর কবিতা লোকে মুগ্ধ হয়ে শুনেছে। তারিফও করেছে। তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী আমি এবং আমার মতো আরও অনেকে।

একটি বাঙলা দৈনিকের প্রতিবেদকরূপে এই সব সভায় আমাকে যেতে হত। বক্তৃতার বিবরণও সংগ্রহ করতাম। সে সময়ের সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা-গুলি ঘাটলে ওইসব সভার বিবরণে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতার উল্লেখ পাওয়া যেতে পারে। নিতাইবাবুর সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা ছিল কিনা জানি না, কিন্তু তাঁর কবিতার এত বড় সমঝদার আমি কমই দেখেছি। সুধীন্দ্রনাথের কবিতা আলোচনা করতে গিয়ে তিনি অভিভূত হয়ে পড়তেন। অভিভূত আমরাও হতাম। যেমন প্রাণময় ছন্দ, তেমনি ভাষার মাধুর্য, বলিষ্ঠ তো বটেই।

একদিনের ঘটনার কথা মনে পড়ে। রসা রোডে দেশনেত্রী হেমপ্রভা মজুমদারের বাড়িতে আমরা কজন বসে আছি। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক ও অভিনেতা সুশীল মজুমদারের মাতা। নিতাইবাবু, তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সহ আমরা কজন হেমপ্রভা বৌদি সহ যাব বেলিয়াঘাটায় একটি সভায়। সময় অপরাহ্ণ। আকাশ মেঘে ঢেকে এসেছে দেখে যাত্রা-বিলম্ব। ততক্ষণ আমরা বসন্তদার (সুভাষচন্দ্রের একনিষ্ঠ অনুরাগী বিপ্লবী নায়ক বসন্ত মজুমদার—হেমপ্রভা মজুমদারের স্বামী) মুখে

সেকালের দেশনেতাদের মজার মজার গল্প শুনছি। এমন সময় বৃষ্টি নামল। অঝোরে বৃষ্টি। বসন্তদা কী একটা বলার জন্ম ঘরের মধ্যে চলে গেলেন। নিতাইদা আপন মনে গুণ গুণ করে কী যেন আওড়াচ্ছেন। দৃষ্টি উদাস। জিজ্ঞাসা করলাম, 'গান?' "না, কবিতা", বললেন নিতাইদা। স্থধীন দত্তের কবিতা।"—অনুরোধে তিনি আবৃত্তি শুরু করলেন :

যোদের সাক্ষাৎ হল অশ্লেষার রাক্ষসীবেলায়,
সমুদ্যত দৈবদুর্বিপাকে।
আধো-জাগা অগ্নিগিরি আমাদের উদ্ধত হেলায়
সান্দ্র স্বরে কী অনিষ্ট হাঁকে ;
বিচ্ছেদের খর খড়্গ কোথা যেন শানায় অস্থরে,
তারই প্রতিবিম্ব হেরি মুহুর্মুহু আকাশ মুকুরে,
বজ্রধ্বজ প্রভঞ্জন রথ রাখি অলক্ষ্যে, অদূরে—

*　　　*　　　*　　　*

যেমনি কণ্ঠ, তেমনি বলার ভঙ্গী, সেই সঙ্গে কবিতার ভাষা ও ছন্দ। সব মিলিয়ে মনে হচ্ছিল, রাজনৈতিক সভা দূরে থাক। আজ বস্থক না একটি কবিতার আসর, এমন পরিবেশ তো আর পাওয়া যাবে না! তারকদাও নিবিষ্টমনে শুনছিলেন কবিতা। বসন্তদাও বিস্মিত বিমূঢ় হয়ে শুনছেন। বেলিয়াঘাটার সভাটি বানচাল হওয়ার আশঙ্কায় তারকদার মন খুস্ খুস্ করছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখলাম তিনিও স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে আছেন নিতাইবাবুর দিকে।

তারকদার মতো 'বে-রসিক' রাজনৈতিক নেতাকে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে কবিতা শুনতে দেখে নিতাইদার উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। হেমপ্রভা বৌদি আসরে এসে বসেছেন—আরও দু'তিন জন, তাঁদের কথা মনে নেই। বাইরে মেঘের গুরু গুরু আওয়াজ! নিতাইবাবু একটু চড়া গলায় শুরু করলেন :

বরষাবিষণ্ণ বেলা কাটালাম উন্মন আবেশে।
জনশূন্য হৃদয়ের কবাট উদ্ঘাটি
স্মরণের চলাচল করিলাম সহজ, সরল
দৃষ্টিহারা নেত্রপাতে দেখিলাম সন্নত আকাশে
এই মত আর এক দিবসের ছবি।
অবিশ্রান্ত বৃষ্টির বিলাপে
শুনিলাম সে-কণ্ঠের স্নেহ-সম্ভাষণ।

অর্গলিত বাতায়নে ঝটিকার নিরর্থ আক্রোশে
বিচ্ছেদবিধ্বস্ত হিয়া বাধানিল ক্ষুব্ধ অক্ষমতা
নির্বিকার, নিরুত্তর রুক্ষ বিধাতারে ॥

*   *   *   *

এল সন্ধ্যা রিক্ত বরিষণ ;
দিগন্তের মুমূর্ষু বর্তিকা
প্রাক নির্বাপণ দীপ্তি প্রজ্জলিত করিল সহসা
তারপর অন্তরে বাহিরে
অন্ধকার বিস্তারিল শবপ্রাবরণী ॥

তখন আমার বয়স অল্প, কিছু বুঝেছি কিছু বুঝিনি। অন্যান্যেরাও তাই। তবে শুনতে ভালো লেগেছিল। কবিতার যে মোহিনী শক্তি আছে, তা উপলব্ধি করেছি। আর একটা কথা তখন মনে হয়েছিল :

কবি আপনার মনে যত গান গাহে।
নানা জনে লহে তার নানা অর্থ টানি।—

আমরাও নানা অর্থ টেনে এনে সেই কবিতা গুচ্ছের রস সংগ্রহ করেছি। নিতাইদা তখন ভাবে বিভোর। বৃষ্টি ততক্ষণে থেমেছে, তারকদা উঠি উঠি করার উপক্রম করেও সাহস পাচ্ছেন না, নিতাই ভট্টাচার্য না গেলে সভা জমবে না। তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য লোকের ভিড় হত বেশি। নিতাই বাবুর ওঠার নাম নেই। চা এল, এল সেই সঙ্গে গরম গরম মুড়ি ও নারকেল কুচি। আর যার কোথায়? সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল রাত্রি। সভার উদ্যোক্তারা ফোনে জানালেন বৃষ্টি থেমে যাওয়ায় বেশ কিছু লোক আসতে শুরু করেছে। কিন্তু এদিকে সভা করার 'মুড' নিতাইদারও নেই—নেই অন্যদেরও. এভাবে একটা রাজনৈতিক সভা হল পণ্ড। সুধীন দত্তের কবিতা দিয়ে যে সভার আসর জমে উঠত, সে কবিতাই মূলতঃ ওই দিনের সভা পণ্ডের জন্য হল দায়ী।*

---

* 'কালি ও কলম' পত্রিকার 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সংখ্যা'য় প্রকাশিত প্রবন্ধের অংশবিশেষ।

দত্ত পরিবার, সুধীন্দ্রনাথ ও 'পরিচয়'-এর প্রকাশ

সুধীন্দ্রনাথ যে দত্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন, তা অতি প্রাচীন ও বুনিয়াদি বংশ। কলকাতাতেই এঁদের আদি বাস। কলকাতা নামকরণ হবার এবং ইংরেজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে গোবিন্দপুরে—বর্তমানে যেখানে ফোর্ট উইলিয়াম, সেখানে এঁরা বাস করতেন। ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে যখন ফোর্ট উইলিয়াম নির্মিত হয়, তখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এঁদের বাসস্থান দখল করেন ও বসতবাটি তৈরি করার জন্য চোরবাগানে একখণ্ড নিষ্কর ভূমি প্রদান করেন। তখন থেকে এঁরা ৮৩ নং মুক্তারাম স্ট্রীটে সেই জমিতে বাড়ি তৈরি করে বাস করছিলেন।

লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত এই বংশের এক জন কৃতী পুরুষ। তৎকালীন কায়স্থ সমাজে লক্ষ্মীনারায়ণ বাবুর বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল ও একজন বিশিষ্ট ধার্মিক ব্যক্তি বলে তিনি সমাজে বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। কলকাতায় খুবই কম কায়স্থ বংশ ছিল যাঁরা দত্ত বংশের সঙ্গে আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন না। এঁরই চোরবাগান ভবনে 'সধবার একাদশী'র সপ্তম অভিনয় হয়।

লক্ষ্মীনারায়ণ বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র দ্বারকানাথের সঙ্গে বাগবাজারের সুবিখ্যাত বসু বংশের কন্যা রক্ষাকালীর বিবাহ হয়। তিনি প্রথম জীবনে ইস্টার্ণ বেঙ্গল রেলের টাইম-টেবল বিভাগে কাজ গ্রহণ করেন। কিন্তু সে কাজে বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা না দেখে কয়েক বৎসর পরে তিনি ঐ কাজ ছেড়ে দিয়ে গ্রীকদেশীয় সুবিখ্যাত সওদাগর রেলি ব্রাদার্সের মুৎসুদ্দীর পদ খালি হলে, ঐ পদের জন্য প্রার্থী হন। ঐ কোম্পানির বড় সাহেব, অন্যান্য কর্মপ্রার্থীদের মধ্যে দ্বারকানাথের পরিচয় পেয়ে, তাকে উচ্চ পদে মনোনীত করেন। দ্বারকানাথ এক লক্ষ টাকা জমা দিয়ে সেই পদ গ্রহণ করেন। তখনকার দিনে ঐ প্রকার মুৎসুদ্দীর পদ লোকের বিশেষ কাম্য ছিল এবং দ্বারকানাথও নিজের প্রতিভাবলে ও কর্মশক্তিতে আপিসের সাহেবদের এরকম মুগ্ধ করেন যে, শেষ পর্যন্ত ঐ পদটি পরিবারের কায়েমী কাজে পরিণত হয়।

দ্বারকানাথের চার ছেলে। জ্যেষ্ঠ ধীরেন্দ্রনাথ, মধ্যম হীরেন্দ্রনাথ, তৃতীয়

অমরেন্দ্রনাথ ও কনিষ্ঠ বিজয়েন্দ্রনাথ। হীরেন্দ্রনাথ ও অমরেন্দ্রনাথ সহোদর হলেও দুজন একেবারে বিভিন্ন প্রকৃতিতে গঠিত। একজন ছোটবেলা থেকে আজীবন বিদ্যানুশীলনে, ধর্মশাস্ত্রালোচনে ব্যস্ত,— অপরজন বিদ্যাচর্চার নামে ভীত। হীরেন্দ্রনাথ সাংসারিক গণ্ডগোল থেকে দূরে থেকে নিজের লেখাপড়াতেই ব্যস্ত থাকতেন। তাছাড়া এ বয়সেই তিনি ধীর, স্থির, শান্ত, বিচক্ষণ, উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন ও কাজে অসাধারণ পটু। সেজন্য সকলে তাঁকে মেনে চলত, ভয় করত, কেউ তাঁর অবাধ্য হত না। নৈতিক চরিত্র বলে যিনি বলীয়ান, বিদ্যায় যিনি সবার অগ্রগণ্য (হীরেন্দ্রবাবুর পূর্বে দত্ত বংশে কেউ প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্যন্ত উত্তীর্ণ হয়নি), পরিবারের মধ্যে তাঁর এরূপ আধিপত্য বোধ হয় অসাধারণ নয়। তবে হীরেন্দ্রনাথের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল লোকের স্বাধীনতায় অযথা হস্তক্ষেপ না করা।

ইতিমধ্যে দ্বারকানাথের চোরবাগানস্থ পৈতৃক বাড়ি ও স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি সমস্তই এতকাল যৌথ সম্পত্তিভুক্ত হয়ে অবিভক্ত অবস্থায় রক্ষিত ছিল এবং যদিও উপার্জনক্ষম ব্যক্তিরা নিজেরাই নিজেদের খরচ চালাতেন, তবুও সমগ্র পরিবার এক রকম একান্নবর্তী ছিল বললেও অত্যুক্তি হয় না। দ্বারকানাথ পরিবারের সর্বাধিক রোজগেরে পুরুষ ছিলেন এবং সরকারী তহবিল তাঁরই অর্থে সর্বাধিক পুষ্ট ছিল— তবু সমগ্র পরিবারের বহু অযথা অত্যাচার ও অবিচার তাঁরই উপর অবিরল ধারায় বর্ষিত হত।···তাঁর নিজের বাসের জন্য ছিল তিন তলার ছাদে একটি বড় কাঠের ঘর। পুত্ররা বড় হওয়ার তাদের একটি ঘরে কুলায় না।···অন্য লোকের দখলে বহু অব্যবহৃত ঘর পড়ে থাকলেও, তাঁরা নিজের অধিকার একচুলও ছাড়তে রাজী হলেন না। অবশেষে দ্বারকানাথ ঐ বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র বাসের ব্যবস্থা খুঁজতে লাগলেন।

হাতীবাগানে একখণ্ড জমি কিনে সেখানে বাসস্থান তৈরি করতে শুরু করলেন। হাতীবাগানের বাড়ির নির্মাণকার্য সম্পন্ন হওয়ামাত্রই তিনি সপরিবারে একবস্ত্রে চোরবাগান থেকে চলে আসলেন। হাতীবাগানে আসার কয়েক মাস পরেই পটলডাঙ্গার প্রসিদ্ধ বসু মল্লিক বংশের শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বসু মল্লিক মহাশয়ের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী ইন্দুমতীর সঙ্গে হীরেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। হীরেন্দ্রনাথ ও ইন্দুমতীর জ্যেষ্ঠ পুত্র, আমাদের দাদা, সুধীন্দ্রনাথ ইংরেজি ১৯০১ সালে ৩০ অক্টোবর হাতীবাগানের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। আমাদের ভাইবোনদের মধ্যে তিনি দ্বিতীয় সন্তান। বাবার পঁচিশ বছর বয়সে আমার

দিদি জন্মগ্রহণ করেন। সুধীন্দ্রনাথ তার চেয়ে প্রায় আট বছরের ছোট ছিলেন। দাদার চেয়ে আমি তিন বছরের ছোট ছিলাম। আমাদের আর দুই ভাই-এর নাম রণেন্দ্রনাথ ও শৌরীন্দ্রনাথ।

শৈশবকালে বাড়িতেই আমাদের বিদ্যাচর্চা আরম্ভ হয়। আমাদের পরিবারে বাবাই শিক্ষার দিকে বরাবর বিশেষ মনোযোগ দিয়ে এসেছিলেন এবং তাঁর আদর্শ কেন্দ্র করেই এই বাসাতে জ্ঞানলাভের স্পৃহা সকলের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে! বৈদান্তিক হবার ফলে তিনি সংস্কৃত শিক্ষার দিকে বিশেষ করে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অ্যানি বেসান্ত প্রতিষ্ঠিত কাশীর থিওসফিক্যাল স্কুলে আমাদের সংস্কৃত এবং অন্যান্য বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা হয়। ১৯১৪ সালের জুলাই মাসে সুধীন্দ্রনাথ ও আমি কাশীতে থিওসফিক্যাল স্কুলে ভর্তি হই। তিন বৎসর আমরা দুজনে একই সঙ্গে কাশীতে বিদ্যাশিক্ষা লাভ করি। ছোটবেলা থেকেই দাদা ও আমি একত্র থেকেছি, তাঁকে ছায়ার মতো অনুসরণ করেছি. একই সঙ্গে বিদ্যালয়ে গিয়েছি ও ফিরেছি। কারও দেরি হলে পরস্পর পরস্পরের জন্য অপেক্ষা করেছি। এই ভাবেই কাশীতে ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত থেকে, আমার বয়স যখন চৌদ্দ বছর মাত্র, কলকাতায় ফিরে আসি এবং উভয়েই ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে ভর্তি হই। কাশীতে বিশেষভাবে সংস্কৃত শিক্ষার পরেও বাবা নিজে পরবর্তীকালে কালিদাস পড়িয়েছেন. হরিচরণ কাব্যতীর্থের কাছে দীর্ঘদিন দাদা কাব্য অলঙ্কার পড়েছেন এবং বাবার নির্দেশ ছিল যে, সিলেবাস বহির্ভূত হলেও কোন আদিরসাত্মক পংক্তি যেন পড়ার সময় পণ্ডিত মশায় বাদ না দেন। শিক্ষা সম্বন্ধে এমন মুক্ত ধারণা থাকায় আমাদের পড়াশুনো খুব সুস্থ আবহাওয়ায় চলেছিল। পর বৎসর দাদা ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন এবং স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হন। ছোটবেলায় কাকা অমরেন্দ্রনাথের প্রভাব আমাদের উপর ভীষণভাবে ছিল, কিন্তু কাশীতে জ্যেঠামশায়ের কাছে তিন বছর পড়তে থাকায় কলকাতার বাল্যস্মৃতি অনেকটা ক্ষীণ হয়ে এল। কলকাতায় ফিরে এসে যখন দাদা কলেজে ভর্তি হন, তখন থেকে আমাদের মামা সুবোধচন্দ্র বসু মল্লিক মশায়ের প্রভাব আমাদের উপর পড়তে থাকে। তাঁদের বাড়িতে দাদা প্রায়ই যেতেন এবং বলতে গেলে মামার বাড়ির পরিবেশ আমাদের জীবনে খুবই ফলপ্রদ হয়েছিল।

যাই হোক, ১৯২২ সালে দাদা গ্রাজুয়েট হন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে এম, এ. ক্লাসে ভর্তি হন। একই সঙ্গে ল' ক্লাসে যোগ দেন এবং

বাবার অফিসে আর্টিকল্ড ক্লার্ক নিযুক্ত হন। হাইকোর্ট অঞ্চলে ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীটে বাবার অফিস ছিল, সলিসিটর্স ফার্ম, এইচ, এন, দত্ত অ্যাণ্ড কোং। সুধীন্দ্রনাথের সাহিত্য অধ্যয়ন, ল' ক্লাস ও বাবার অফিসে শিক্ষানবিশী পর পর চলতে থাকল। যদিও বাবার ইচ্ছে ছিল, বড় ছেলে তাঁর কাজের দায়িত্ব নেবে, কিন্তু ক্রমশঃ সুধীন্দ্রনাথ সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়তে থাকলেন। ফলত ওর ল' পরীক্ষা অথবা আর্টিকল্ড ক্লার্ক হিসাবে পাঁচ বছর কাটলেও যথাযোগ্য পরীক্ষা দেওয়া হল না।

এই সময়েই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ওঁর যোগাযোগ হয় এবং প্রায়ই সুধীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর বাড়িতে যাতায়াত করতেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আধুনিক সাহিত্য (প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সাহিত্য) নিয়ে অনেক সময় তর্ক করতেন এবং রবীন্দ্রনাথ প্রশান্ত চিত্তে অনুসন্ধিৎসু তরুণ সুধীন্দ্রনাথের সমস্ত সাহিত্য আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতেন। বিশেষ করে বিদেশী সাহিত্য, য়ুরোপীয় বিভিন্ন শাখায় তাঁর বুৎপত্তি দেখে তিনি মনে মনে সুধীন্দ্রনাথকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতেন এবং বয়সের বিরাট ব্যবধান সত্ত্বেও বন্ধুর মতো ব্যবহার করতেন। এই সময়ে সুধীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের এত ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন যে, তিনি বিদেশ যাত্রার সময় দাদাকে সঙ্গে নিতে চাইলেন। বাবা সানন্দে অনুমতি দিলেন। রবীন্দ্রনাথের নিয়ত সাহচর্যে ও বিদেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে সুধীন্দ্রনাথের মনের পরিধি প্রসারিত হল এবং বিশ্ব ইতিহাস, সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধে প্রগাঢ় অনুরাগ সঞ্চারিত হল।

দেশে ফিরে এসে সুধীন্দ্রনাথ বাবার ফার্মে কাজ না করে আমাদের মামা সুবোধচন্দ্র বসু মল্লিক প্রতিষ্ঠিত লাইট অব এশিয়া ইনসিওরেন্স-এ যোগ দেন। কিন্তু সে-কাজ তাঁর বেশীদিন ভাল লাগেনি, লাগার কথাও নয়। বিদেশে যাবার আগে সাংবাদিকতা করার অভিপ্রায়ে শরৎচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। সে-সময়েই আমাদের বাসার একতলায় বৈঠকখানা ঘরে সাহিত্যের আড্ডা বসত। দাদার বন্ধুরা নিয়মিত আসতেন। মূলত সাহিত্য বৈঠক হলেও সাহিত্য ছাড়াও ধর্ম, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা চলত। তৎকালীন য়ুরোপীয় সাহিত্যের আদর্শ নিয়ে, কবিতার বিষয় বস্তু নিয়ে প্রায়ই তর্ক বাঁধত। একটি সাহিত্য পত্র প্রকাশ করলে মন্দ হয় না, এমন একটা চিন্তা-ভাবনা তখন অনেকে করতে থাকলেন। কিন্তু রুচি ও আদর্শ অনুসারে পত্রিকা প্রকাশ করা সহজ ছিল না।

বাংলাদেশে তখন 'প্রবাসী' সবচেয়ে অভিজাত পত্রিকা। এবং সুধীন্দ্রনাথের রুচি যে ইতিমধ্যেই উচ্চ সুরে বাঁধা হয়ে গেছে তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। পত্রিকা প্রকাশ করলে এমনই করতে হবে যে, বাংলা সাহিত্যের সুধী ও বিদ্বৎজনের কাছে বরণীয় হবে।

সে-সময়েই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যুদ্ধ পরবর্তী আধুনিক ইংরেজী কবিতার ফর্ম ও বিষয় বৈচিত্র্য নিয়ে সুধীন্দ্রনাথের দীর্ঘ বিতর্ক হয়। বিষয় গৌরবের মূল্য কবিতার ক্ষেত্রে গৌণ, এমন অভিমত প্রকাশ করায় রবীন্দ্রনাথ সকৌতুকে সুধীন্দ্রনাথকে বললেন, তাহলে মোরগের ওপর কবিতা লেখ তো, দেখা যাক কী রকম উতরোয়! সুধীন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, কবিতা হবেই এবং সে-কবিতা আপনার বিচারে উত্তীর্ণ হবে আশা রাখি।

কয়েকদিন বাদে সুধীন্দ্রনাথ 'কুক্কুট' নামে একটা কবিতা লিখে রবীন্দ্রনাথের কাছে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে হাজির হলেন। বাইরে যতোটা সাহস থাক, মনে অবশ্যই দুর্বলতা ছিল—আর কেউ নয়, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পড়বেন এবং তিনি তখন তাঁর খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে। কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের কাছে পেশ করে তিনি উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা করলেন। রবীন্দ্রনাথ কবিতাটি পড়লেন, আবার পড়লেন। প্রশান্ত হাসিতে তাঁর মুখ ভরে উঠল। 'না, তুমি জিতেছ'—রবীন্দ্রনাথ কবিতাটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন এবং নিজেই প্রবাসী পত্রিকায় পাঠিয়ে দিলেন, প্রকাশের জন্য। প্রবাসীতে 'কুক্কুট' নামে কবিতাটি('ক্রন্দসী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত) প্রকাশিত হল। এই কবিতাটিই তাঁর সর্বপ্রথম প্রকাশিত কবিতা।

এ রকম সময় সুধীন্দ্রনাথ সাহিত্য নিয়ে ভীষণভাবে মেতে গেলেন। কবিতা লিখতে আরম্ভ করলেন, কাব্য সম্বন্ধে বৈঠকখানার ঘরে তো নিয়মিত বৈঠক বসতই। এর কিছুদিন পূর্বে য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটে আয়োজিত একটি সাহিত্যসভায় সুধীন্দ্রনাথ 'কাব্যের মুক্তি' নামক বিষয়ে একটি দীর্ঘ আলোচনা করেন। ঐ সভায় শ্রীঅতুল চন্দ্র গুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং সুধীন্দ্রনাথের বক্তব্যের পরেও নিজে দীর্ঘ আলোচনা করেন। সুধীন্দ্রনাথের সেই সময় মনে হয়েছিল, সাহিত্য চর্চাই সম্ভবতঃ তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথের প্রশংসায় ও আনুকূল্যে উৎসাহিত হলেন খুবই এবং সীমিত হলেও, নিয়মিত কাব্যচর্চা চলতে লাগল। কয়েকটি কবিতা 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশার্থে পাঠান! বলা বাহুল্য তৎকালে আধুনিকপন্থী সুধীন্দ্রনাথের কবিতা, সাময়িকপত্রে দু-একটা প্রকাশিত হলেও, 'টোন'-এর সঙ্গে মিল

ছিল না বলে সম্পাদক সুনজরে দেখলেন না; কবিতা প্রকাশিত হল না। অন্যদিকে 'শনিবারের চিঠি'তে সেকালে একটি মোরগের ছবি প্রচ্ছদপটে ছাপা হত। সুধীন্দ্রনাথ'কুক্কুট' শীর্ষক কবিতা লেখার ফলে ঐ পত্রিকার পরিচালকবৃন্দ মনে করলেন যে, সুধীন্দ্রনাথ ইচ্ছে করেই তাঁদের পত্রিকাকে ব্যঙ্গ করার জন্য কলম ধরেছেন।* এ-চিন্তা যে কত অমূলক তা উপরে বর্ণিত ঘটনা থেকে বোঝা যায়। যাই হোক, 'শনিবারের চিঠি'র পরিচালকদের সঙ্গে পিতৃদেবের ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও, এই বিষয় নিয়ে একটা অসাচ্ছন্দ্যের সৃষ্টি হল। এইসব নানা কারণে সুধীন্দ্রনাথ স্থির করলেন যে একটি পত্রিকা তিনি স্বয়ং প্রকাশ করবেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে তখন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সত্যেন বসু, গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, শাহেদ সোহরাওয়ার্দি, প্রভৃতি সকলেই খুব উৎসাহ দিলেন। মন স্থির করে তিনি আমাকে জানালেন যে, সব আয়োজন ঠিক হয়েছে, তুমি কিছু টাকা যোগাড় করে দাও। আমরাও তখন সাহিত্যের পরিমণ্ডলে বাস করছি। সবিশেষ উৎসাহিত বোধ করলুম। তাছাড়া দাদা বলেছেন। অন্য চিন্তা না করে নিজের কাছে যা ছিল, তা থেকে আড়াই শো' টাকা দিলুম। পঞ্চাশ জন গ্রাহক করে অগ্রিম দুশো' টাকা দাদাকে দিলুম। বাবার কাছে চাইতে উনিও দু'শো টাকা দাদাকে দিলেন। এমনি করে সাড়ে ছ'শো টাকা যোগাড় হল। দাদার কাছেও কিছু টাকা ছিল। সব মিলিয়ে আশা হল যে, ভদ্রভাবে একটা পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব হবে। বৌবাজার মডার্ণ আর্ট প্রেসে ছাপা হবে। তৃতীয় ও চতুর্থ বছরে 'পরিচয়'-এর পরিচালক হিসাবে উত্তরা-সম্পাদক সুরেশ চক্রবর্তীও ছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে জানানো হল। প্রথম সংখ্যায় তিনি কিছু লিখলেন না, কিন্তু পত্রিকা দেখে দ্বিতীয় সংখ্যাতেই চিঠি পাঠালেন—নামে চিঠি হলেও বস্তুতঃ প্রবন্ধের আকৃতি। প্রথম সংখ্যার লেখকদের মধ্যে কয়েকজন: হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বীরবল, ধূর্জটিপ্রসাদ, হেমেন্দ্রলাল রায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু প্রভৃতি। পত্রিকার পৃষ্ঠাসংখ্যা হল ১৪৫। দাম প্রতি সংখ্যা ১ টাকা, বার্ষিক ৪।০। ত্রৈমাসিক পত্ররূপে বাংলা ১৩৩৮ সনের শ্রাবণ মাসে 'পরিচয়' প্রকাশিত হল। পত্রিকার নাম অনুমোদন করেন আমাদের মেশোমশায় চারুচন্দ্র দত্ত। বস্তুত 'পরিচয়'

---

* শনিবারের চিঠি 'কুক্কুট' কবিতার একটি 'প্যারোডি' প্রকাশ করেন: 'ভেবাতৃক ক্ষপার্থ উদ্গোঢ় অন্ধকার' ইত্যাদি।

পত্রিকার জন্যই, সুধীন্দ্রনাথের সবিশেষ অনুরোধে, চারুচন্দ্র দত্ত সর্বপ্রথম লিখতে আরম্ভ করেন এবং 'পুরানো কথা'র সূত্রপাত হয়। পিতৃদেবের ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে বহু রচনাও পর পর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যিক বৈঠক আরও নিয়মিত বসতে শুরু করে এবং প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় আমাদের বাইরের ঘরে অপূর্ব চন্দ, নীরেন রায়, শাহেদ সোহরাওয়ার্দি, সত্যেন বসু, প্রবোধ বাগচী, প্রশান্ত মহলানবীশ, যামিনী রায়, সুশোভন সরকার, ধূর্জটিপ্রসাদ, গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, হিরণ সান্যাল, বিষ্ণু দে, এবং আরও অনেকে আসতে লাগলেন। এদের অনেকে প্রায় রোজই আসতেন, তবে ঐ দিনটিতে বিশেষভাবে একটি সাহিত্যের বৈঠকী মেজাজ নিয়ে সকলে বসতেন। পাশের ঘরে পিতৃদেব তাঁর প্রয়োজনীয় কাজকর্ম ও পড়াশুনা করতেন। বৈঠকে কখনো আসেননি বটে, তবে প্রয়োজনে সর্বদাই পত্রিকার শুভাশুভ চিন্তা করেছেন। প্রথম দিকে পত্রিকার কোন প্রচ্ছদশিল্প ছিল না। তবে পরবর্তীকালে যামিনী রায় 'পরিচয়'-এর জন্য একাধিক প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছেন। 'পরিচয়' পত্রিকার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল পুস্তক পরিচয়। যাইহোক, পত্রিকা দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল— বাংলাদেশের সর্বশ্রেণীর লেখক 'পরিচয়' পত্রিকাতে না লিখলেও একটি বিশেষ শ্রেণীর পাঠক ও লেখকের কাছে যে এর অসামান্য আবেদন ছিল, তা ঐতিহাসিক সত্য এবং সে যুগের অন্যান্য বিশিষ্ট পত্রিকা সবুজ পত্র, প্রবাসী, বিচিত্রা প্রভৃতির পাশেই 'পরিচয়' তার সুনির্দিষ্ট আসন তৈরি করে নিতে পেরেছিল। এর প্রায় একক কৃতিত্ব সুধীন্দ্রনাথের। বাংলা সাহিত্যের চিন্তার জগতে, মনন ও মুক্ত উদার বুদ্ধিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে 'পরিচয়'-এর অবদান এখনও পর্যন্ত উদাহরণ স্বরূপ। কবি ও সমালোচক সুধীন্দ্রনাথের সাহিত্যকীর্তি যতটা ভাস্বর, সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথের মনীষাও ততটাই উজ্জ্বল ও দীপ্তিময়। 'পরিচয়' পত্রিকার জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকায় সুধীন্দ্রনাথ ষষ্ঠ বর্ষ থেকে তাকে মাসিক পত্রিকায় রূপান্তরিত করেন। সুধীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকার শেষ প্রকাশ ১৩৫০, আষাঢ়, ১২শ বর্ষ, ২য় খণ্ড ষষ্ঠ সংখ্যা।*

---

* 'কবিতা বিতা' পত্রিকার বৈশাখ বিশেষ সংখ্যায় (সালের উল্লেখ নেই) প্রকাশিত "ঘরের মানুষ কবি সুধীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধটি সংক্ষিপ্ত করেছেন নিরঞ্জন হালদার।

"স্বগত" সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ

১১ এপ্রিল ১৯৩৯

(শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত)

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

....

আজ তোমাকে লেখবার উপলক্ষ হোলো সুধীন্দ্র দত্তর 'স্বগত' বইখানি পড়ে। পড়তে কিছুকাল ইতস্তত করেছিলুম, ভয় ছিল আমার দেহের বর্তমান অবস্থায় ওটা উপযুক্ত লঘুপথ্য হবে না। কিন্তু জনশ্রুতি ক্রমশই অত্যুক্তির দিকে চলে। সুধীন্দ্রের লেখা দুরূহ এ বাণীর স্বর অনবধানে চড়ে যাচ্ছে। তাহলেও সংস্কারটার একেবারেই মূল নেই এও বলতে পারি নে। হয়তো তাঁর গদ্য চলতে চলতে আপন পথ পাকা করে নিয়েছে, গোড়ায় সে চলত বন্ধুর পথে। তা হোক কিন্তু তাঁর গদ্য কেন যে জলের মতো সহজ কখনোই হোতে পারে না তার কারণ আছে।

এই প্রসঙ্গে মনে করিয়ে দিচ্ছি, আগেকার চিঠিতে তোমাকে জানিয়েছিলুম বাংলায় "চিন্তা" শব্দটাকে ইংরেজি "থট্" শব্দের জায়গায় বসিয়ে দিতে পারব না। সুধীন্দ্র ওকে "মনন" বলেছেন যে অর্থে ওতে ভাবনার একটা প্রক্রিয়া বোঝায়। কিন্তু যে বিষয়টাকে নিয়ে মনন করা যায় এবং যা মননের পরিণতি তাকে বাংলায় "মত" বললেই ভালো হোত, সে সুযোগ আর নেই। তাই আমি মনে করি "মন্তব্য" শব্দটাতে কাজ চলতে পারবে।

সুধীন্দ্রের লেখা পাঠকদের কাছ থেকে ভাবনার দাবি করে, কেননা মননশীল তাঁর মন। সাহিত্যরচনায় কারো বা চিত্তবৃত্তিতে কল্পনার কর্তৃত্ব, কারো বা মননের। আরো একটা প্রবর্তনা আছে তাকে বলা যেতে পারে লোকহিতৈষা, তাতে শ্রেয়োবুদ্ধির ফসল চাষ হয়। আমার নিজের লেখা নিজে বিচার করতে সম্মতি যদি দাও তাহলে বলতে হয় আমার লেখায় প্রধানত কল্পনা আর শ্রেয়োবুদ্ধি এই দুটোরই চালনা। সুধীন্দ্রনাথের মুখ্য আনন্দ মননে, শিক্ষা দেওয়ার, উপদেশ দেওয়ার আভাস যদি কোথাও দেখতে পাওয়া যায় সেটা

নেহাৎ গৌণ, এমন কি মনে হয় তার প্রতি তাঁর অশ্রদ্ধা আছে। মননে যার প্রয়োজনাতীত আনন্দ, তার কাছে নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্তের পাকা দাম নেই। তাই সুধীন্দ্র অনায়াসে বলতে পেরেছেন এ বইয়ে তাঁর অনেক পুরোনো মতের সঙ্গে তাঁর এখনকার মত মেলে না অথচ তাই বলে তাঁর কাছে সেগুলো পরিত্যাজ্য বলে মনে হয় নি, কেননা তিনি মননবিলাসী। গীতার সঙ্গে এই ভাবটার সুর মেলে যে, গীতা বলেন ফলের দিকে দৃষ্টি রেখো না। যে সাধনার মূল্য সাধনাতেই প্রকাশ পায় বিশেষভাবে সিদ্ধিতে নয় তার এই দশা। কিন্তু তাঁর লেখার কোন্ এক জায়গায় মনে হয়েছিল তিনি "আর্ট ফর আর্ট্‌স্ সেক" মতটাকে বুঝি অমান্য করেছেন। যদিচ তাঁর ব্যবহারে তার প্রমাণ পাই নি। তিনি ভাবতে ভালোবাসেন সেই ভালোবাসাটাই তাঁর দান। আর্টিষ্ট মাত্রেরই চরম শক্তি প্রকাশ করবার ভালোবাসায়। গদ্যে সুধীন্দ্রনাথ মননের আর্টিষ্ট। তার একটা পরিচয় পাই ভাষায় শব্দের উপরে তাঁর একান্ত অনুরাগে। যারা যথার্থ সাহিত্যিক, শব্দে তাদের নেশা। এই নেশার মৌতাত দুই জাতের। রসসাহিত্যে ধ্বনি আর রূপকের ব্যঞ্জনা প্রধান উপকরণ, মনন-সাহিত্যে যাথার্থের সূক্ষ্মবোধ। অধিকাংশ পারিভাষিক শব্দে তার অর্থটা আভিধানিক চাপে কঠিন দানা বেঁধে গেছে, সে অর্থ ব্যবহারের দ্বারা স্বীকৃত, চেহারার দ্বারা পরিচিত নয়। সুধীন্দ্রনাথ তাঁর বইয়ে প্রয়োজন অনুসারে বিস্তর নতুন শব্দ চালিয়েছেন যাদের অর্থগুলি সজীব। তত্ত্বসাহিত্যে তাঁর জ্ঞান আছে তবু তিনি তত্ত্বজ্ঞানী নন, তিনি আর্টিষ্ট। তাঁর মননের আনন্দ বাছাই-করা শব্দের খেয়ায় চেপে বসেছে। শব্দগুলি অপরিচিত সুতরাং সাধারণ পাঠককে বুঝতে বাধা দেবে এ দুশ্চিন্তা তাঁকে ঠেকায় নি। তাঁর লক্ষ্য মুখ্যত রচনার প্রতি, গৌণত পাঠকদের দিকে। কেননা পাঠক সম্প্রদায়টা স্থাণু নয়, সে সচল—সে কোন এক বিশেষ যুগের শিকলে বাঁধা জীব নয়—না আধুনিকের, না সনাতনের। যে লোক বাঁধা-যুগের বেতনে লোভ রাখে তাঁর লেখা ঋতু পরিবর্তনের বিদায় হাওয়ায় ঝরা পাতার মতো খসে পড়ে। কিন্তু জল্পনা করে লাভ নেই। কোন্ রচনা যে চলতিযুগের রথে চলেছে চিরন্তনের গম্যস্থানে তার নিশ্চিত পরিচয় পাব কার কাছ থেকে? "সময়হারা" বলে একটা কবিতা লিখেছিলুম তার মূল কথাটা এই, বর্তমানে আমরা সময় হারাতে পারি কিন্তু ভবিষ্যতের সুস্বপ্নের পথ হারাই নে, হতভাগার শেষসম্বল ঐটে, চেম্বারলেনের শান্তির আশার[১] মতো।

ও কথা যাক। আমি বলতে যাচ্ছিলুম যোগ্য লেখকের প্রধান নির্ভরদণ্ড

তার সাহস। তার লক্ষ্য লেখার দিকে, পাঠকের দিকে নয়। সুধীন্দ্রের ঐ গুণটি দেখেছি, তিনি পাঠকদের কাছে পাওনা হিসাব করে দমে যান নি। তাঁর লেখা পড়ে অল্পলোক। রসসাহিত্যে লোকের ভিড় অসহ্য; কাউকে কোন টিকিট দেখাতে হয় না। এই বিনামূল্যে প্রবেশাধিকার বাংলাদেশের মনকে অলস করে দিয়েছে, এখানে অযোগ্যের অহংকারে কোনো বাধা নেই। মনন-সাহিত্যে অনুশীলনের অপেক্ষা আছে, সেটা কুঁড়ে মনের কর্ম নয়। সেইজন্যে আমাদের দেশে ঐ বিভাগে বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ।

সুধীন্দ্রনাথের এই বইখানিতে জমেছে তাঁর মনন-সাধনার ফসল। তাঁর এই সঞ্চয় সম্বন্ধে তিনি আমার মত জানতে চেয়েছিলেন। আমাকে ফাঁকি দিতে হবে। চিঠির কোণটুকুর মধ্যে প্রবেশ করে দায়িত্বের আয়তন খাটো করা সহজ। বিচারকের সঙ্গে লেখকের স্বাজাত্য থাকা চাই, সুধীন্দ্রের সঙ্গে আমার প্রভেদ আছে অনেকখানি। যে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর অবাধ সঞ্চরণ, কোনো এক কালে হয়তো আমি সেখানে হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলুম, কৌতূহল যথেষ্ট ছিল, কিন্তু এখন সেখানে আমার চলার পথে ঘাস উঠে গেছে। অনেকদিন থেকে আমাকে অন্য রাস্তায় টেনেছে, সে তুমি জানো। কর্তব্য-সাধনার কাছে আমাকে অনেক কিছুই ত্যাগ করতে হয়েছে তার মধ্যে বই পড়াটাই সর্বপ্রধান। সুধীন্দ্র দেশবিদেশের নানা সাহিত্যক্ষেত্রে ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছেন—মনের অভিজ্ঞতা কেবলি বাড়িয়ে চলায় তাঁর শখ—সে শখ নিছক আরামে মেটাবার নয় বলেই আমাদের দেশে মননভূমির ভবঘুরে এত অল্প। আমার জানাশোনার মধ্যে আর একজন লোক জানি যিনি হচ্ছেন প্রমথ চৌধুরী। তিনি মননবিলাসী, তিনিও গ্রন্থবিহারী। তিনি অনেক ভাবেন, অনেক পড়েন, অল্প বয়সেও তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারিনি। তাঁর লেখা যখন পড়ি মনকে বলি,—মন তুমি কৃষিকাজ বোঝ না—চাষ আবাদ করা হয়নি, সোনা যদি পেয়ে থাকি সে পড়ে-পাওয়া। এই প্রসঙ্গে প্রমথর রচনা সম্বন্ধে এ কথা বলা আবশ্যক যে তাঁর লেখায় কেবল বুদ্ধির উজ্জ্বলতা নয় প্রাণের সরস প্রবাহ প্রবল।

সুধীন্দ্র নানা বিষয়েই পড়াশুনো করেছেন কিন্তু কোন বিশেষ বিষয়ে তাঁর মন জমাট বেঁধে যায় নি। জ্ঞানের ও ভাবের রাজ্যে উনি যাযাবর। ওঁর সঙ্গে আমার তহবিলের তুলনা হয় না কিন্তু একটা জায়গায় মেলে সে ওঁর পথ-চলতি মন নিয়ে। যদি উনি শঙ্করাচার্য বা ব্যর্গসঁ-র মতের দুরূহ ভিত্তিতে পাথরের স্থায়ী দেয়াল গেঁথে বসতেন, এমন কি ফ্রয়ডের মনোবিকলন-শাস্ত্রের সব কটা

চরিত্রগ্রন্থির কুটিল তত্ত্ব পারিভাষিকসমেত মুখস্থ করে বৈজ্ঞানিক লাইসেন্স পাওয়া কুৎসাপ্রয়োগের যথেষ্ট দাবি করতে পারতেন, তাহলে মাথা হেঁট করে ওঁর পাশ কাটিয়ে চলতুম। যাঁদের বচনে ও ব্যবহারে আছে সবজানার স্বগোচর বা অগোচর ঔদ্ধত্য, তাঁদের পাণ্ডিত্যকে বরাবর ভয় করে এসেছি, অধিকাংশ সময় অন্ধ শ্রদ্ধা করেছি। কিন্তু আপন লোক বলে মেনেছি মাননিক পথের পথিকদের. দুর্গম যাত্রী হলেও। ভ্রমণের শখ ভ্রমণকারীর সংসর্গে অনেকখানি মেটে।

'স্বগত' বইখানির অনেকটা অংশের আলোচনা যথা নিয়মে করতে পারিনে। কেননা সুধীন্দ্র তাঁর লেখায় যে সব বিদেশী লেখকদের উল্লেখ করেছেন তাঁদের অধিকাংশের বই আমি পড়িনি[১]. সেটা আমার শরীরের ক্লান্তিতে, কাজের ব্যস্ততায়। প্রথম বয়সে যখন ইংরেজী সাহিত্যের রসসত্রে প্রবেশ পেলুম তখন মেতেছিলুম দিনরাত্রি। সেই ব্যগ্রতার চাঞ্চল্যে মনের সৃষ্টি চলেছিল এগিয়ে। বিষয়বস্তু যা পেয়েছিলুম তার চেয়ে বেশী করে নাড়া দিয়েছিল চিত্তের মন্থনবেগ। ক্রমে সেটা নিজের ভিতরকার অজানা সম্পদকে তীরে তুলে এনেছিল। বাইরের পাওয়ার আবেগেই নিজেকে পাওয়ার পালা শুরু হয়। বাইরে থেকে সঞ্চয়টা এর প্রধান জিনিষ নয়, তার চেয়ে ভিতর থেকে নিজের পরিচয়টি আরো বড়ো। সেই আত্মপরিচয়ের এলাকায় এসেছি। এখন সেই আপনাকে পাওয়ার ভূমিকাতেই সকল পাওনাকে আত্মসাৎ করবার সময়। যদি এখনকার কালে জন্মাতুম মনের কী চেহারা তৈরি হয়ে উঠত কেমন করে বলব। সভ্যতার নানা অধ্যায়েই বিচিত্রের মিশ্রণ সৃষ্টির কাজ করতে থাকে। যে সভ্যতায় মিশ্রণের বাধা ঘটে সেখানে আদিম মালমসলা একঘেয়ে পুনরাবৃত্তির দৈন্য প্রকাশ করে। তাই যে সব তরুণদলের চিত্ত এখানকার যুগের প্রবর্তনায় আলোড়িত আমি তাদের নব-জীবনের দৃশ্য দেখছি দূর সমুদ্রের প্রবাল দ্বীপের মতো। যদি সময় থাকত তাহলে নৌকো বেয়ে সেখানে কিছু দিনের মতো সায়ের করে আসা যেত। মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে তাই তোমাদের মতো সিন্ধবাদ নাবিকদের সঙ্গে আলাপ করতে চাই। সুধীন্দ্র সেই সিন্ধবাদ দলের একজন। এই "স্বগত" বইয়ে তিনি আলাপ জমিয়েছেন। কিন্তু সে আলাপ সম্পূর্ণ আমাদের মতো আনাড়িদের লক্ষ্য করে নয়। তিনি ধরে নিয়েছেন এখনকার কালের সকলেরই কামিংস[২] এজরা পৌণ্ড[৩] ঈডিথ সিটওয়েল[৪] এলিয়ট[৫] অডেন[৬] স্পেণ্ডর[৭] সম্প্রদায়ের সভাস্থলে অবাধে যাওয়া-আসা আছে। কাজেই

তাঁর এই অংশের সাহিত্যালোচনায় সমজদারদের মধ্যে মাথা নাড়ানাড়ি চলবে। আমার মতো সেকেলে লোক ভালোমানুষের মতো শুনবে আর মেনে নেবে। আমি সম্ভোগ করতে পারি, এই বৈঠকে প্রসঙ্গক্রমে যে সব কথা উঠে পড়ে এমন কি তা নিয়ে তর্কও করতে পারি। একটা দৃষ্টান্ত, যেমন বিষ্ণু দের 'চোরাবালি' সম্বন্ধে গ্রন্থকারের বক্তব্য। ঐ বইটি এবং ঐ নামের কবিতাটি পড়েছি। বোঝবার এবং ভালো লাগবার একান্ত ইচ্ছা করেছি। বুঝতে পারি নি। কিন্তু নিজের মনের অভ্যাসের উপর নির্ভর করে সুধীন্দ্রনাথের মতো অভিজ্ঞ সমজদারের প্রশস্তিবাদ উড়িয়ে দিতে সাহস হয় না। মনে ভাবি তিনি এখনকার কালের যাচাইখানা থেকে যে কষ্টিপাথর পেয়েছেন সে আমার জানার মধ্যে নেই। তাঁর নির্দেশ মতো বোঝবার চেষ্টা করলুম।

একটা সংশয় তাঁর আশ্বাস সত্ত্বেও রয়ে গেল। তিনি বলেছেন এই কবিতাটির অবলম্বন রিরংসা নয়। প্রথম পড়বার সময় সে-সংশয় স্বভাবতই আমার মনে ছিল না, তাই অর্থ বুঝতে অত্যন্ত গোল ঠেকেছিল। সুধীন্দ্র সংশয়কে নিরস্ত করতে গিয়েই তাকে জাগিয়ে দিলেন। কাব্য হিসাবে এর গুণপনা আছে, কিন্তু শ্রাব্য হিসাবে এটা আমার কাছে বহুদূরে বর্জনীয়। তাতে প্রমাণ হোতে পারে আমি এখনকার দিনের নই। তা নিয়ে লজ্জা করব না কিন্তু এখনকার দিনের সম্বন্ধে লজ্জা করবার কারণ আছে দেখতে পাচ্চি। অন্তত রিরংসার বাস্তবচিত্রের অভিযোগ বাঁচাবার জন্যে সুধীন্দ্র এর মধ্যে প্রকৃতি-পুরুষ ও ভক্ত-ভগবানের সম্বন্ধারোপ করেছেন। মেলাতে পারলুম না।······

গদ্যকাব্যে আমার ছন্দোমুক্তি প্রসঙ্গে তিনি যে ব্যাখ্যা করেছেন তার প্রয়োজন ছিল। অনেকের কাছে ভর্ৎসনা পেয়েছি। আমার কৈফিয়ৎ এই, গদ্যকাব্যে যে বিশেষ জাতীয় রসরচনার অবকাশ পাওয়া যায় তার থেকে সাহিত্যকে বঞ্চিত করা অন্যায়।

আমাদের দেশে যোগী সন্ন্যাসী যাঁরা, বিশেষ সাজ ও বিশেষ আচরণের দ্বারা সাধারণের থেকে তাঁরা অত্যন্ত স্বতন্ত্র, তাই ভেকধারণের সাহায্যে তাদের চেনা সহজ। কিন্তু যে যোগী সংসারের মধ্যেই আছেন তিনি যথার্থ মুক্ত, সাজের দ্বারা সন্ন্যাস আশ্রমের আচারের দ্বারা বদ্ধ নন। প্রথাগত দৃষ্টিতেই যারা দেখতে অভ্যস্ত তিনি তাদের চোখে পড়েন না। অথচ তাঁর মধ্যে সাধনার যে সত্য আছে সেটা প্রচলিত পরিচয় ও পদ্ধতির বাইরে বলেই তার মধ্যে একটা গভীর

নিজকীয়তা জেগে ওঠে, সেটা মূল্যবান,—সংসারের সঙ্গে সংসারাতীতের সামঞ্জস্য ঘটিয়েই সেই মূল্য প্রকাশ পায়। গদ্যকাব্য ভেকধারী নয়, তাই তার মধ্যে সাহিত্যের হরিজন ও জাতকুলীন সহজে মিলে গিয়ে কবিত্বের সম্মান পেতে পারে। কিন্তু এই ব্যাখ্যা দ্বারা আমার মতের সমর্থন এহ বাহ্য, কোনো বিশেষ পরিবেশ থেকে আন্তরিক স্বভাবের প্রেরণায় কাব্য দেখা দিল কি না-দিল সেটা সহৃদয়হৃদয়বেদ্য। সলোমনের গীতিকে রসিকেরা জাতে ঠেলেন না সে প্রচলিত ছন্দের সাজে সভাস্থলে আসে নি বলেই। মনে পড়ছে যেন কোনো চীনা জ্ঞানী বলেছেন যে, যে-রাজ্যে রাজত্বকে অতিশয় দেখা যায় না শ্রেষ্ঠতা সেই রাজ্যেরই। ছন্দ সম্বন্ধে অত বড়ো কথা বলতে মুখে বাধে, কেননা তার সঙ্গে আমার মনের মেলামেশা বাক্যকাল থেকেই, কিন্তু একথা জোর করে বলতে পারি যে, যে-ছন্দ বাইরে থেকে অতিপ্রত্যক্ষ নয়, আসন যার কাব্যের গূঢ় অন্তরে, শাসন তার নেই বলেই তার গৌরব। যে হারুন-অল্-রসীদ্ আমির-ওমরাওদের মধ্যে সিংহাসনে বসেন তাঁকে তো সেলাম দিয়েই থাকি, রাজদণ্ড ফেলে দিয়ে অগোচরে যিনি সাধারণ প্রজাদের ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ান মনে মনে তাঁকে যদি মান দিতে না পারি তবে সেটাতে আপনাকেই খর্ব করি বাদশাকে নয়।

চিঠি লিখে প্রবন্ধ লেখার দায়িত্বভার হালকা করলুম তার একটা করণের আভাস দিয়েছি পূর্বেই, অর্থাৎ এই বইখানি সম্বন্ধে সব কথা বলবার মতো আয়োজন আমার ভাণ্ডারে নেই, আর একটা কারণ এই যে, আমার বর্তমান অবস্থায় আপন লোকের পাশাপাশি পায়চারি করতে করতে আলাপ করা আমার পক্ষে সহজ, দশ জনের কাছে জবাবদিহির সতর্কতাটা সর্বদা মনে রাখতে হয় না। ইতি ১১।৪।৩৯

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

['প্রবাসী'র (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬) সৌজন্যে]

'সংবর্ত' প্রসঙ্গে সুধীন্দ্রনাথ

৬নং স্যুইট

৬ রাসেল স্ট্রীট

কলিকাতা ১৬

শ্রীযুক্ত অরুণকুমার সরকার

মহাশয়ের সমীপে—

প্রিয়বরেষু,

আপনার স্বাক্ষরিত 'সংবর্ত'-এর সমালোচনা * আমাকে অভিভূত করেছে। কারণ আপনার রচনারীতি যেমন প্রাঞ্জল ও অমায়িক, সাধুবাদে আপনি তেমনি অকৃপণ; এবং গুণগান শুনতে যাদের ভালো লাগে না, আমি সেই অমানুষিকদের একজন নই। কিন্তু শুধু সেই জন্যেই আপনার লেখা পড়ে, আমি মুগ্ধ হইনি। আসলে এখন যে বয়সে পৌঁছেছি, তাতে বিনা বিচারে সুখ্যাতিও অগ্রাহ্য এবং রবীন্দ্রনাথের পরে যাঁদের কাছে নিষ্কুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছি, তাঁদের উক্তি আত্মপ্রসাদের পথ্য যোগালেও, আত্মজিজ্ঞাসার উত্তর আজ পর্যন্ত দিতে পারেনি। আপনার কাব্য-বিবেচনা ভিন্নধর্মী এবং আমার প্রতি আপনার অনুকম্পা যদিচ অপরিসীম, তবু তার সাহায্যে আমার অহঙ্কার বাড়ল না, বুঝলুম যে আপনার মনীষা নিরলস ও স্বভাব সাত্ত্বিক ব'লেই, আমার অসমাপ্ত চেষ্টার সমগ্র রূপ আপনার দিব্যদৃষ্টিতে সুপ্রকট।

তাঁর প্রাথমিক সংশয় কেটে গেলে, রবীন্দ্রনাথ অবশ্য আমাকে অনুচিত উৎসাহ দিয়েছিলেন। তবু তাঁর কাছে যে অপার স্নেহ পেয়েছিলুম, তার উৎস ছিল ব্যক্তিগত এবং তখনও আমার কেবলই মনে হতো যে পরবর্তীদের মধ্যে তাঁর ঋণ আমি মুক্ত কণ্ঠে মেনেছিলুম ব'লেই, তিনি আমার প্রশ্রয়ী। অন্তত পক্ষে এ বিশ্বাস পোষণীয় যে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এর কবিকে বঙ্কিম প্রকাশ্য অভিনন্দন জানাতে পেরেছিলেন যে সহৃদয় দূরদৃষ্টির কল্যাণে, রবীন্দ্রনাথ নিজে কোনও কনিষ্ঠকে কখনও সে-রকম চোখে দেখেননি এবং পরিগ্রহণের ক্ষমতায় আপনি হয়তো বঙ্কিমেরও অগ্রগণ্য যেহেতু আমি আপনার বয়োজ্যেষ্ঠ। অর্থাৎ বঙ্কিম পথিকৃৎ, পশ্চাদ্‌গামীর সাফল্যের তার সন্ধান সার্থক; এবং আমার যাত্রা যখন গন্তব্যের ত্রিসীমানায় না পৌঁছেও, সমাপ্তপ্রায়, তখন আমার বিষয়ে

*এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত "সংবর্ত মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত" আলোচনাটি।

আশাবাদের অবকাশ নেই: তৎসত্ত্বেও আপনি আমার অতিজীবিত আদর্শে বোধহয় এই জন্যে আস্থাবান যে আপনার মতে যে নৈরাশ্যবাদী দ্বৈপায়নেরা ভাবী সমাজের বীজস্বরূপ আপনি তাদের অন্যতম।

আসলে বর্তমান প্রশস্তি আমার প্রাপ্য নয়, আপনারই মহানুভবতার সাক্ষ্য; এবং আজকের সঙ্কীর্ণ জগতেও অনুরূপ ঔদার্যের সাক্ষাৎ কালে-ভদ্রে না মিললে, আমি ক্ষণবাদী হয়েও বিশ্বমানবের নাম নিরন্তর নিতুম না। কিন্তু বিশ্বমানব ব্যক্তিমানবেরই মানসপুত্র; এবং গ্যেটের মতো মালার্মেও যেহেতু বুঝেছিলেন যে কেবল কাব্যেই সেই সঙ্কল্পপ্রসূত নিষ্কর্ষের অভিব্যক্তি সম্ভব, তাই তিনি কবিতাকে দিতে চেয়েছিলেন স্বয়ংসম্পূর্ণ সঙ্গীতের, তথা স্বাবলম্বী প্রতীকের মর্যাদা। অর্থাৎ কাব্যরচনা শব্দসাপেক্ষ, এ-কথার মানে এমন নয় যে সে-জন্যে ব্যাকরণের বিধি-নিষেধ, অথবা ভাবনার পরিণতি বর্জনীয়, তার তাৎপর্য শুধু এই যে কবিতায় উক্তি ও উপলব্ধি অভিন্ন, তাতে অপরিপক্ক ধারণার স্থান নেই, এবং ভাষার সঙ্গে একেবারে মিশে না যাওয়া পর্যন্ত ভাব ভাবুকের আয়ত্তে আসে না। হয়তো কাব্যও বিষয়-বিষয়ীর ঐক্যসম্ভূত ব'লেই, তার আখ্যা ব্রহ্মাস্বাদের সহোদর; এবং তার আবেদন সার্বজনীন, কেননা কাব্যগত অনুভূতি স্বগত, সংস্কারমুক্ত ও দেশ কালের অতীত।

পক্ষান্তরে সঙ্গীতাদি বিশুদ্ধ শিল্পের রূপই সর্বগ্রাহ্য, রস পাত্রভেদে পৃথক; এবং দার্শনিক বিচারে পাত্র বা ব্যক্তি যেহেতু অনির্বচনীয় বৈশিষ্ট্যের নামান্তর, তাই মালার্মে ভেবেছিলেন যে রহস্যই কাব্যের প্রাণ। এ সিদ্ধান্ত অবশ্য অতিরঞ্জিত; এবং উক্ত আধিক্যের দোষেই মালার্মের একাধিক রচনা নিকামত দুরূহ। তাহলেও তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যের সার্থকতা প্রায় অতুলনীয় বোধহয় এই কারণে যে তাতে চিন্তা অভিপ্রায়ের সেবক; এবং যে-বিশ্বাসে, বা অবিশ্বাসে, তাঁর লেখা বদ্ধমূল তা কায়মনোবাক্যের অবৈকল্যে সঞ্জীবিত ব'লেই, তাঁর বক্তব্য একবার ধরতে পারলে, তাতে যেন প্রমিতির আভাস মেলে। কিন্তু এ-প্রসঙ্গ সাক্ষাতে আলোচ্য; এবং ইতিমধ্যে আপনাকে আমার বিনীত কৃতজ্ঞতা জানানোই এ-চিঠির উদ্দেশ্য। সুতরাং আজ এখানেই থামছি, যদিও আশায় রইলুম যে শীঘ্র আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে, এবং মালার্মের বিষয়ে আপনার আমার মতভেদ হয়তো আর থাকবে না। ইতি ২৬ অক্টোবর ১৯৫৩।

ভবদীয়
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

'দশমী' নিয়ে কয়েকটি চিঠি

৬ নং স্যুইট
৬ রাসেল স্ট্রীট
কলিকাতা-১৬

প্রিয়বরেষু,

গত পনেরো দিন যাবৎ আমার অধিকাংশ সময় নানা অকাজে চ'লে যাচ্ছে ব'লে উত্তর দিতে কিছু দেরী হল বটে, কিন্তু আপনার ৮ তারিখের চিঠি পেয়ে আমি যৎপরোনাস্তি কৃতজ্ঞবোধ করছি। কারণ নরেশ গুহ মহাশয়ের কাছে শুনলুম যে 'কবিতা'র পক্ষে "দশমী"-র সমালোচনা লেখবার জন্ত আপনি অনুরুদ্ধ; এবং ওই পুস্তিকার বিষয়ে আপনার যা বক্তব্য, তাতে পাছে অবিচারের স্পর্শ লাগে, সেই ভয়ে আমার দিকে যত বলার থাকতে পারে সে সমস্তের সন্ধান না নিয়ে আপনি কলম ধরতে অসম্মত। এ মনোভাবে যে সৌজন্তের কেন, দাক্ষিণ্যের পরিচয় রয়েছে, তা কোনও গ্রন্থকারের প্রাপ্য নয়; এবং প্রকাশিত রচনায় যা নেই, তার সাক্ষ্যে রচয়িতার আত্মরক্ষা অন্তায় ও অসার্থক।

যাক সে-কথা। অপনার প্রথম প্রশ্নের জবাব এই যে পয়ারের প্রথম আট মাত্রার বণ্টন ২+৩+৩ হয় কি না, সে-সম্বন্ধে আপনি শুধু সন্দিহান, কিন্তু আমি একেবারে নিশ্চিত যে তা হয় না, যেমন হয় না ৩+২+৩। তবে প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের "পদচারণ"-এ বোধ হয় আছে "হয়ে কথায় চতুর" "হই ভাবেতে কতুর"; এবং পয়ারে এই অতিপর্ব দ্বিমাত্রাযুক্ত লঘু ত্রিপদীর পদদ্বয়ের প্রয়োগে আমি আপত্তি জানালে, তিনি বলেছিলেন যে ব্যাপারটি আর কারও নজরে পড়েনি। ৩+২+৩ বিভাগের বহু দৃষ্টান্ত বুদ্ধদেব বসু ও বিষ্ণু দে মহাশয়ের সাম্প্রতিক কবিতায় তো রয়েছেই, এমনকি সম্ভবত "পরিশেষ"-এর এক জায়গায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন "মাধবী+লতা+বিতানে"; এবং সে-দিকে তাঁর দৃষ্টি-আকর্ষণ ক'রে আমি তাঁকে কয়েক দিনের জন্তে বেশ খানিকটা চটিয়েছিলুম।

তৎসত্ত্বেও জ্ঞাতসারে আমি কখনও ও জাতীয় মাত্রা বণ্টনের প্রশ্রয় আমার পদ্যে দিইনি; এবং আমার কাছে "যার সারথ্যে ও সখ্যে" ২+৩+৩

এর নমুনা নয়; ২+৪+২ বা ২+২+২+২-এর নমুনা, যার সঙ্গে পয়ারের কোন বিবাদ কোনও কালে ছিল না, আজও নেই। আসলে বাংলা উচ্চারণের সাধারণ বিধি মানলে, ওই পর্বের ২+৩+৩ ভাগ অসাধ্য; এবং কেবল "পর্যন্ত" অর্থে নয়, "ও"-র মানে যেখানে "এবং" সেখানেও আমরা "ও"-কে পূর্ববর্তী শব্দের সঙ্গে জুড়ে পড়ি—যেমন "আমরা ও তাহারা"="আমরাও তাহারা", "আমার ও তাহার"="আমারো তাহার"। সেইজন্যে বিষ্ণু দে মহাশয়ের "যম ও (যমো) নেয় না তাকে" আমার মতে ছন্দ শৈথিল্যের পরিচায়ক, যা "যমেও নেওনা তাকে" রূপ পেলে, নির্দোষ হত; এবং আমি আরও মনে করি যে "যার / সারথ্যে ও / সখ্যে" আপনি যদি "যার / সারথ্যে / ও সখ্যে"-এই ২+৩+৩ পাঠ আনেন, তাহলেই বাংলা উচ্চারণের জাত যাবে।

"প্রত্যুত্তরে" প্রবহমান স্বরবৃত্তে রচিত, যেমন "তীর্থ পরিক্রমা" ও "উপস্থাপন" লিখিত প্রবহমান অক্ষরবৃত্তে; এবং উভয়এ পঙ্‌ক্তির পরিমাণ আঠারো। সুতরাং "সংবর্ত"-এর "পথ" ও "যযাতি", "অর্কেস্ট্রা"-নামক কবিতার আক্ষরিক ছন্দ, তথা "দশমী"-র উল্লিখিত কবিতা দুটোর বিষয়ে আপনার যদি আপত্তি না থাকে, তবে "প্রত্যুত্তর" আপনার সমর্থনে বঞ্চিত কেন, বিশেষত যখন শেষোক্ত প্রবাহমান স্বরবৃত্তে ছেদের নির্দেশ রয়েছে মধ্য মিলে (যেমন আছে আক্ষরিক "উপস্থাপন"-এ)? অবশ্য বুদ্ধদেব বসু মহাশয় মনে করেন যে আঠারো মাত্রার পঙ্‌ক্তি এ-ভাবে ভাঙা অনুচিত—অন্ততঃপক্ষে পয়ার-জাতীয় ছন্দে। কিন্তু আমি তাঁর সঙ্গে একমত নই; এবং তাঁর আদর্শ মানলে, পদ আর পঙ্‌ক্তির মধ্যে যেমন প্রভেদ থাকে না, তেমনই আমার মতে, কেবল "মেঘনাদ বধে"-র কেন, "কচ ও দেবযানী"-রও পদচিহ্ন বর্তমান।

"দশমী"-র মলাটে বই খানার সম্বন্ধে যা মুদ্রিত হয়েছে, তার জন্য আমি সত্যই নিরপরাধ; এবং ছাপা পুস্তিকা হাতে আসার আগে, তার অন্তর্ভুক্ত কবিতাকটার বিষয়ে নরেশ গুহ মহাশয়ের কী বক্তব্য তা আমি শুনিও নি! তবে হয়তো আত্মরতির অভিশাপেই মন্তব্য প'ড়ে আমার ভাল লেগেছিল; এবং তারপরে আরও দু-চারজন বন্ধুর কাছ থেকে জেনেছি যে তাঁরাও ওই রচনাগুলোর ভিতরে একটা সুর ধরতে পেরেছেন, যা নাকি আমার লেখায় অভূতপূর্ব। অবশ্য কয়েকটা কবিতায় আমার চেষ্টা ছিল পূর্ব পদ্ধতির পরিহার: উক্তির বদলে উৎপ্রেক্ষার উপস্থাপন অনেক ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত; এবং সিদ্ধান্ত কী তাও কোথাও কোথাও অনুচ্চারিত রাখার প্রয়াস পেয়েছি! কিন্তু আমার

ভাবনা আজও নিশ্চয় নির্বিকার আছে ; এবং বুদ্ধদেব বসু মহাশয় মনে করেন যে এ-বইয়ে আমার শূন্যবাদ তথা নিরাশা, আরও তীব্র হয়ে তো উঠেছেই, উপরন্তু আমি এখানে নিরানন্দময় আমার পরিচিত পৃথিবীর কাছেও বিদায় নিচ্ছি।

আমি অনেক কাল যাবৎ রটিয়ে আসছি যে কবিতা বিশেষের অর্থ তার মধ্যেই নিহিত। অতএব "উপস্থাপন"-এর অর্থ যদি আপনার কাছে অস্পষ্ট ঠেকে থাকে, তবে আমি মানতে বাধ্য যে তাতে যে-অনুভূতির প্রকাশ, তা বিকল ; আমার টীকায় তার অসম্পূর্ণতা ঘুচবে না। তা হলেও আপনার জিজ্ঞাসার গদ্য উত্তর এই যে আমি ক্ষণকাল বলতে যা বুঝি, তার সঙ্গে বের্গসঁ-র "সৃজনী পরিণতি" তুলনীয় নয়, তার উপমান হয়তো মাধ্যমিকদের দীপ-পরম্পরা। আমার কৈশোরে একদল পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক "স্পীশস্ প্রেসেণ্ট" নাম দিয়ে এক চির মুহূর্তের কল্পনা করতেন ; এবং আমাদের চেতনা সেই রকম সর্বময় নিমেষে অহরহ আবদ্ধ। তাতে যা কিছু প্রত্যক্ষ, তা তো আছেই, যা দূর, যা অনাগত, যা অতীত, তাও অন্তত ভাবচ্ছবিরূপে উপস্থিত ; এবং সেই "অবিকল" লহমা আর সোহংবাদীর সলিপ্‌সিজম্ বোধহয় এক। তবে তার মধ্যে আমরা খুশী হয়ে থাকতে পারি না : চাঁদ, যার সঙ্গে কল্পনা বা বিকল্পনার সম্পর্ক সর্ববাদিসম্মত, সে আমাদের প্রলুব্ধ করে ; সূর্য, যার মরীচিকা থেকে উপনিষদের ঋষিরা বাঁচতে চেয়েছিলেন, সে আমাদের বাইরে ডাকে ; অসম্পূত অমায় নীহারিকা রটায় নূতন সৃষ্টির বারতা, এবং বিজ্ঞানী বলেন যে আমাদের অস্ত্রে ও নাড়ীতে ধরা পড়ে ভূত থেকে ভবিষ্যতে উধাও কালের পদক্ষেপ। কিন্তু নিজের নাড়ী বা অস্ত্রের দোলকে কালমাত্রার পরিমাপ আমাদের চৈতন্যগত নয়, এবং অন্ধ বিশ্বাসের বশেই আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে, তথা ভূত প্রকৃতির মধ্যে গতির ও কালাতিপাতের সন্ধান পাই। উপরন্তু সে-সন্ধানের শেষেও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর সাক্ষ্য নেই, আছে বিমূর্ত প্রত্যয়, কিংবা ভাবচ্ছবি। তাহলে চিরমুহূর্তে আটকে থাকতে সোহংবাদীর আপত্তি কি? এবং সে ভোলেই বা কেন যে সে ক্ষণস্থায়ী, তথা নাস্তিরই অংশভাক্।

নিজের কবিতার সন্তোষজনক অর্থ আমি কোনও দিনই করতে পারিনি, আজও পারলুম না ; এবং উপরে যা লিখলুম, তা আপনার ব্যাখ্যারই বিস্তার। কিন্তু দেশ, কাল ও পাত্র সম্বন্ধে আমার অন্যোন্যবিরোধী মতামতের ঐক্যসাধনের

প্রয়াস পেয়েছি "দশমী"-তে ; এবং আপনার সঙ্গে দেখা হলে, এ-বিষয়ে ব্যাপক আলোচনার সুযোগ ঘটবে। ইতিমধ্যে শুধু জানিয়ে রাখছি যে আমার বিশ্বাস জীবন মরণে পূর্ণ এবং মৃত্যুর সামনে না আসা পর্যন্ত ব্যক্তি আপনার স্বরূপ চেনে না। অবশ্য এ-জাতীয় মনোভাব অতিযুক্তিক , এবং আপনার সমালোচনায় আপনি যদি এই অপসিদ্ধান্ত হেসে উড়িয়ে না দেন, তাহলেই আমার আশ্চর্য লাগবে। তবে উপলব্ধিটা বাস্তব—অর্থাৎ কবিতা লেখার জন্য গৃহীত নয় বরঞ্চ এতবার এত রকমে ওটার কবলে পড়েছি যে ওকে আমার লেখা থেকে ছেঁটে ফেলা অসম্ভব ; এবং তর্কের দ্বারা বিপ্রলাপের প্রতিপাদন অসাধ্য ব'লেই "দশমী"-তে চিত্রকল্পের প্রাধান্য অপেক্ষাকৃত অধিক।

ইতি—১১ জুন ১৯৫৬।

ভবদীয় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

পু:— "নিবিদ" তথাকথিত প্রাগবৈদিক ভাষা-যাতে অনার্য দেবতাদের বিষয়ে মন্ত্রাদি লিখিত হত। আমার ব্যবহারে ওটার অর্থ অসভ্যের ভাষা।

শ্রীযুক্ত অরুণকুমার সরকার সমীপেষু—

॥ ২ ॥

'দশমী'-র অন্তর্ভূ'ত কোন কোন কবিতার ছন্দ সম্পর্কে অরুণ কুমার সরকার প্রশ্ন তুলেছিলেন, সুধীন্দ্রনাথ তাঁর সন্দেহ নিরসনের চেষ্টা করেছেন। এই প্রসঙ্গে আমার কিছু বলবার আছে, উপস্থাপিত করি : সুধীন্দ্রনাথের পড়বার ভঙ্গি আর অরুণকুমার সরকারের (এমন কী আমার এবং আরো অনেকের) পড়বার ভঙ্গি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, অন্তত এ-ক্ষেত্রে ভিন্ন। 'যার সারথ্যে ও সখ্যে আমার উচ্চারণে ২+৩+৩ কিংবা ২+৩ : ১ : ২ কারণ দ্রুত কথোপকথন ছাড়া, আমার উচ্চারণে সংযোজক 'ও' স্বভাবতই বিশ্লিষ্ট হয়ে পরবর্তী শব্দের দিকে ঝুঁকে পড়ে, বলা বাহুল্য ২+৩ : ১ : ২ বিন্যাসেও পয়ারের সাবলীলতা অটুট থাকে না। "আমরা ও তাহারা" আমার উচ্চারণে "আমরাও তাহারা" নয়, 'ও'-কে আমি 'আমরা'-র সঙ্গে যুক্ত করে উচ্চারণ করিনা ; জানিনা, আমার পড়বার ভঙ্গিই হয়তো অস্বাভাবিক। বিষ্ণু দে'র 'যমও নেয় না তাকে' আমার একবারও 'ছন্দঃ শৈথিল্যের' পরিচায়ক বলে মনে হয় নি, বরং 'যমেও নেয় না

তাকে'; আমার কাছে কৃত্রিম, অনেকটা যেন আঙুলের কর গুণে লেখার মতো। 'যমও' শব্দটি আবেগের তীব্রতায় স্বভাবতই 'যম-ও' উচ্চারিত হয়ে থাকে, যিনি ছন্দ নিয়ে মাথা ঘামান না, আমার বিশ্বাস, তিনিও কখনো এই পঙক্তির 'যমও' শব্দটিকে 'যমো' উচ্চারণ করবেন না। বিষ্ণু দে-কে ধন্যবাদ যে তিনি 'যমেও নেয় না তাকে' লেখেননি।

'প্রত্যুত্তর' কবিতাটি সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত ধারণা এই যে ছড়ার ছন্দের (স্বরবৃত্তের) আটঘাট জানা না থাকলে ছন্দ বজায় রেখে উক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করা অসাধ্য। ছন্দ নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন তাঁদেরও প্রথমে কয়েকবার ধাক্কা খেয়ে কবিতাটির সঠিক পাঠভঙ্গি খুঁজে নিতে হয়, এমন কী 'মধ্যমিলে' 'ছেদের নির্দেশ' থাকা সত্ত্বেও। মোট কথা, 'প্রত্যুত্তর'-এর ছন্দ প্রবাহমান স্বরবৃত্ত হলেও, অন্তত আমার কাছে স্বচ্ছন্দ নয়; তবে মানতেই হয় যে সুধীন্দ্রনাথ স্বরবৃত্ত ছন্দ নিয়ে এই কবিতায় একটি উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা করেছেন।

সুধীন্দ্রনাথের চিঠির শেষ অংশ কৌতূহলজনক: দেখতে পাচ্ছি যে 'যুক্তিবাদী' সুধীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় 'অতি-যুক্তিক' মনোভাবের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছেন।

—দীপংকর দাশগুপ্ত

॥ ৩ ॥

পুনশ্চ :—লাইন দুটি এইরকম ছিল :

সে-চির মুহূর্ত এই, বিশ্বরূপ যার ব্যক্ত মুখে,
যার সারথ্যে ও সখ্যে ক্লৈব্য থেকে মুক্ত ক্ষণবাদী—...

(ভূমা দশমী)

স্পষ্টতই পড়তে অসুবিধা হয়। এমন কী 'ও'-কে 'সারথ্যে'র সঙ্গে যুক্ত করে ২+৪+২-র বিন্যাস আনা যদি সম্ভব হয়, তাহলেও হয়। অথচ, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, যদি 'সারথ্যে ও সখ্যে যার' লেখা হত (তাতে অবিশ্যি কবিতাটির পৌরুষ বিশেষ ব্যাহত হত, সন্দেহ নেই) কোনো অসুবিধে ছিল না। আসলে দৈমাত্রিক লয় পয়ার বা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের মূল ভিত্তি হলেও, এই ছন্দ তার স্বভাব অনুযায়ী প্রতি চার মাত্রার শুরুতে একটা করে

ঝোঁক গ্রহণ করে। মৈমাত্রিক লয় বজায় থাকা সত্ত্বেও এই ঝোঁক যদি স্বাভাবিক উচ্চারণের পরিপন্থী হয়, তাহলে পয়ার বা অক্ষরবৃত্ত ছন্দ ভেঙে পড়ে। তাই পয়ার বা অক্ষরবৃত্ত ছন্দে ২+৩+৩ কিংবা ৩+২+৩ যেমন অচল তেমনি ২+৪+২-ও, যদি স্বাভাবিক উচ্চারণে চার মাত্রার শুরুতে ঝোঁক না-দেওয়া যায়। 'তোমার কী ঋণ ছিলো তার কাছে, আজ প্রশ্ন করি' পড়তে অসুবিধে নেই, 'ঋণ তোমার কী ছিলো' পাঠ সম্ভব নয়, যেহেতু চার-মাত্রার শুরুতে ঝোঁক-দেওয়া এখানে স্বাভাবিক উচ্চারণের পরিপন্থী। অবশ্য 'যার' অথবা 'ঋণ'-কে পর্বের বাহিরে রেখে অর্থাৎ চার মাত্রার মূল্য দিয়ে এক ধরনের পাঠ সম্ভব (যার ০০ / সারথ্যেও / সখ্যে = ৪+৪+২) কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ যে-ধরনের আঁটো-সাটো ছন্দে কবিতা লিখেছেন সেখানে এ প্রসঙ্গ ওঠে না। এই প্রসঙ্গে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত এবং দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাস' গ্রন্থে দীপঙ্কর দাশগুপ্ত লিখিত 'পয়ার ও ছন্দোমুক্তি' নামক প্রবন্ধটির শেষাংশ কৌতূহলী পাঠক দেখতে পারেন।*

—আলোক সরকার

* এই তিনটি চিঠিই প্রকাশিত হয়েছিল তরুণ মিত্র ও আলোক সরকার সম্পাদিত 'শতভিষা' (চৈত্র, ১৩৭৩) পত্রিকায়।

রবীন্দ্রনাথের চিঠি

RABINDRANATH TAGORE.

সুধীন্দ্রনাথকে

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

অনেকক্ষণ গেল চিঠির সন্ধানে। যা আমার আছে তাকে হারিয়ে খুঁজে বেড়ানো এ আমার প্রত্যহই ঘটে। বোধ হয় এটা আমার পরে দৈবের অনুগ্রহ—পাওয়ার আনন্দ যখন ফুরিয়ে আসে তখন সেটাকে হারিয়ে ফিরে পাবার গভীরতর আনন্দে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সুরু হয়। এর মধ্যে আমার ভাগ্যবিধাতার মিতব্যয়িতারও পরিচয় পাই—আনন্দের দ্বিতীয় ভূমিকায় তার দ্বিতীয় উপকরণের প্রয়োজন হয় না—একই মনের কল ঘুরিয়ে তাকে একই জিনিষ দুবার করে দান করেন—দুবার কেন, না চেয়ে পাওয়ার চেয়ে হারিয়ে পাওয়ার মাত্রা বেশি—শকুন্তলাকে দিয়ে কালিদাস সেইটেই দেখিয়েছেন—দুষ্যন্তকে প্রথম পাওয়াটা সুখের পাওয়া, দ্বিতীয়টা দুঃখের দান। একই মানুষকে পাওয়া, কিন্তু সে পাওয়া কেবল যে সংখ্যায় বাড়ল তা নয় মাত্রায় বাড়ল। এমনিতরো জাদুতেই একটা বিশ্ব অসংখ্য বিশ্ব হয়েছে। খুব মনে পড়ে ছেলেবেলাকার জগৎটা, বাইরে থেকে সে তো এই জগৎই কিন্তু ভিতরের থেকে সে একেবারেই আর একটা লোক—এমন কতবারই এককে নিয়ে বহু করচি তার ঠিক নেই। আমার জীবনে এই একের বহুীকার ঘনঘনই হয়। তাই যদি হোলো আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত যত মানুষ হয়েছে তাদের জগৎ কি গুণে শেষ করা যায়? বস্তু রয়েচে এক; বিজ্ঞান তাই নিয়ে মেপে জুখে ছিড়ে ছুড়ে তার হাড় হদ্দর সন্ধান বের করলে। কিন্তু গুণ? রস? যাকে বলে value? তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈচিত্র্যের যে অন্ত নেই। আমি তো খুব জোর করেই বলতে পারি সব জড়িয়ে আমার মধ্যে আমি যা পেয়েচি তা আর কেউ কখনও পাবে না—এটাকে সম্পূর্ণভাবে আর কারো উপলব্ধিগোচর করাতেও পারব না—এটা অপূর্ব। এই দিক থেকে এই একই জগতের অন্তহীনতার মতো অদ্ভূত আর কী আছে? একেই বলে লীলা। এইখানেই সায়ান্সের কোঠা ছাড়িয়ে আর্টের কোঠায় এসে পড়ি, অর্থাৎ অপূর্বর কোঠায়। নির্বিশেষ থেকে

বিশেষে। আমি যেখানে নির্বিশেষ সেখানে আমি বৈজ্ঞানিক, আমি যেখানে বিশেষ সেখানেই আমি আর্টিস্ট। তুমি যাকে ইনটেলেক্‌ট্ বলচ রীজন হল যার অস্ত্র এমন ক্ষেত্র তার যেখানে পক্ষপাতের জায়গা নেই—যার শেষ কথা হচ্চে কুকুরে মানুষে অভেদ, অভেদ মানে তাদের মূল্য ভেদ নেই।

মূল্য আছে তিন জাতের। একটা হল বাস্তব প্রয়োজনের অর্থাৎ হাটের, একটা ধার্মিক প্রয়োজনের অর্থাৎ সমাজের, একটা রসের প্রয়োজনের অর্থাৎ ব্যক্তির। শেষেরটা থেকে ইনটেলেক্ট যে নির্বাসিত তা নয়, সে গৌণ। এখানে প্রধান কারিগর হচ্চেন আমাদের মূর্তিগড়া ব্যক্তিটি—রূপ যে দেখতে বলে শুধু তা নয় অর্থাৎ যার আয়তন আছে, ওজন আছে, outline আছে তা নয়। রূপ বলতে এমন form যাতে বিশেষ রসের যোগে আমার অহৈতুক ঔৎসুক্য জাগায়। অহৈতুক বলচি, এইজন্যে যে, সেই ঔৎসুক্যটা চরম কথা, তার আর কেন কি বৃত্তান্ত নেই। এই জগতে আমার ব্যক্তিরূপটি সেই জাতের, তার বাস্তবতা (reality) আমার কাছে একান্ত—তার উপরে কথা চলে না। তার সম্বন্ধে আমার ঔৎসুক্য সম্পূর্ণ সহজ — তার উপরে প্রশ্ন চলে না—আমার পক্ষে সকল প্রশ্নের শেষ উত্তর। যে কারণেই হোক রূপসীর reality আমার কাছে অনির্বচনীয়—আমি যে একটি ব্যক্তি সেই ব্যক্তির reality ওজনেই তার যাচাই। অর্থাৎ আমি নিজে যেমন বিনা বিশ্লেষণে বিনা তর্কে নিজের বাস্তবতা একান্ত উপলব্ধি করচি তাকেও তেমনই করি, সেইজন্যেই তাতে আমার আনন্দ।

আমি তাই বলি এই রূপসৃষ্টিই আর্ট—যে রূপের মধ্যে আমি একান্তভাবে অহৈতুক ঔৎসুক্যের সঙ্গে reality-কে দেখি। মনে করে দেখ না কোনো ভালো গানের রূপ সুরে তালে সমের আবর্তনে সে এমন একটি মায়া বিস্তার করে যাতে করে তাকে আমার অন্তরাত্মা নিরতিশয় সত্য বলে উপলব্ধি করে তেমন করে এই দেয়ালকে উপলব্ধি করে না। এই যে সত্য বলে উপলব্ধি জাগায়, সে কিসে? সে ঐ রূপে। এই রূপের উপকরণ নানারকম। প্রধান উপকরণ আবেগ Emotion। তার কারণ আবেগের দ্বারা চৈতন্য নিজেকে বিশেষভাবে প্রকৃষ্টভাবে জানে। এমন কি যোগীরা যাকে শুদ্ধচৈতন্য বলেন তারও অনুভূতি আনন্দ অর্থাৎ একটা আবেগ। Thought ও একটা কলাসৃষ্টির উপকরণ হতে পারে—কিন্তু কোনো সত্য সিদ্ধান্তে মনকে উত্তীর্ণ করে দেবার জন্য নয়। থটগুলিকে এমনভাবে সাজানো যায়, তার থেকে এমন একটা মুক্তির

অতীত ব্যঞ্জনা উৎপাদন করানো যায় যাতে সেটা রূপবান হয়ে উঠে, আমাদের অহৈতুক আনন্দ দেয়—নইলে আর্টের পদ্মবনে সে মত্ত হস্তী।

কাব্যরূপের বাহন হোলো শব্দ, বাক্য। শব্দের মধ্যে ধ্বনি আছে, অর্থ আছে—কাব্যরূপে দুইয়েরই প্রয়োজন—কিন্তু অর্থটি মুখ্যত সংবাদ দেবার জন্য নয়। অবশ্য সংবাদ দেওয়াও চাই, কিন্তু সেটা গৌণভাবে। সে যদি ছবি দেয়, যদি রস দেয় তাহলেই রূপ সৃষ্টির সহায়তা করে। সহানুভূতি শব্দটার ধ্বনিতে সুরও নেই, ছবিও নেই, রসও নেই। দরদ কথাটাতে যে কারণেই হোক রস জমে আছে। তাই কাব্যরূপে সহানুভূতি কথাটা ত্যাজ্য, দরদ কথাটা গ্রাহ্য। অথচ বুদ্ধির বিচারে সহানুভূতি কথাটা যথাযথ accurate—ওর মধ্যে মানেটা খুবই খোলসা করে বলা আছে অর্থাৎ অন্যের সঙ্গে এক হয়ে অনুভব করার ধর্মই সহানুভূতি এই সংজ্ঞাটা কথার সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া যায়—তবু চলল না, কেননা ব্যাখ্যা আছে রূপ নেই। এখানে রূপ বলতে বোঝায় যার মধ্যে বিশ্লেষণের অতীত ধারণার একটা সমগ্রতা আছে—এই শব্দটা মনের মধ্যে একটা individual রূপে বিচরণ করে না। ইনডিভিজুয়লের নাম হচ্ছে Proper name—এক হিসাবে সহানুভূতিটা Common name, দরদটা Proper name। Proper name তার অর্থের চেয়ে বেশী—সে অনেক আনুষঙ্গিক ভাবকে একত্র করে স্বতন্ত্র হয়ে আছে, তার প্রতিশব্দ নেই—দরদ ছাড়া আর কোনো কথা ওর জায়গা নিতে পারে না।

ইন্‌টেলেক্টের ইঁট সাজিয়ে তুমি যদি কাব্য রূপ গড়তে যাও তবে সেই সৃষ্টিতে প্রত্যেক ইঁট ঠিক আপন পরিমাণটির চেয়ে আর কিছু দিতে পারে না কিন্তু সজীব গাছে প্রত্যেক অংশই আপনাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। তার মধ্যে সৃষ্টির মায়া আছে যাতে করে সেই অংশগুলির সমগ্রকে সহজে স্বীকার করে। কাব্যরূপের কথাগুলির প্রত্যেকটাই যদি রূপবান হয় তবে সমস্ত রূপটিকেই অংশে অংশেই পাওয়া যায়। একেই বলে সৃষ্টি।

অত্যন্ত তাড়াতাড়ি লিখতে হল—অন্য কাজ আছে, তাছাড়া শক্তিরও দীনতা। আমার কথা স্পষ্ট হোলো কিনা জানিনে। যখন দেখা হবে মুখে আলোচনা করলে তোমার ও আমার উভয়ের পক্ষেই বিষয়টা সহজ হবে।

তোমার রচনার যে বিশেষ আত্মীয়তা দেখেছি সেটাকে অনাদর করা যায় না। সেইজন্যেই ইচ্ছা করি তোমার রচনাগুলিকে কোনো থিয়োরি দ্বারা পীড়ন না করে অর্থাৎ তাকে সূক্ষ্মাগ্র জুতো কর্সেট প্রভৃতি না পরিয়ে এবং মেয়েদের

মত জাহু এবং কনুই পর্যন্ত সাংঘাতিক ঘন সন্নদ্ধ অলঙ্কারের দ্বারা তার অঙ্গটাকে আচ্ছন্ন না করে তার সহজ দেহকে সহজ সজীবতার লাবণ্যে যদি প্রকাশ কর তাহলে তোমার এই লেখাগুলি রসিক সমাজে উপাদেয় ভোজের আয়োজনে লাগবে। মানুষের মধ্যে যে লোকটা বুদ্ধিমান তার দাবীর দিকে না তাকিয়ে যে লোকটা রসবিলাসী তাকে খুসি করবার চেষ্টা করো। বুদ্ধিমানদের জন্যে আছে আইনস্টাইন[১], বার্টাণ্ড্ রাসেল[২], Whitehead[৩], প্রশান্ত[৪], সুনীতি চাটুজ্জে[৫]—মস্ত মস্ত লোক সব—তোমার আমার মতো মানুষ রসিকসভায় রসের জোগানদেবার ভার নিতে যদি পারি তবে তার চেয়ে বেশী আশা নাই করলুম। ইতি

২৭ আষাঢ়, ১৩৩৫।

স্নেহানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সুধীন্দ্রনাথের চিঠি

রবীন্দ্রনাথকে

139 Cornwallis Street,
Calcutta.

শ্রীচরণকমলেষু,

বোলপুরে ছিলুম গভীর আনন্দে। উত্তরায়ণে তিন রাত্তির কাটানোর ফলে একটা অনির্বচনীয় গৌরব অনুভব করছি। তা ছাড়া আপনার চিরপ্রাণ চিত্তের বদান্যতায় আমার নির্জীব মন একটা অতিমর্ত্ত্য লোকের সন্ধান পেয়েছে। ফলে কৃতজ্ঞতাকে মৌন রাখা শক্ত। তাই আপনার কাছে কিছু লিখতে যতই কুণ্ঠা বোধ করি না কেন,—বিশেষত যখন বানান ভুল ও রচনার জড়িমার কথা মনে পড়ে, চিঠি লেখা ছাড়া তবুও গত্যন্তর নেই। আমার ধর্ম-বিশ্বাস যদি এত দুর্বল না হ'তো, তাহলে হয়তো ভাবতে পারতুম বোলপুরে যা-পেয়েছি তা পূর্বজন্মের সুকৃতির পুরস্কার মাত্র। দুর্ভাগ্যবশত জন্মান্তরবাদের প্রতি আমার আস্থা অল্পই। নিজের দৈন্যের পরিমাণও খুব ভালো করে জানি। কাজেই আপনার করুণা আপনার নিজের মহত্ত্বেরই অকাট্য প্রমাণ, এ-বিষয়ে সন্দেহ করতে পারছি না। নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করাও সম্ভব নয়, কেননা সৌভাগ্যের কথা ওঠে তখন, যখন দৈবাৎ নাগাল পৌছায় কৃপণের দুষ্প্রবেশ্য ভাণ্ডারে। কিন্তু আপনার উদারতা সঙ্কোচ-শূন্য, বেনো বনে মুক্তা ছড়াতে তার দ্বিধা নেই। সে উদারতার নিশ্চয়ই অপব্যবহার করেছি, তবুও সেজন্যে অনুতপ্ত নই; অত বড় অত মহার্ঘ্য দানের কণামাত্রও যদি ছেড়ে আসতুম, তাহলেই ক্ষোভের অন্ত থাকত না।

তা বলে মনে করবেন না, আমার লোভ তৃপ্ত হয়েছে। জানি, আমার দারিদ্র্য অমেয়, ক্ষুধার অন্ত নেই, অপূর্ণতা সনাতন; তবু আপনার উচ্ছ্বসিত মনীষার কতকটাও যদি সঞ্চয় করে রাখতে পারি, তা হলে ইহজীবনে আর দানাপানীর ভাবনা ভাবতে হবে না, এটাও ঠিক। কাজেই আমার চাওয়ার কোনো সীমা দেখছি না। আত্মসংযমের চেষ্টা করছি, শুধু আপনার স্বাস্থ্যে জগতের কতটা দরকার বুঝি বলে।

আমার কবিতাগুলোর সম্বন্ধে আপনি যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, তা বর্ণে বর্ণে সত্য। সে বিষয়ে যতই ভাবছি, মনে হচ্ছে আপনার কাব্যবিবেচনা নিখুঁত। তবে এক জায়গায় আপনার সঙ্গে আমার মতভেদ আছে: আমার বিশ্বাস ও-লেখাগুলোর দোষ সম্বন্ধে আপনি কতকটা স্নেহান্ধ হয়েছিলেন। কবিতাগুলোর ত্রুটি অসংশোধনীয় জানি বলেই বই বার করায় আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল না, এবং প্রকাশ করার ইচ্ছা নিয়ে ওগুলো লিখিনি বলেই সম্ভবত রচনার মধ্যে অত জড়তা আবিলতা রয়ে গেছে। জনসাধারণের রুচির প্রতি আমার অশ্রদ্ধা এত গভীর যে তাদের নিন্দা-প্রশংসায় আমি উদাসীন। প্রশ্ন উঠতে পারে, তবে কেন ওগুলো লিখেছিলুম এবং কেন ওগুলো বার করতে চাইছি। প্রশ্নের প্রথম ভাগের জবাব, আমি নিষ্কর্মা বলে; দ্বিতীয় ভাগের জবাব দেওয়া একটু শক্ত, তবে বন্ধুবান্ধবদের প্রবর্তনাতেই বই ছাপানোর কথা মনে জাগে। এখন নিজের সুবুদ্ধির তারিফ করছি যে, আপনার অনুজ্ঞা না নিয়ে ছাপাখানার কবলে পড়ি নি। আবর্জনা-প্রপীড়িত বাংলাকে নূতন জঞ্জালের চাপে আরো ব্যথিত করা যুক্তিযুক্ত হবে না ভেবেই ও তুচ্ছ কবিতাগুলো আপনার সামনে হাজির করতে সাহসী হয়েছিলুম। এ বললে মিথ্যা হবে যে, ওগুলোকে সম্পূর্ণ অসার মনে করি। আমার বলবার কথা দু-একটা আছে; এবং তারা বোধ হয় কাব্যসভায় আসন পাবার অযোগ্য নয়। কিন্তু রচনায় যে আনন্দ ও ব্যথা পেয়েছি তার জন্যে পাবলিকের কাছে বাহবা চাই না। আপনি সস্নেহ যত্নে সেগুলোকে পড়ে সমালোচনা করেছেন তাতেই আমার সাধনা সার্থক, আমি ধন্য।

আমার বলার প্রণালী দুষ্ট, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। জিজ্ঞাস্য হচ্ছে আমার থিয়োরির গোড়ায় গলদ আছে কি-না? আমার সম্পাদনের সিদ্ধি-অসিদ্ধির উপরে এ-থিয়োরির মরণ বাঁচন নির্ভর করে না, এ-কথা আপনি নিশ্চয় মানবেন। আমার মনে হয় কাব্যের প্রধান অঙ্গ lyricism নয় intellectualism এবং এতেই বিভিন্ন মনের আত্মকীয়তার প্রকাশ। কাব্যে intellectualism আনতে হলে প্রাধান্য দিতে হবে চিন্তাকে। সেই চিন্তাই গরীয়ান যে সমস্ত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে নিজের অবশ্যম্ভাবী লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছয়। যার মধ্যে শুধু গন্তব্যের আভাসটুকু আছে সে-চিন্তা অসংহত অপ্রয়োজনীয় ব্যঞ্জনার অনুপযুক্ত। কাব্য জগতে চিন্তার স্বতন্ত্রতা রক্ষিত হবে না। কবিতা চিন্তার বাহক মাত্র, চালক নয়। কাজেই চিন্তার রাস্তা

মোড়বহুল, গতি আঁকা-বাঁকা, পটভূমিকা পরিবর্তনশীল। চিন্তা স্বভাবত চঞ্চল, তার ধর্ম চলা, কিন্তু তার গতির একটা বিশেষত্ব আছে। চতুরায়তনিক ব্যোমে স্ব-নিয়ন্ত্রিত বস্তুর মত চিন্তাও চলে চক্রাকারে। অর্থাৎ সে যতই ঘোরাফেরা করুক, এলোমেলো চলুক, অবশেষে তাকে যাত্রাস্থলে ফিরে আসতে হবেই। এতে যদি সে অক্ষম হয় তাহলে তাকে অনুসরণ করা নিষ্ফল, সে নশ্বর। সময় গুণে তার দীপ্তির ক্ষয় হতে পারে, আকারের বিকার ঘটতে পারে, কিন্তু মধ্যপথে যদি তার চিত্তচাঞ্চল্য আসে, কোনো সহযাত্রী যদি তার একাগ্রতা বিনাশ করে তাকে আত্মলীন করে নেয়, কোনো কারণে সে যদি তার সংক্রান্তিবৃত্তের পূর্ণ পরিক্রমায় অকৃতকার্য হয়, তাহলে বুঝতে হবে তার জন্ম ব্যর্থ। সে নিজেও লাভবান হয় না, অন্যের ঐশ্বর্যও বাড়াতে পারে না, বরং আপনার অস্বচ্ছছায়ায় সঙ্গীর তেজ করে খর্ব। চিন্তার এই গুণ থেকেই গঠনের উৎপত্তি। গঠনের পরিচয় কবিতার পঙক্তিবিশেষের মধ্যে না-ও পরিলক্ষিত হতে পারে; কিন্তু একটা কবিতাকে পুরোপুরি নিলে তার মধ্যে একটা ঠাস বাঁধুনি থাকা উচিত। গঠন সাম্যবাদী : যে কবিতাগুলি গঠনের নিয়ম মেনে চলে, তাদের সকলের ভিতরেই একটা বিশিষ্ট ঐক্য আছে। এই ঐক্য আয়তিতে; জ্যোতির্লোকে যেমন একটা বাঁধাবাঁধি পরিমাপ আছে, কোনো তারাই যার চেয়ে বেশী বড় বা বেশী ছোট হতে পারে না, তেমনি কাব্য-লোকেও একটা দৈর্ঘ্য-ক্ষুদ্রতর একটা সীমানা থাকা বাঞ্ছনীয়। চিন্তার বাহন হতে হলে কবিতার যে ওজন থাকা আবশ্যক, দু-লাইনের জাপানী কবিতায় যেমন তার অভাব, অগণ্য স্পর্শসম্পন্ন নৈষধেও তথৈবচ।

আমার থিয়োরিটা মুখ্যত এই। এর থেকে গোটা কয়েক শাখা-প্রশাখা বেরিয়েছে। যথা অসাধারণ চিন্তার অভিব্যক্তিতে অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহার প্রশস্ত : কেননা এই ধরনের শব্দ মানব মনের অলসগমনের প্রতিবন্ধক। শব্দবাধায় ঠোক্কর খেয়ে অনেকেই হয়তো ঘরে ফিরবে, কিন্তু তার পরেও যারা এগুবে, তারা অন্তত চলবে চোখ খুলে, কান মেলে প্রতি পদে অগ্র পশ্চাৎ ঊর্ধ্ব অধঃ দেখতে দেখতে। এইখানে অলঙ্কারের কথাও বলে নিই কেননা অলঙ্কার চিন্তাকে পরিস্ফুট করবার বিশেষ সহায়। উপমানের সঙ্গে উপমার এত নিবিড় সম্পর্ক যে প্রথমটির স্বভাব অন্তত আংশিকভাবেও দ্বিতীয়টির মধ্যে এসে পড়ে। কাজেই উপমার ভিতরেও একটা সামঞ্জস্য, একটা ন্যায়সঙ্গতি না থাকলে মুস্কিল। কিন্তু তাই বলে উপমাগুলোকে গতানুগতিক হতে হবে এর কোনো মানে নেই।

বরং উল্টোটাই ভালো। সত্যকে নূতন ভাবে দেখতে গিয়ে নূতন রূপকের দরকার হওয়া স্বাভাবিক। এই রূপকের অন্বেষণে কবিকে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড মন্থন করতে হতে পারে। শুধু পারিপার্শ্বিক প্রতীক দেখেই যে-কবি তুষ্ট, সে-কবি অলস। কবিকে ব্যাধের সঙ্গে তুলনা করা যায়। ব্যাধের মতন কবিও একটা শিকারের পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে যদি তার চেয়ে বেশী কাম্য কোনো শিকার দেখে তো সে প্রথমটাকে যেতে দিয়ে শেষেরটাকে করে আক্রমণ। এই রকমের অনেক বাছাবাছির পরে মনের মতন প্রতীক মেলে। তখনই কবিতা পৌঁছয় পূর্ণের সমীপে। Simbolist কাব্যে এই জন্যই বোধ হয় উপমা ও উপমানের সম্পর্ক অনেক সময় প্রথম দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। প্রতীক অন্বেষণের সমস্ত বৃত্তান্তটা পাঠকের সামনে উপস্থিত করার কোনো বাধ্য-বাধকতা কবির নেই। পাঠকের দ্রষ্টব্য পরিণত ফলটি: সে যদি এই ফলের জন্মকাহিনী জানতে চায় তো বাকিটা কল্পনা করে নিতে পারে। কবিতার emotional content-এর কথা বলে বক্তব্য শেষ করব। যারা কবিতাকে ছুটির সাথী বলে ভাবে, কবিতার প্রতি ছত্র পড়ে হৃৎকম্পন অনুভব করতে চায়, তাদের কবিতা না-পড়াই উচিত। কবিতার গঠন যেমন প্রত্যেক লাইন বিশ্লেষণ করেও ধরা যায় না, তার ভাবাবেশও তেমনি খণ্ডাকারে দেখা যায় না, বিরাজমান থাকে সমগ্রের মধ্যে। ভাব শুধু মেঘ বাঁশী প্রিয়া বিরহ মিলন ইত্যাদি জরাজীর্ণ শব্দের করতলগত নয়, শুধু প্রেম বেদনা ও প্রকৃতিকে নিয়েই কাব্যের কারবার চলে না, তার লোলুপ হাত দর্শন-বিজ্ঞানের দিকেও আস্তে আস্তে প্রসারিত হচ্ছে। আজকের এই "বিশেষ জ্ঞানে"র দিনে কাব্যের তরফ থেকে আমি পাঠকের কাছে সেই নিবিষ্ট অনুশীলন ভিক্ষা করি যেটা সাধারণত অর্পিত হয় অন্যান্য আর্টের প্রতি।

অনেকক্ষণ ধরে বকলুম, কিন্তু আমার থিয়োরিটার বেশ সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করতে পেরেছি বলে মনে হচ্ছে না। আগেও বলেছি এবং আবার বলছি আমার থিয়োরির পরখ যেন আমার লেখাগুলোর সাহায্যে না-হয়। এটা আমার রচনার দোষ স্খালনের জন্যে সৃষ্টি করিনি। আপনার এতটা সময় নষ্ট করলুম, কারণ আমার মতে সাহিত্য জগতে আপনিই সর্বোচ্চ বিচারক, কাজেই আমার মোকদ্দমার শুনানি আপনার কাছেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমার সাক্ষ্যটা মুখের কথায় আপনাকে শোনাতে পারলেই ভালো হত, কিন্তু অবসর পাইনি, কাজেই লিখে জানাচ্ছি। এ বিষয়ে কোনো রায় এখুনি দিতে হবে

না। আপনার স্বাস্থ্য ভালো নয়, চিঠিপত্র লেখা-লিখিতে নিশ্চয়ই ক্লান্তি অনুভব করেন। তাই আপনার অভিমত আবার সাক্ষাতে জিজ্ঞাসা করব। ইতিমধ্যেই বুঝছি যে এতাদৃশ বাচালতার একমাত্র উত্তর তিরস্কার। কিন্তু সে জন্যে আমি বিশেষ উদ্বিগ্ন নই। আমার প্রতি যদি অসাধারণ স্নেহ ও সহিষ্ণুতা না-দেখাতেন তাহলে এই চিঠিখানা লিখতে সাহসী হতুম না। সহস্র দোষ যখন ক্ষমা করেছেন, তখন এই অপরাধটাও ক্ষমা করবেন বলে মনে হয়।

আমাদের স্বার্থপর অত্যাচারে আপনার শরীরের যে ক্ষতি ঘটেছিল, আশা করি এতদিনে তা শুধার [?] হয়ে এসেছে। ইতি ২৭শে আষাঢ়, বুধবার [১৩৩৫]

প্রণামাবনত

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

সুধীন্দ্রনাথের চিঠি

বুদ্ধদেব বসু-কে

হিমানী
কালিম্পং

প্রিয়বরেষু,

আপনার চিঠি গত কাল সন্ধ্যায় পেলুম। ইতিমধ্যে প্রবন্ধটা পাঠিয়েছি; আশা করি আপনার কাছে পৌঁছেছে। ওটার শিরোনামায় আপনার অনুপস্থিতি অনুচিত, কেন না প্রায় অর্ধেকটা আপনার আলোচনা। "প্রসাদ-গুণ ও বুদ্ধদেব বসু" শোনায় খারাপ; এবং "প্রসাদগুণে বুদ্ধদেব বসু" উপমায় কালিদাসের মতো। ফলে "বুদ্ধদেব বসুর প্রসাদগুণ" ছাড়া আর কিছু খুঁজে পাইনি। সম্পাদক হিসাবে আত্মবিজ্ঞাপন যদি একেবারে বাদ্ দিতে চান, তাহলে "প্রসাদগুণ ও বস্তুনিষ্ঠা" হয়তো চলতে পারে। কিন্তু নাম বাছার ভার আপনার উপর; এ নিয়ে আর বাক্যব্যয় করবো না।

হপ্‌কিন্‌স্-এর স্থিতিস্থাপক ছন্দ সম্বন্ধে গতবারে যা লিখেছি তা নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ নয়, এমন কি সার কথা কিনা, তাও সন্দেহ। কিন্তু আমার ধারণা একেবারে ভ্রান্ত না হলে, সে-ছন্দের অনুকরণ বাংলায় হয়তো অসম্ভব। কারণ পদের দৈর্ঘ্য বা হ্রস্বতার উপরে ছন্দের প্রকৃতি নির্ভর করে না; পর্বের আকার ও পর্বাঙ্গের বিন্যাসেই ছন্দের বৈচিত্র্য। এই দুই ব্যাপারে বাঙালী কবির স্বাধীনতা নগণ্য। অবশ্য তথাকথিত মাত্রাবৃত্তে সে নেহাৎই হাত-পা বাঁধা; কিন্তু স্বরবৃত্ত বা ছড়ার ছন্দেও পর্ব চতুর্মাত্রিক—কেবল চরণের শেষ পর্বে দুটো অতিরিক্ত মাত্রার প্রয়োগ নিষিদ্ধ নয় এবং পর পর তিনটে সুস্পষ্ট স্বরাঘাত পড়লে, তিন মাত্রায় পর্ব পূর্ণ হয়। রীতিমতো পয়ারে প্রথম পর্ব আট মাত্রার ও দ্বিতীয় ছয় মাত্রার ব'লে, তাতে রকমারির অবকাশ আপাতত একটু বেশী; কিন্তু তাকে ভাঙতে গেলে, চার মাত্রাই য়ুনিট্ হয়ে পড়ে; তার পরে পদান্তে আধ পর্ব বাড়ানো ছাড়া আর কোনো স্বাধীনতা মেলে না।

ইংরেজীতে এ-রকম বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই: গতানুগতিক ছন্দেও They clash / in a flash / — এ-দুই পর্বের ওজন সমান; এবং বোধহয় হপ্‌কিন্‌স্-এর মতে একটা পদে যদি পাঁচটা স্বরাঘাত থাকে, তাহলে চরণটা দশমাত্রিক,

কি পনেরোমাত্রিক, কি পাঁচমাত্রিক, তা না গুণেই, তাকে pentametre বলা বিধেয়। মুক্তছন্দে নানা জাতীয় পর্বের সমাবেশ, তাছাড়া পদ্য থেকে গদ্যে নেমে আসায় কোনো বাধা নেই। সুতরাং এ-রীতিও বাংলায় অচল; এবং অন্তত আমার কানে তথাকথিত গদ্যছন্দের ছন্দোগুণ অনাবিষ্কৃত রয়েচে। অগত্যা —র মিলবহুল গদ্য আমাকে পীড়া দেয় এবং গদ্যকে পদ্যের ঢঙে ছাপার সার্থকতা আমি দেখতে পাই না। কারণ সংস্কৃত কাব্যে গদ্য-পদ্যের বাছ-বিচার নেই; টুর্গেনিভ্-এর Poems in Prose বিনয় সত্ত্বেও আবেগে পরিপূর্ণ।

তবে এ-বিষয়ে আমার মত নিশ্চয়ই প্রামাণ্য নয়; এবং গদ্যছন্দের কল্যাণে বাংলা গদ্য-পদ্যের ব্যবধান যদি ঘোচে, তাহলে আমি যৎপরোনাস্তি খুশী হবো। ইতিমধ্যে 'সনে', 'মোরে' ইত্যাদি শব্দ, নামধাতু, অসমাপিকা ক্রিয়ার 'য়া' লোপ, মিলের তাগিদে বিভক্তি-বিপর্যয় বাঙালী কবির অবশ্য বর্জনীয় এবং ছন্দঃপতনের ভয়ে ব্যাকরণের অপমান অমার্জনীয়। ইতি—১১ এপ্রিল ১৯৪৬

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

পুঃ গত চিঠিতে অক্ষর syllable অর্থে ব্যবহার করেছিলুম। সংস্কৃত প্রয়োগ বোধহয় তাই।

॥ ২ ॥

হিমানী
কালিম্পং

প্রিয়বরেষু,

প্রবন্ধটা আপনার পছন্দ হয়েছে জেনে. সত্যই অত্যন্ত খুশী হলুম। কিন্তু আমার সন্দেহ ঘুচল না। লেখাটা নিশ্চয়ই আড়ষ্ট এবং জবাব জানি না ব'লে অনেক প্রশ্ন এড়িয়ে গেছি। তাছাড়া যে-সব লেখকের নাম নিয়েছি, তাঁদের রচনাবলীর উপরে একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া উচিত ছিলো; বিশেষ ক'রে আপনার লেখা আবার না পড়ে, আপনার সম্বন্ধে কলমচালনা নেহাৎ অবিবেকীর কাজ।

আপনার তথাকথিত দোষত্রয়-সম্বন্ধে যা বলেছি, তার ভিত্তি আপনার গল্পসংকলনে মোটেই নেই। আসলে ও-কথা না তুললেও চলতো। কিন্তু ত্রুটি না দেখালে, আপনার গুণবর্ণনা পাছে স্তুতিবাদের মতো শোনায়, এই ভয়ে পুরাতন স্মৃতি মন্থন ক'রে ওই বিষ উগ্‌রেছি। আপনার গদ্যের "কবিত্বে" আমি চিরদিনই মুগ্ধ: আপনার পদ্যের বিরুদ্ধে আমার একটা ছোট নালিশ এই যে, তাতে গদ্যের প্রভাব অল্প। যেমন ধরুন "আমাকে" না ব'লে "মোরে", "আমার" না ব'লে "মোর", "তাকে" না ব'লে "তাহারে", "ছিলুম"-এর জায়গায় "ছিনু" ইত্যাদি প্রয়োগে আমার কান সায় দিলেও, আমার বুদ্ধি সায় দেয় না। তবে এই প্রচলিত রীতি ভবিষ্যতেই বর্জনীয়—এই উপায়ে যে কবিতা লেখা হয়েছে, তাকে শোধরাতে গেলে, তা আর কবিতা থাকবে না। সুতরাং আপনার প্রাচীন রচনার সংস্কারে আপনি যে-সংযম দেখিয়েছেন, তার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। কারণ স্বাচ্ছন্দ্যই রসরচনার প্রাণ এবং প্রাণ-হানিকর সংশোধন অমার্জনীয়।

সে যাই হোক, বর্তমান প্রবন্ধের সম্পর্কে আপনি যা বলছেন, তা আমি সম্পূর্ণ মানি। যে-লেখা সাধারণবোধ্য নয়, তার কোনো সার্থকতা নেই। কিন্তু লিখতে গেলেই আমি একটা প্রচণ্ড বাধা অনুভব করি এবং সেই বাধা কাটিয়ে উঠতে আমার সমস্ত শক্তি খরচ হয়ে যায়, দুরূহতা অতিক্রম করা আর সাধ্যে কুলায় না। সেইজন্যেই আমি এত কম লিখি, এবং লেখা শেষ ক'রে সাধারণ লেখক যে আরাম পান, তা আমার কপালে জোটে না। তবু চেষ্টায় আমি বিমুখ নই এবং ইতিমধ্যে প্রবর্তন যদি একেবারে না ফুরোয়, তাহলে কোনো এক দিন হয়তো সরল রচনা আমার কলম দিয়েও বেরোবে। তত দিন পর্যন্ত আপনি আমার ঈর্ষাভাজন।

এইবার আপনার প্রশ্নের জবাব দিয়ে চিঠি শেষ করি।

(১) "ভুক্তভোগী" সমাজের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। আমার বিশ্বাস প্রয়োগটা ব্যাকরণসম্মত। কিন্তু আপনার কানে খারাপ লাগলে, শব্দটা বাদ দিয়ে দিবেন। শুধু সমাজ বললেও অর্থবোধের হানি হবে না। আমার বক্তব্য এই — যে-সমাজে সকলের ভাষা সমান সরল, সে-সমাজ কৃপার যোগ্য, সেখানে স্বাবলম্বীর আদর নেই।

(২) অনারাব্ধ অবশ্যই ভুল। অনারব্ধ ঠিক।

(৩) মন্ময়=মৎ+ময়, অর্থাৎ তৎ+ময়-এর উলটো, subjective। "মন্মথ" নিপাতনে সিদ্ধ, অর্থাৎ ও-কথাটার ব্যুৎপত্তি নিয়মের ধার ধারে না।

(৯) সজাতি মানে সমজাতি, আর স্বজাতি নিজের জাতি। সুতরাং এখানে সজাতিই প্রশস্ত।

(৫) রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্বন্ধে আমি যে হঠোক্তি ক'রে ফেলেছি, তা মার্জনার অতীত। "রবীন্দ্রনাথের নাটকমাত্রেই" বদলে "রবীন্দ্রনাথের বেশীর ভাগ নাটক" ক'রে দেবেন। "প্রায় নাটকমাত্রেই" চলবে না বোধহয়।

আমরা এখান থেকে সামনের রবিবার, অর্থাৎ ২১ তারিখে রওনা হবো। প্রুফ নিশ্চয়ই তার আগে পাওয়া যাবে না। সুতরাং কলকাতার ঠিকানাতেই পাঠাবেন।

"উক্তি ও উপলব্ধি* নামটা কি চলতে পারে? আর কিছুই মাথায় আসছে না উপস্থিত। ইতি—১৫ এপ্রিল ১৯৪৬

ভবদীয়

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

---

* "কুলায় ও কালপুরুষ" গ্রন্থভুক্ত।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-এম. এন. রায় পত্রাবলী

[সুধীন্দ্রনাথ ও এম. এন. রায়ের মধ্যে বন্ধুত্বের কথা খুব কম লোকই জানতেন। তাঁদের দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা কোন্ পর্যায়ের ছিল, তা জানতে উৎসুক হয়েই এই দুই পরিবারের মধ্যে বিনিময়-হওয়া চিঠির অনুসন্ধান আরম্ভ করি। অবশেষে দেরাদুনে ইণ্ডিয়ান রেনেশাঁস ইনস্টিটিউটের "এম. এন. রায় আরকাইভস"-এ ৩৫টি চিঠির সন্ধান মেলে। এগুলির মধ্যে আছে সুধীন্দ্রনাথকে লেখা এম. এন. রায়ের, এলেন ও এম. এন. রায়কে লেখা সুধীন্দ্রনাথের এবং রাজেশ্বরী দত্তের চিঠি। এই চিঠিগুলির মাধ্যমে আমরা দুই পরিবারের বিশেষ সম্পর্ক ও সুধীন্দ্রনাথের জীবনের অপর একটা দিক এবং তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কিছু ঘটনাও জানতে পারি। প্রাপ্ত চিঠিগুলির মধ্যে এম. এন. রায়ের প্রতিটি চিঠি টাইপ করা, তাতে জায়গার নাম বা সই নেই। এম. এন. রায়ের এই চিঠিগুলি নিশ্চিতভাবে দেরাদুন থেকে লেখা। এম. এন. রায় সর্বদা চিঠির বয়ান 'ডিকটেশান' দিতেন এবং এলেন রায়ের কাজ ছিল তা টাইপ করে রায়ের সই নিয়ে ডাকে পাঠানো; তিনি দেরাদুন থেকে পাঠানো সব চিঠিরই কপি রাখতেন। সুধীন্দ্রনাথ-রাজেশ্বরী দত্তের বাড়িতে কোনও চিঠি না পাওয়ায় আমরা জানতে পারছি না দেরাদুন থেকে অন্যত্র গেলে রায় পরিবার কোন্ জাতীয় চিঠি লিখেছিলেন। "রিজন, রোমানটিসিজম অ্যাণ্ড রিভোলুশান" বইটি লিখবার সময় এম. এন. রায় যে-সব বিষয়ে সুধীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখতেন, তার একটির জবাব হচ্ছে ১৪ নম্বর চিঠি। চিঠিটা পড়বার সময়ে ওই চিঠির আগে ও পরে এম. এন. রায়ের চিঠি দুটি পড়তে না পারায় অনেকেই অস্বস্তিবোধ করবেন।

এই চিঠিগুলিতে একটা জিনিস লক্ষ্য করে অবাক হতে হয়। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট মুসলিম লীগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামে'র পরিণতি হিসাবে কলকাতায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হয় এবং এই দাঙ্গাই পরে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে পাকিস্তান প্রস্তাবকে বাস্তবে রূপায়িত করতে সাহায্য করে। দাঙ্গা, দেশভাগ, শরণার্থী আগমন এবং গান্ধীজীকে হত্যা সুধীন্দ্রনাথকে এতটা বিচলিত করে যে, তিনি দেশত্যাগের কথা ভেবে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির জন্য একটা

আবেদনও করেছিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, সুধীন্দ্রনাথ ও রাজেশ্বরী দত্তের চিঠিতে ওই সব বিষয়ে কোনও আলোচনা নেই, কেবল দাঙ্গা সম্পর্কে কয়েকটি নামমাত্র উল্লেখ আছে। যে-সব ঘটনা সুধীন্দ্রনাথকে অতটা বিচলিত করেছিল, সে সব বিষয়ে কোনো চিঠি না লেখা রহস্যজনক মনে হয়।

শ্রীমতী রাজেশ্বরী দত্ত চেয়েছিলেন, বুদ্ধদেব বসু চিঠিগুলির অনুবাদ অনুমোদনের পরেই যেন এগুলি ছাপতে দেওয়া হয়। কিন্তু অনুবাদের কাজ শেষ হওয়ার আগেই বুদ্ধদেব বসু আমাদের মধ্য থেকে বিদায় নেন। শ্রীমতী দত্তের ইচ্ছানুসারে চিঠিগুলির অনুবাদ দেখে দিয়েছেন অরুণকুমার সরকার ও আলোক সরকার। অনুরোধের সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে চিঠিগুলি তাড়াতাড়ি অনুবাদ করে দিয়েছেন শ্রীমতী নার্গিস সাত্তার। স্থানাভাবে ৩৫টি চিঠির মধ্যে এখানে মাত্র ১৫টি চিঠি ছাপা হল, কোনও কোনও বিষয়ে একটা চিঠিও এখানে ছাপা গেল না। এই ১৫টি চিঠির মধ্যে ৯টি লিখেছেন সুধীন্দ্রনাথ (এম. এন. রায়কে ৭ এবং এলেনকে ২), এম. এন. রায় ৩টি (সুধীন্দ্রনাথকে) এবং রাজেশ্বরী ৩টি (এলেনকে)। ওই ৩৫টি চিঠি, সুধীন্দ্রনাথের তিনটি ইংরাজী প্রবন্ধের অনুবাদ এবং দুটি প্রবন্ধ সম্পর্কে এম. এন. রায়ের মন্তব্য একটা পৃথক বই হিসাবে অল্পদিনের মধ্যেই প্রকাশিত হবে।—সম্পাদক।]

মানবেন্দ্রনাথ (এম. এন.) রায়কে

স্যুট নং ৬
৬, রাসেল স্ট্রীট, কলকাতা।
জানুয়ারি ১২, ১৯৪৪।

প্রিয় শ্রীরায়,

অভদ্রতা ক্ষমার অযোগ্য। চিঠি পেয়ে প্রাপ্তি-স্বীকার না করা অভদ্রতা। আপনার বন্ধুত্বপূর্ণ ও সৌজন্যমূলক চিঠির উত্তর দিতে এত দেরি করা এমন একটা অপরাধ, যার শাস্তি হিসাবে সঙ্গে সঙ্গেই সামাজিক বয়কট করা উচিত। আপনার চিঠির সহৃদয়তা ও উপহারের[১] বদান্যতা আমার এই ধরনের ব্যবহারের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। আপনার উপহার হিসাবে পাঠানো বইটির যোগ্য হত এমনভাবে আমি চিঠিটা লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার অসুস্থতার জন্য সংক্ষিপ্ত প্রাপ্তি স্বীকার ছাড়া আমি কিছুই করতে পারি

নি। আমি এখনও খুব ভাল নেই; কিন্তু দিনগুলো অস্বস্তিকর রকম দ্রুতগতিতে চলে যাচ্ছে এবং ঋণের বোঝা ক্রমেই অসহনীয় হয়ে উঠছে। সুতরাং আমি স্থির করেছি, শয্যাশায়ী থাকা অবস্থায় একটা দিন এমনভাবে সদ্ব্যবহার করব যাতে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত লাইনের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া যাবে যে, 'লেটার্স ফ্রম জেল' বইটি একটা মহৎ সৃষ্টি। বইটির বিস্ময়কর মানবতা আমার শীত-কাঁপানো হাড়গুলিকে উষ্ণ করেছে। উপন্যাসের বাইরে এই ধরনের জ্ঞান ও বোধশক্তি, সাহস ও স্থৈর্য, এমন সহনশীলতা ও সমতার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ কদাচিৎ ঘটে থাকে, যদিও বইটিতে এমন অনেক বিষয় আছে, যেগুলির সঙ্গে আমি তীব্রভাবে ভিন্নমত পোষণ করি। যেমন, শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন' সম্পর্কে অতিরিক্ত প্রশংসা,[২] বর্ণের[৩] মতো তৃতীয় শ্রেণীর পদার্থবিদকে গুরুত্ব দেওয়া, হাইজেনবার্গ[৪] ও বোর[৫]-এর উপর নিন্দাবর্ষণ এবং আপনার এইজাতীয় দৃঢ় মতামত আমার মধ্যে জোরালো প্রতিবাদের ঝড় তোলে। মালরো[৬] সম্পর্কে আপনার যথার্থ নিন্দা, প্রতিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে মার্কসবাদ ব্যাখ্যার ব্যাপারে আপনার পরিণত যুক্তি, জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে আপনার বক্তব্যের অতুলনীয় বিচক্ষণতা প্রতিটি চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক করবে। এই চিঠিগুলির নিষ্ঠা ও সততা সত্যিই বিস্ময়কর। সাহিত্য-শিল্প সম্পর্কে অজ্ঞ হলেও, লেখককে একজন উল্লেখযোগ্য কুশলী শিল্পী হিসাবে গণ্য করা যায়। প্রতিটি চিঠিতে মানুষ হিসাবে পরিপূর্ণ মর্যাদা নিয়ে আপনি উপস্থিত। অবশ্য আপনার মনের খবর জানি, এমন অবিশ্বাস্য দাবি আমি করি না। হয়তো আপনার সঙ্গে আমার ভাসাভাসা পরিচিতির জন্য বইটি পড়বার সময় বারবার মনে হচ্ছিল যে, আপনি আমার সামনে বসেই কথা বলছেন।

বইটি বন্ধ করে আমি অনেকক্ষণ বসেছিলাম। ভাবছিলাম, আপনার কাজ ও চিন্তার মধ্যে প্রকৃত সংগতি ও ধারাবাহিকতার কথা, আপনার এই বিস্ময়কর ধারাবাহিকতার গোপন চাবিকাঠিই বা কোথায়? আমার চেনা-জানাদের মধ্যে আপনার জীবন অনেক বেশী পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা পরিবর্তিত। আপনি এখনও পর্যন্ত সুবিধাবাদী হতে শেখেননি। আপনি এখনও আশাবাদী এবং আপনার আত্ম-বিশ্বাস এক মুহূর্তের জন্যও শিথিল হয়নি। আপনার মানসিকতার বিস্ময়কর পরিণতি হয়তো আংশিকভাবে আপনার অনমনীয়তাকে ব্যাখ্যা করতে পারে। কিন্তু অহমিকাবোধ দিয়ে

ব্যাপারটা কি পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা যায়? অহমিকাবোধ গুণ না দোষ? আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধার ব্যাপারে এটা একেবারেই একটা আলঙ্কারিক প্রশ্ন। অনাগত ভবিষ্যতের আমি কোনও অভিভাবক নই। দ্বিতীয় আবির্ভাব জাঁকজমকের[৭] সঙ্গে কিংবা লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে হবে কিনা তা নিয়ে আমি ভাবতে চাই না। নিজের উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাসের অভাব খুবই দুর্ভাগ্যজনক। ফলে আমাকে বাধ্য হয়েই প্রতি দরগাতেই সিন্নি দিতে হয় এবং আপনার বিস্ময়কর বুদ্ধিবৃত্তির নিকট আমার মাথা স্বাভাবিকভাবেই নত হয়ে আসে।

আপনার প্রস্তাবিত রেনেশাঁস আন্দোলন সম্পর্কে আমার বিশেষ কিছুই লেখার নেই। প্রস্তাবিত আন্দোলনের কাজ-চলা গোছের খসড়া কর্মসূচী আলোচনার জন্য আমরা একদিন আমার ফ্ল্যাটে মিলিত হয়েছিলাম। আর একবার বসেছিলাম শ্রীমতী সেনের[৮] বাসায়। সেদিন আমরা শ্রীমতী সেনের স্নেহধন্যদের একজনের নাটক শুনতে গিয়েছিলাম। নাটকটি খুবই মামুলী, যদিও সুলিখিত এবং মর্মস্পর্শী। নির্বাচিত স্বল্পসংখ্যক দর্শক সত্ত্বেও আমার কমলা-চোখে দর্শকদের মাঝারি বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী ও নিষ্প্রাণ মনে হয়েছিল। অদূর ভবিষ্যতে আমাদের আর একবার বসতে হবে এবং আমার বিশ্বাস কর্মসূচী বিবেচনার জন্য আমাদের আরও বুদ্ধিবৃত্তি খাটানোর প্রয়োজন হবে। এই ধরনের আড্ডা থেকে কি কোন কিছুর পুনর্জন্ম সম্ভব? আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সি পি. আই দলে আমার প্রাক্তন-বন্ধুদের বক্তব্য অনুসারে আমার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ পশ্চাৎমুখীন। এটা খুব কম বিস্ময়ের ব্যাপার যে, ঐসব 'প্রগতিশীল' সমাবেশে 'বাঁধন ছেড়ে বেরুতে চায়' এমন যুবকদের চেয়ে আপনার মতো মধ্যবয়স্ক ব্যক্তির মধ্যে আমি অনেক বেশী সজীবতা দেখতে পাই।

আশাকরি আপনার শরীর এখন ভালোর দিকে এবং আপনার বোমবাই সফর সফল হয়েছে। এলেনকে[৯] ভালবাসা।

আপনাদের

সুধীন।

পুনশ্চঃ অন্য বইটি 'কম্যুনিস্ট ইণ্টারন্যাশানাল?' আমার হাতে পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গেই সুশীল[১০] পড়তে নিয়েছিল। বইটি আমি এখনও দেখিনি। ঐ সম্পর্কে আমার মতামত আপাতত স্থগিত রাখতে হচ্ছে।

॥ ২ ॥

এম. এন. রায়কে

কণ্ট্রোলার, এ-আর-পি, বেঙ্গল।
১০ম্যাডান স্ট্রীট, কলকাতা।
২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫।

প্রিয় শ্রীরায়,

বোমবাই থেকে পাঠানো আপনার দুটো চিঠির জন্যই আমি ঋণী। চিঠির উপর ঠিকানা না-লেখার ব্যাপারে আপনার বদ-অভ্যাস এবং যন্ত্রের প্রতি গান্ধীবাদ সুলভ বিতৃষ্ণার দ্বারা আমি অনুপ্রাণিত হওয়ায় (টেলিফোনের প্রতি এই বিতৃষ্ণা সবচেয়ে বেশী), উত্তর দিতে আমি এত বেশি দেরি করেছি। সম্ভবত এতদিন সফরে ক্লান্ত হয়ে আপনি দেরাদুনে ফিরেছেন। যাই হোক, এই চিঠি দেরাদুনেই পাঠানো হচ্ছে।

আমি একরকম নিশ্চিত যে, ইতিমধ্যে আপনি ধরিত্রীর[১] নিকট থেকে সব কিছু জেনেছেন এবং তাঁকে প্রয়োজন মতো নির্দেশ দিয়েছেন। এই মুহূর্তে কিছুই আশাব্যঞ্জক মনে হচ্ছে না এবং প্রেসের সঙ্গে ধরিত্রীর চূড়ান্ত কথা বলার ফলাফলও জানিনা। লাইনো টাইপের অভাব কোন প্রতিবন্ধকই নয়। তবে ছাপাখানার মালিক প্রতিবার এই সময়ে ছাপানোর কাগজ আনার দায়িত্ব নিতে রাজী হলে ওদের সঙ্গেই আমাদের বন্দোবস্ত করা উচিত। কাগজের সমস্যাটিই গুরুত্বপূর্ণ এবং অনেক টাকারও দরকার হবে। এই পরিস্থিতিতে কী করা উচিত, সে-বিষয়ে আপনাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

আমার বরাবরই 'মার্কসিয়ান ওয়ে'[২] নামটি পছন্দ। এই নামটি আপনার পত্রিকার লেখকদের নিকট আপত্তিজনক মনে না হলে ঐ নাম বদলে 'টর্চ' রাখা সঙ্গত হবে না। কারণ 'টর্চ' নামটি স্কুল ম্যাগাজিনের স্মৃতি বিজড়িত।

রাজেশ্বরীর[৩] চেষ্টা সত্ত্বেও প্রচ্ছদটি এখনও যামিনী রায়ের মাথায় আছে। যামিনী রায়কে[৪] দিয়ে কাজটি করাতে শনি অথবা রবিবারে আমরা আর একবার চেষ্টা করব।

আমি লক্ষ্মণশাস্ত্রীর[৫] প্রবন্ধটি[৬] পড়েছি। নির্মমভাবে সংক্ষিপ্ত করলে লেখাটি চলতে পারে। লেখাটির প্রথম আট পাতার সত্যি সত্যি কোনও

দরকার নেই। অথচ ঐ কয়টি পাতার জন্ম প্রবন্ধের মূল বক্তব্য গুলিয়ে যায়। যদি অনুমতি দেন, আমিই ওটা ছোট করার চেষ্টা করব। কিন্তু আমাদের প্রথম সংখ্যাটি এপ্রিলে বের করতে হলে অন্তান্য লেখাগুলি তাড়াতাড়ি পাওয়া দরকার। আইয়ুব[7] সৌন্দর্যতত্ত্ব অথবা মার্কসবাদের নিন্দামূলক একটা প্রবন্ধ লেখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এখন অসুস্থ। আমার মনে হয় না, তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি রাখতে পারবেন। গল্পটিও ওঁর মাধ্যমে আসার কথা ছিল। ওঁর অসুস্থতার জন্ম গল্পটি পাওয়া সম্পর্কেও অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। আমি আরও দুই এক জনকে এই মাসের মধ্যে লেখা দিতে বলেছি। দেখা যাক্, কী হয়।

আমার নিজের লেখাটাও[৮] তৈরি। আপনাকে ওটা অন্ত খামে পাঠাচ্ছি। লেখাটি আদৌ আমার মনোমত হয়নি। কাজেই আপনার অ-পছন্দ হলে ওটাকে বাতিল করতে দ্বিধা করবেন না। আমার নিজের লেখা সম্বন্ধে স্পর্শকাতরতা কিন্তু আমার অসংখ্য ত্রুটির মধ্যে একটিও নয়। টাইপিং মারাত্মক রকম খারাপ। কিন্তু ওটা পুনরায় টাইপ করতে গিয়ে আমার আরও বেশী সময় অপচয় করা উচিত হবে না। যাই হোক, লেখাটি দেখলেই আমার বিরক্তি লাগে। এইমাত্র আমি ডিউই'র বইটা[৯] শেষ করলাম। বইটি আমার ভালো লেগেছে। কারণ বইটির রুশবাদ বিরোধিতা আমার মতোই তীব্র। ডিউই আমার মতোই একনায়কত্ব বিরোধী, বহু জিনিসের মধ্যে ভালো দেখেন। লেখকের সঙ্গে আমি সব বিষয়ে একমত বলেই আমার মনে হয় না যে, আমাকে দিয়ে বইটির সমালোচনা[১০] করানো খুব ভালো হবে। সেজন্ম সুশীল সমালোচনার জন্ম যে-সব বই বেছেচে, সেগুলির সঙ্গে এটাকেও যুক্ত করার কথা আমি সুশীলকে বলেছি। এই মুহূর্তে ওঁর একটুও সময় নেই। এটা নিশ্চিত যে, মার্চ মাসের মাঝামাঝি ওঁর কাছ থেকে কিছু আদায় করতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। রাজেশ্বরী সামনের মাসের গোড়ার দিকে লাহোরে যাবার পরিকল্পনা করছে। সব কিছু বিবেচনা করে আমি ওর সঙ্গে যাচ্ছি না। দু'সপ্তাহের ছুটিতে রেল-ভ্রমণটা বড় দীর্ঘ। ত্রৈমাসিকটা শেষ পর্যন্ত বের করতে হলে আমার এখানেই থাকা বেশী দরকার। আমরা ভালো আছি। সুশীল এবং বুলবুল[১১] ভালোই আছে। আশা করি আপনি সম্পূর্ণ সেরে উঠেছেন। এলেন কেমন আছেন। দুজনকেই ভালবাসা।

সুধীন।

॥ ৩ ॥

এলেন রায়কে

৬১ ফিরোজপুর রোড,
লাহোর।
১২. ৩. ৪৫

প্রিয় এলেন,

শ্রীরায় কেমন আছেন? ম্যাগাজিনের[১] কী হল? সুধীনের শেষ চিঠি পড়ে মনে হল সে খুবই চিন্তিত। আশা করি শেষ পর্যন্ত ওটা এপ্রিলেই বের হবে। সেই 'টর্চ'[২] সম্বন্ধে আমি সত্যিই খুব দুঃখিত। যামিনী রায় সে-সময়ে তাঁর প্রদর্শনী নিয়ে বড় ব্যস্ত ছিলেন এবং তাঁকে যে আমি অনুরোধ করেছিলাম, তা তিনি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলেন।

তাড়াতাড়ি চিঠি লিখবে এবং আমাকে সব খবর জানাবে।

তোমাদের দুজনকেই ভালবাসা।

তোমার স্নেহধন্য-
রাজেশ্বরী।

॥ ৪ ॥

এম. এন. রায়কে

স্যুট-৬,
৬ রাসেল স্ট্রীট,
কলকাতা
মার্চ ১৯, (১৯৪৫)।

প্রিয় রায়,

আপনার ১৩ তারিখের চিঠি আমার নিকট ১৬ই পৌঁছেচে এবং আপনার পুস্তক-সমালোচনা পেয়েছি গতকাল সন্ধ্যায়। পুস্তক-সমালোচনাটি চমৎকার, যদিও জায়গা বেশী থাকলে অনেক বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করতে পারতেন। তবে, আমাকে যা সবচেয়ে ভাবিয়ে তুলেছে, তা হচ্ছে আপনার

এই বক্তব্য যে, প্রগতির অর্থ অন্তত একটি অংশের উন্নতি। যদি আমি আপনার বক্তব্য ঠিক মতো অনুধাবন করে থাকি, তাহলে আমাদের দুজনের "গভীর মত-পার্থক্য" তত গভীর নয়।

আপনার সম্পাদকীয় আমার খুব ভাল লেগেছে। আমার লেখা সম্পর্কে আপনার সমালোচনা যথার্থ এবং খুবই সঙ্গত। সুশীলের বিষয়ে[১] আপনার মন্তব্য সম্পর্কে ঐ একই কথা প্রযোজ্য। মাত্র একটি এবং নিয়ন্ত্রিত বিষয়ের আওতায় তিনটি ভিন্ন ধরনের এবং সম্পূর্ণ পৃথক প্রবন্ধ সংগ্রহ করা খুবই দুঃসাধ্য কাজ এবং এ-ব্যাপারে আপনার কৃতিত্ব সব প্রশংসার বাইরে। আমার শুধু একটা কথাই বলার আছে যে, স্প্র্যাটের[২] প্রতি আপনি যথেষ্ট সুবিচার করেননি এবং আমার মনে হয় না যে, আপনি তাঁর বক্তব্যের যথাযথ জবাব দিয়েছেন।

"মার্কসিয়ান ওয়ে" সম্পর্কে সব কথা দেবশরণ[৩] আপনাকে জানিয়েছেন। আমার অনুমান, দেবশরণ আপনার নির্দেশেই গতকাল তিনটি প্রবন্ধ প্রেসে দেওয়ার জন্য নিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম, প্রথম সংখ্যাতেই এক জন যথেষ্ট নাম-করা লোকের লেখা থাকুক। গয়ার[৪]-এর বক্তৃতা ছাপতে কী আপত্তি থাকতে পারে, আমি বুঝতে পারছি না। আপনি ফেরৎ ডাকে বক্তৃতাটা পাঠালে, এখনও আমরা ওটিকেই প্রথম প্রবন্ধ হিসাবে ছাপতে পারি। আপনার নিকট সম্পাদকীয়-এর একটা কপি থাকায়, বক্তৃতার উপর মন্তব্য হিসাবে আপনি ওটাতে কয়েক লাইন যোগ করতে পারেন। অবশ্য বক্তৃতাটা ভাল এবং পাঠযোগ্য হলেই এ-কথা প্রযোজ্য। সেক্ষেত্রে শাস্ত্রীর প্রবন্ধটি আপাতত আটকে রাখা যেতে পারে।

মনে হচ্ছে, আপনি আমার অন্তত দুটো চিঠি পাননি। নাকি ওগুলি ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছে? যাই হোক, চিঠি দুটিতে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল না, যা আপনার জানা নেই।

ভালবাসা।

সুধীন্দ্র।

॥ ৫ ॥

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-কে

২২. ৩. ৪৫

প্রিয় সুধীন,

আপনার ১৯ শে মার্চের চিঠি পেয়েছি। আমি বুঝতে পারছি না, আপনি কোন্ চিঠি দুটোর কথা বলছেন? ২১ ও ২৭ ফেব্রুয়ারি লেখা আপনার চিঠি দুটো আগেই পেয়েছিলাম। ওগুলো বড্ড পুরোনো। অন্য চিঠিগুলো নিশ্চয়ই এতদিনে এসেছে এবং অন্যান্য কাগজপত্রের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। তবে কখনও বিশেষ কিছু থাকলে আমি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়ে থাকি।

এটা সুখবর যে, আমরা অবশেষে কাজ আরম্ভ করে দিতে পেরেছি। নতুন কিছু যোগ করার পক্ষে কি খুব বেশী দেরি হয়ে যায়নি? গয়ারের কাছ থেকে প্রথম সংখ্যার জন্য বিশেষভাবে লিখিত কোন প্রবন্ধ সংগ্রহ করতে সমর্থ হইনি। কিন্তু দ্বিতীয় সংখ্যার জন্য লেখা পাওয়ার ব্যাপারে আমি একরকম নিশ্চিত। ইতিমধ্যে আমরা নিজেদের কেন বিখ্যাত ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করব না? যাই হোক, একটা ভিন্ন খামে গয়ারের বক্তৃতা পাঠাচ্ছি। জায়গার কথা ভেবে এটা অনেকখানি সংক্ষিপ্ত করতে হবে। বাদ দেওয়া যেতে পারে, এমন জায়গাগুলি আমি চিহ্নিত করেছি। ছাপানোর ব্যাপারে আমরা কোনো প্রতিশ্রুতি দিইনি। সুতরাং আপনি তীব্র সমালোচক হতে পারেন। যে-কোন কারণে জিনিসটা আপনার অপছন্দ হলে, এটা ব্যবহার করার দরকার নেই। আমি নিজে ওটা ব্যবহার করার পক্ষে নই। কিন্তু আপনি বিখ্যাত নামের জন্য বিশেষভাবে আগ্রহী থাকায় আমি আপনাকে অন্তত একটা সুযোগ দিচ্ছি। গয়ারের প্রবন্ধ পেলে সম্পাদকীয় মন্তব্যে যে কয়েকটি লাইন যোগ করতে হবে, তা আগামী কাল পাঠাব। আপনি সম্পাদকীয়টি অনুমোদন করেছেন জেনে আমি আনন্দিত। কেবল স্প্র্যাট নয়, সকলের ক্ষেত্রেই আরও আলোচনার জন্য আমি পাঠকদের প্ররোচিত করেছি মাত্র। অবিচার শুধু স্প্র্যাটের ক্ষেত্রেই করা হয়নি, কিন্তু এটা খালি হাতে অবিচার নয়। তবে, আপনি যদি মনে করেন যে, স্প্র্যাটের প্রতি আর একটু সুবিচার করা হোক, তাহলে আপনি সম্পাদকীয়তে কয়েকটা লাইন যোগ করে দেবেন। সাধারণতঃ আমি বিশেষভাবে চাই যে,

আপনি প্রতিটি সংখ্যাতেই সম্পাদকীয়ের ক্ষেত্রে এই রকম করবেন। বইটি পড়ার সময়ে যে কয়েকটি পয়েন্ট লিখে রেখেছিলাম, সমালোচনা লেখার সময়ে সেগুলিরই আলোচনা করেছি। কিন্তু পুস্তক-সমালোচনাটি আর বড় করা যেত না। আপনি এটা অনুমোদন করায় আমি আনন্দিত। আমি আরও আনন্দিত এই কারণে যে, আপনি শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করেছেন যে, আমার সঙ্গে "আপনার গভীর মত-পার্থক্যের" বাস্তব ভিত্তি খুবই কম। সবে ছাপা শুরু হওয়ায়, পত্রিকাটি এপ্রিলের শেষ সপ্তাহের আগে বের হবে না। মলাটের কাগজ সম্বন্ধে দেবশরণ আমাকে কিছু লেখেননি। আপনাকে এ-বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। নমুনা দেখার উপর জোর দিতে হবে এবং যেটা আপনি অনুমোদন করবেন, সেটাই নির্বাচন করতে হবে। রাজেশ্বরী যামিনী রায়কে দিয়ে প্রচ্ছদ আঁকাতে ব্যর্থ হওয়ায়, আমার ধারণা, মলাটের প্রচ্ছদ ছাড়াই আমাদের কাজ চালাতে হবে। তবে ভাল কাগজের উপর পরিচ্ছন্ন মলাট এবং টাইপের রুচিসম্মত ব্যবহার বেশ ভালই হবে। আপনি প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবেন।

আপনাদের দুজনকে আমাদের দুজনের ভালবাসা।

আপনাদের বিশ্বস্ত

রায়

॥ ৬ ॥

এম. এন রায়কে

হিমানি

কালিম্পং

এপ্রিল ১২, (১৯৪৬)

প্রিয় রায়,

আপনার চিঠির জন্য ধন্যবাদ। এলেন[১] বা আপনি কেউ জানাননি, আপনি কেমন আছেন। আশা করি, অস্ত্রোপচারের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

এই গ্রীষ্মে আপনার কর্মসূচী কী? আমার মনে হয়, আপনি গরমে থেকে বাইরে গেলে ভালো করবেন। আমি শুনে সুখী হলাম যে, বইটির সংক্ষিপ্ত-সার[২] লেখার কাজ আরম্ভের ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ করে ফেলেছেন। সংক্ষিপ্ত-সারটি

দেখতে পেলে আনন্দিত হব, যদিও ঐ ব্যাপারে আমার যোগ্যতা সম্পর্কে নিজের মনেই সন্দেহ আছে। যুদ্ধের বছরগুলিতে বইয়ের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক ছিল না। তবুও আমার যে-সব তথ্য জানা আছে, তা সর্বদাই আপনার কাজে লাগতে পারে। প্রতিশ্রুতি-অনুসারে ধূর্জটি[৪] গ্রীষ্মে কলকাতা এলে আমি তাঁর নিকট থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত বইগুলির নাম ও অন্যান্য তথ্য জানতে পারব।

আমরা এখানে অনেকটা অলস জীবন কাটিয়েছি। তা সত্ত্বেও সাময়িকভাবে একটা বাংলা প্রবন্ধের[৪] পিছনে লেগে থাকার মতো নির্বুদ্ধিতা দেখিয়েছি, যা আমাকে মহাঝঞ্ঝাটে ফেলেছিল এবং আমার পুরো পনেরো দিন সময় নিয়ে নিয়েছে। ফলও তেমনি হয়েছে, খুসী হওয়ার মতো কিছু হয়নি এবং আমি প্রায় নিশ্চিত যে, আমার প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আমার পড়াশুনা শম্বুকের গতিতে চলেছে এবং মাত্র গতকাল আমি 'যোগী ও কমিশার'[৫] পড়া শেষ করেছি। বইটি আমার খুবই ভাল লেগেছে। কারণ বইটিতে আমার মনোভাবই প্রতিফলিত। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে প্রদত্ত ঘটনাগুলি বর্ণনা ও ব্যাখ্যা ঠিক হলে কোন সুবিবেচক ব্যক্তিকে আর সমষ্টিগত মতবাদ নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। বইটির প্রবন্ধগুলির মধ্যে একটির সঙ্গে অপরটির কোন সম্পর্ক নেই। তাই একবার পড়ার পর মতামত দেওয়া কঠিন।

ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে ধূর্জটির বইটি[৬] হচ্ছে ইতিহাস নিয়ে কিছু অসংলগ্ন বক্তব্যের সমষ্টি এবং মার্কসীয় পদ্ধতিতে ইতিহাস বিচার, যেটা আমার মনে হয় ভারতের ইতিহাস বর্ণনার একমাত্র পদ্ধতি। ধূর্জটির বইটিও তাই। দুর্ভাগ্যক্রমে, বইটিতে অনেক গালভরা শব্দ আছে, যেমন ইতিহাস অথবা স্বাধীনতা, সৃষ্ট হওয়ার জন্য ইতিহাস অপেক্ষমান, প্রভৃতি। সত্যিকথা বলতে কী, যখন এবং যেখানে এই ধরনের ভাবনা-চিন্তার সম্মুখীন হই, তখন আমি বিমূঢ় বোধ করি। যাই হোক, ধূর্জটির বক্তব্য ক্যোসলায়ের[৭] বক্তব্যের বিপরীত। এই মুহূর্তে আমার মন আচ্ছন্ন না থাকলে দুজনের মত-পার্থক্য নিয়ে ভালো আলোচনা করা যেত। বই দুটি আর একবার পড়া হলে আমি দুটোর সমালোচনা একসঙ্গে লেখার চেষ্টা করব। মাত্র তিন-চার দিন আগে তিন নম্বর 'মার্কসিয়ান ওয়ে' পাওয়ায়, এই পুস্তক-সমালোচনা লেখার ব্যাপারে খুব বেশী তাড়া নেই।

'স্বাধীনতা'[৮] সম্পর্কে আপনার বইটি আমার এখনও ভালো করে পড়া হয়নি ; সম্ভবতঃ এই বইটি ধূর্জটি ও ক্যেসলারের পরস্পর-বিরোধী বক্তব্যের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি করবে। আমি সেজন্য বইটিকে আমার পুস্তক-সমালোচনার অন্তর্ভুক্ত করে একটা প্রবন্ধ লেখার বিষয় চিন্তা করেছিলাম। কিন্তু সেটা করতে এত বেশী সময় লাগবে এবং আমার পক্ষে এতটাই উচ্চাকাঙ্ক্ষা যে আমি ঐ চিন্তা মন থেকে বাতিল করে দিয়েছি।

আপনাদের দুজনের জন্য আমাদের দুজনের ভালবাসা।

সুধীন

॥ ৭ ॥

সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে

(দেরাদুন ?)

১৮. ৪. ৪৬

প্রিয় সুধীন,

আপনার ১২ তারিখের চিঠি আজ পেলাম। আমি কলকাতার ঠিকানাতেই লিখছি। কারণ এটা পৌছাবার আগেই আপনারা কলকাতায় ফিরে আসবেন।

অলস হওয়ার জন্যই ছুটির প্রয়োজন। সুতরাং এ-ব্যাপারে আপনার লজ্জার কারণ নেই। কিন্তু এটা খুবই দুঃখের বিষয় যে, আপনি যে জিনিস পছন্দ করেন না তার পিছনে আপনি অত সময় ব্যয় করছেন। যার পিছনে আপনি ১৫ দিন ব্যয় করেছেন, তা সত্যিই ভাল হয়নি, আমি এটা বিশ্বাস করতে রাজী নই।

ক্যেসলারের বই সম্পর্কে আপনার মন্তব্য খুবই আকর্ষণীয়। ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া[১]-এর জন্য আমি বইটি সবে পেয়েছি। আমি জানি না, এই সমালোচনা আপনার মনে কী ধরণের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। যাই হোক, ত্রৈমাসিক পত্রিকার সামনের সংখ্যায় আপনার পুস্তক সমালোচনার জন্য আমি নির্ভর করে থাকব। ডি-পি'র[২] বইটির সঙ্গে ওই বইটির সমালোচনা একটা ভাল পরীক্ষা-মূলক কাজ হবে। ডি-পি'র বইটি আমি এখনও পড়িনি। আমার বইটি সম্পর্কে আপনার মতামত একটা চমৎকার প্রবন্ধে দাঁড়াতে পারে এবং আপনার চেয়ে আর কেউ ওটা ভালোভাবে করতে পারবে না। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে

লেখাটা পাওয়ার কোন আশা নেই। তাই আমি কেবল সামনের সংখ্যার পুস্তক-সমালোচনা পাঠানোর জন্যই আপনাকে তাগাদা দেব। বিভিন্ন ঠিকানা ঘুরে যাওয়ার জন্য তৃতীয় সংখ্যাটা আপনার নিকট দেরিতে পৌছোবে। ওটা ২০শে মার্চ ডাকে দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী সংখ্যার লেখা ইতিমধ্যেই প্রেসে দেওয়া হয়েছে। গতকাল এখান থেকে প্রথম দফায় প্রুফ ফেরৎ পাঠানো হয়। মে মাসের মাঝামাঝি যাতে ছাপার কাজ সম্পূর্ণ হয়, সেজন্য এই মাসের মধ্যে সব লেখা পাঠিয়ে দেব বলে প্রেসকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। সুতরাং এই সময়ের মধ্যে পুস্তক সমালোচনা লেখার কষ্ট স্বীকার করতে পিছপা হবেন না। আপনি যদি কালিম্পং-এ ওটা না লেখেন, তাহলে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে ওটা লিখতে কি খুবই অসুবিধা হবে? কিন্তু আমি আপনাকে রেহাই দিতে পারি না। আপনার লেখাটি এখানে পাঠানোর কোন দরকার নেই। লেখাটি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওটি নিয়ে যাওয়ার জন্য সমরেন[৩] আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। আপনি কি স্টেটসম্যান-এ বইটির আলোচনা[৪] পড়েছেন? ওটা আলোচনাই নয়। আমার মনে হয়, ওটা লিণ্ডসের[৫] দলীয় আনুগত্য[৬]। যে কেউ প্রবলভাবে ভিন্ন মত পোষণ করতে পারে। কিন্তু তাতে সত্য চাপা পড়বে কেন? যাই হোক, এটাই ঘটেছে।

আপনাদের দুজনকে আমাদের দুজনের আন্তরিক অভিনন্দন সহ।

আপনাদের বিশ্বস্ত

রায়

॥ ৮ ॥

সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে

[সম্ভবত দেরাদুন থেকে]

৩১.৫.৪৬

প্রিয় সুধীন,

আপনি এখনও আমার শেষ চিঠির জবাব দেননি। কিন্তু আমি আশা করছি যে, আপনি আপনার পুস্তক-সমালোচনা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন এবং ডি-পি'র বইয়ের দুটো সমালোচনাই, আপনার এবং প্র্যাটের, ছাপানোর সপক্ষে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

আমরা অল্প কয়েকদিনের জন্য খুব সম্ভবত নৈনিতালে ছুটি কাটাতে যাচ্ছি। সেখানে এক বন্ধুর বাড়ি আছে এবং তিনি তাঁর সঙ্গে থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। যাওয়ার আগে মার্কসিয়ান ওয়ের পরবর্তী সংখ্যার যাবতীয় লেখা অবশ্যই প্রস্তুত রাখতে হবে। হাতে অনেক লেখা আছে, কিন্তু কোন নামী লেখকের একটিও নেই। তাই আপনাকে আমার কাজে লাগাতেই হবে। কালিম্পং থাকার সময়ে একটা প্রবন্ধ রচনার প্রতিশ্রুতি সত্যিই দিয়েছিলেন। কিন্তু মনে হচ্ছে, সেখানে আপনি পুরো সময়টা বাংলা প্রবন্ধের জন্য ব্যয় করেন। আপনি কি মনে করেন যে, মার্কসিয়ান ওয়ে-র জন্য আপনি সত্যিই কিছু লিখতে পারবেন? জুনের মধ্যেই লেখাটা শেষ করতে হবে। যাই হোক আমি আপনার নিকট থেকে একটা সত্যিকারের প্রবন্ধ চাই। আমি আপনার সব দুশ্চিন্তা ও কাজের কথা জানি। কিন্তু আপনি সম্ভবত আপনার কাজকর্ম ও মানসিকতার সঙ্গে সম্পর্কহীন ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের সময় কমাতে সক্ষম হবেন এবং সেই সময়টা একটা ভালো উদ্দেশ্যে ব্যয় করবেন।

আমি অন্য একটা ব্যাপারেও আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু অনিচ্ছাবশতঃ তা করা হয়নি। এটা একটা নিছক অনুসন্ধান এবং আপনি কোনও সাহায্য করতে না পারলে আপনার লজ্জিত হওয়ার কোন কারণ নেই। স্প্র্যাট পাণ্ডব-বর্জিত বাঙ্গালোরে এক অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। রাজনীতিতে তিতি-বিরক্ত হয়ে স্প্র্যাট এমন একটা মাতৃ-তান্ত্রিক যৌথ পরিবারে বিয়ে করে, যে-পরিবারে একটা কম্যুনিস্ট সেল শক্তভাবে গেড়ে বসেছে। ঐ অদ্ভুত পরিবেশের মধ্যে হতভাগ্য স্প্র্যাটকে কল্পনা করুন। আমি মনে করি, পালিয়ে যাওয়ার প্রথম সুযোগটাই তাঁর গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু অপরদিকে, তিনি বিচার-বিবেচনাবোধসম্পন্ন একজন ভদ্রলোক। নিজের খরচ ছাড়া পরিবারের মহিলা কর্ত্রী ও তাঁর চার সন্তানের খরচও তাঁকে চালাতে হবে। আমি তাঁকে কলকাতায় থাকতে দেখলে খুসী হতাম। আমার মনে হয়, আপনিও এটা পছন্দ করবেন। কিন্তু ওঁর জন্য একটা উপযুক্ত কাজ কী করে পাওয়া যায়? স্প্র্যাট কলকাতায় এলে আমরা অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের প্রকাশন-ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করে ওঁকে মাসে ২০০ থেকে ৩০০ টাকা দিতে পারব। যদিও, সেটা তাঁর পক্ষে যথেষ্ট হবে না। এই বিষয় নিয়ে চিন্তা করার সময় আমার মনে হল, স্টেটসম্যান-এ কোনও শূন্যপদ থাকলেও থাকতে পারে। যাই হোক, স্টেটসম্যান-এর মতো একটা সমৃদ্ধিশালী

প্রতিষ্ঠান সর্বদাই একজন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিকে কাজে লাগাতে পারে। এটা শুধু একটা ভাবনা এবং আপনিও যদি এ-রকম কিছু ভাবেন, তাহলে কাজের সম্ভবনা সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে আমাকে জানাবেন। অথবা, আপনি অন্য কিছু ভাবতে পারেন? প্র্যাট সত্যিই একটা সঙ্কটের মধ্যে আছে এবং একটা ভাল লোক যাতে ডুবে না যায়, সেজন্য আমিও উদ্বিগ্ন।

রাজেশ্বরী ও আপনাকে আমাদের দুজনের আন্তরিক অভিনন্দন।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

রায়

॥ ৯ ॥

এলেন রায়কে

স্যুট-৬

৬ রাসেল স্ট্রীট, কলকাতা।

জুন ২৬ (১৯৪৬?)

প্রিয় এলেন,

আপনার আনন্দঘন চিঠির জবাব দিতে দেরি হওয়ায় প্রথমেই আমার ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। রায়কেও একটা চিঠির জবাব দেওয়া হয়নি। আপনিও আমার শৃঙ্খলা-হীন অবসরের মধ্যে কোন রকম শৃঙ্খলা আনতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাই আপনাদের দুজনকে চিঠি লেখার মতো কোন প্রয়োজনীয় কাজের ব্যাপারেও আমার সময়াভাব আপনাকে চিরদিন সহ্য করতেই হবে।

ধূর্জটির বই সম্পর্কে আপনার সমালোচনাটি[১] খুবই সুখপাঠ্য হয়েছিল। তাছাড়া আপনার সব বক্তব্যের সঙ্গেই আমি প্রায় একমত। প্রকৃতপক্ষে ঐ বিষয়ে আমি যা লিখেছিলাম, তার তাৎপর্যের সঙ্গে আপনার বক্তব্যের খুব বেশী তফাৎ ছিল না।

ধূর্জটি মার্কসীয় পদ্ধতির পক্ষ থেকেই বলেছিল—আমি তার নিজস্ব ভিত্তিভূমি মেনে নিয়েও এই সিদ্ধান্ত করেছিলাম যে, সে এত যুক্তিহীন যে তাকে মিস্টিক না বলে উপায় নেই। সেজন্য আমি ওকে ক্যেসলারের সঙ্গে তুলনা করেছি এই কারণে যে, ক্যেসলারের সংগঠনের স্তরও একটি রহস্যবাদী রোমান্টিক ধারণা। যাই হোক, আমার মনে হয়, আপনি ধূর্জটির প্রতি একটু

বেশী কড়া হয়েছিলেন। সে ভাল কথাই বলতে চায়। কিন্তু বই শেষ করার জন্য এত তাড়াহুড়ো করে যে, শেষ পর্যন্ত ভাল রাখতে পারে না।

কোসলারের বইয়ের উপর রায়ের সমালোচনাটি একটা চমৎকার রচনা এবং আমি যে সাধারণভাবে তাঁর সঙ্গে একমত, সে-বিষয়েও আমি সচেতন। কিন্তু স্বভাবদোষে কোসলার-প্রচারিত নতুন সন্ন্যাসবাদে আমি একেবারেই উৎসাহিত বোধ করি না, যদিও রায় ওর মধ্যে সান্ত্বনা পান। যে জিনিসটাকে মানবতার মূল উপাদান বলে আমরা সকলেই একমত, সেটাকে বাঁচিয়ে রাখার কোন সম্ভাবনাই আমি দেখছি না। এটার জন্যই কোসলারের প্রতি আমার মনোভাব রায়ের চেয়ে কঠোর ছিল, যেটা রায় হতে পারেননি। আমি ইচ্ছে করেই তাঁর স্ট্যালিন-বিরোধী মনোভাবকে ছোট করেই দেখাতে চেয়েছি। কারণ আমার মধ্যেও স্ট্যালিন সম্পর্কে ওই মনোভাব বর্তমান এবং আপনি আমার ব্যক্তিগত মনোভাবকে যতদূর সম্ভব পুস্তক-সমালোচনার বাইরে রাখতে বলেছিলেন।

ধূর্জটির বইয়ের দুইবার সমালোচনার[২] জন্য আমি অপমানিত বোধ করতে পারি বলে রায়ের মনে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। আপনি রায়কে বলবেন যে, তিনি এখন আমাকে আগের চেয়ে ভালো করে বুঝতে পারবেন। আমি ঐসব জিনিসকে একেবারেই গুরুত্ব দিই না এবং আমার নিজের প্রচেষ্টা সম্পর্কে আমার ধারণা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে খুবই নিম্নমানের। সুতরাং এ-সব ব্যাপারে সময়ের অপব্যয় সম্পর্কে আমি কদাচিৎ সচেতন।

আজ দুপুরে তারকুণ্ডে[৩] আমার অফিসে আমার সঙ্গে খেতে এসেছিলেন। তাঁর কাছে রায়ের আবার অসুস্থ হওয়ার সংবাদ শুনে আমি খুবই চিন্তিত। বিশেষ করে এ-বছর বৃষ্টি এত বেশী হচ্ছে যে, সম্ভবত রায়কে পাহাড় এলাকায় নিয়ে যাওয়ার চিন্তা আদৌ ঠিক নয়। যাই হোক, আমি আশা করছি অসুখ তেমন গুরুতর নয় এবং আপনি এ-চিঠি পাওয়ার আগেই রায় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন।

তারকুণ্ডে আমাকে গ্রীষ্মকালীন শিক্ষা-শিবির সম্পর্কে বলেছেন। অবশ্য আপনার চিঠি এবং শিব রায়ের[৪] সঙ্গে কথাবার্তায় আমি আগেই কিছু কিছু জেনেছিলাম। আমি ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট ইণ্ডিয়ার প্রয়োজনীয় সংখ্যাগুলি পেয়েছি, যদিও সেগুলি পড়ার মতো সময় এখনও পাইনি। 'রায়-বাদ'-এর সাম্প্রতিক পরিণতি[৫] সম্পর্কে আমার মন্তব্য ভবিষ্যতের আরও এক শুভ মুহূর্তের জন্য

মুলতবী থাকছে। এখন সময় এত কম যে, আপনার চিঠি এবং পুস্তক-সমালোচনাগুলির প্রাপ্তি স্বীকার ছাড়া আর কিছুই করার উপায় নেই। আমি রায়কে কোন চিঠি দিচ্ছি না।

স্টেটসম্যান-এ প্র্যাটের জন্য কিছু করা অসম্ভব মনে হয়। যুদ্ধ-ফেরতা লোকদের জন্য স্টাফের সংখ্যা প্রয়োজনের চেয়েও অনেক বেশী।

সুধীন

॥ ১০ ॥

এলেন রায়কে

কলকাতা (?)

জুলাই ৭, (১৯৪৬)

প্রিয় এলেন,

আমাদের দুজনের চিঠি নিশ্চয়ই একই সঙ্গে দুজনের কাছে গিয়েছে। মিস্ত্রিরা ফ্ল্যাট ছেড়ে যাবে বলে যখন আমি অপেক্ষা করছিলাম, তখন ঐ কথাই ভাবছিলাম। আমরা এতদিন একটা নোংরা পরিবেশে বাস করছিলাম, যা কোন গৃহ-গর্বিত মহিলার সহ্য করা উচিত নয়,— রাজেশ্বরীর এই জাতীয় সিদ্ধান্তের ফলেই গত ১০ দিন আমাদের ফ্ল্যাটটি জঞ্জালের স্তূপে পরিণত হয়েছিল। চতুর্দিকে ধুলো-বালি এবং প্রচুর ভিজে রং। ফলে আমার মেজাজও তিরিক্ষে হয়ে আছে।

আমি 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া'য় 'নিউ ওরিয়েণ্টেশান' সম্পর্কে রায়ের দীর্ঘ প্রবন্ধ পড়েছি। স্বাভাবিকভাবে আমি তাঁর অধিকাংশ বক্তব্যের সাথে বহুলাংশে একমত। কিন্তু আপনি জানেন যে, আমার মানসিকতা একেবারেই নঙর্থক এবং আমি পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করি যে, মার্কসবাদে কাজ হবে না। তবে আমার কোন বিকল্প প্রস্তাব নেই। যাই হোক এটা খুবই সম্ভব যে, আমরা যে-সব অন্যায়কে সঙ্গতভাবেই কয়েক শতাব্দী যাবৎ ঘৃণায় পরিহার করে এসেছি এবং আমরা যাকে ভালো বলে জানি ও আরও ভালো করা সম্ভব তার সঙ্গে ওইগুলির সহ-অবস্থান খুবই জরুরী এবং বাস্তব-ঘটনা যদি এই হয়, তাহলে সামাজিক সমস্যার ক্ষেত্রে রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গী

আসতে বাধ্য। এখানে হয়তো রায় আমার সঙ্গে এক মত হবেন। আমার কোনও সন্দেহ নেই যে, আমার অবিশ্বাসকে অক্ষুণ্ণ রেখেই রায় আমাকে পরাজিত করবেন।

আমি যাঁদের সঙ্গে কথা বলেছি, সকলেই নেহেরুর নূতন বইটির[১] নিম্ন-মানের কথা বলেছেন। আমি এতে অবাক হইনি। এমন কী, সাহিত্য হিসাবে আত্মজীবনীটিও[২] ত্রুটিপূর্ণ এবং আমি এ বিষয়ে একমত হতে পারিনি যে, লেখক প্রকৃত ঘটনা বর্ণনার ব্যাপারে সততার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু প্রথম প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে তাঁর মূলগত ঐকান্তিকতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল এবং সেই সময় পর্যন্ত তাঁর জীবনযাত্রা-পদ্ধতির মধ্যে মহত্বের উপাদান ছিল। তখন থেকে তাঁর অহমিকাবোধ সব কিছুকে ছাড়িয়ে গিয়েছে এবং সেটা তাঁর লেখাকেও প্রভাবিত করতে বাধ্য। ফলে তাঁর বক্তৃতার মতো লেখাতেও আত্ম-সমালোচনা নেই বললেই চলে। আমার 'ডিসকভারি' পড়ার ইচ্ছে নেই, সমালোচনা করার ইচ্ছে আরও কম।

ধূর্জটির বই এবং আপনার সমালোচনা সম্পর্কে আমি আগেই লিখেছি। আপনি যা ভেবেছিলেন এবং আমি যা ভাবতে চাইনি, এখন স্প্র্যাট মোটামুটি সেই কথাই বলেছে। কোনও সন্দেহ নেই যে, ধূর্জটি বিরক্তিকর এবং দরকার না-থাকলেও দুর্বোধ্য হতে পারে। কিন্তু আমি এখনও বিশ্বাস করি যে, পাণ্ডিত্যের চমকে পূর্ণ সূক্ষ্ম বিচার করার মতো তাঁর একটা মন আছে এবং আমার মধ্যে হঠাৎ আলোর ঝলকানি সৃষ্টি করে বলে আমি তাঁর কাছে সবসময়েই কৃতজ্ঞ। যাই হোক, ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে তাঁর মতামতের সঙ্গে আমি একমত। এঁরা ফাঁপা মানুষ, কোথাও এঁদের শিকড় নেই, অবশ্য আমি যদি নিজেকে দিয়ে বিচার করি এবং আমাকে যদি তাঁদের একজন বলে ভাবি। আমি নিজেকে নিয়ে সেই ভাবেই চিন্তা[৩] করি। যে-কোন কারণেই হোক, আমরা ভারতের বিশেষ ইতিহাসের অংশ নই।

স্টেটসম্যান থেকে পালিয়ে যেতে পারলে খুসিই হব, কিন্তু কোথায়? সুতরাং যেখানে আছি, সেখানেই থাকতে হচ্ছে। রায় কেমন আছেন? ভালবাসা।

সুধীন।

॥ ১১ ॥

এম. এন. রায়কে

দি স্টেটসম্যান
স্টেটসম্যান হাউস। কলকাতা
জুলাই ১৪, ১৯৪৭।

প্রিয় রায়,

আপনার চিঠির জন্য অনেক ধন্যবাদ। দাঙ্গা এবং দেশ-ভাগ ছাড়া পৃথিবীতে যে আরও অনেক জিনিস আছে, আপনার চিঠি তা আমাকে মনে করিয়ে দিল। আমি অবশ্য সুশীলের চেয়ে অনেক সুখকর অবস্থায় আছি। কারণ ঘটনার মধ্যেই তাঁকে থাকতে হয়। তবে এই মুহূর্তে যে নৈরাশ্য তাঁকে আচ্ছন্ন করেছে, একজন নির্বিকার দর্শক হিসাবেও সেই নৈরাশ্য থেকে নিজেকে রক্ষা করা আমার কাছে কঠিন মনে হচ্ছে।

আপনাকে এ-কথা কে বলেছে যে, আমি অষ্টাদশ শতাব্দীর বস্তুবাদের সপক্ষে কিছু লেখার কথা ভাবছি? আমি নিশ্চয়ই একজন বস্তুবাদী। কিন্তু আপনার মতো আমিও স্বীকার করতে বাধ্য যে, জ্ঞানের লক্ষ্যকে বর্ণনা করার যুক্তি-ভিত্তিক অসুবিধা এড়িয়ে যাওয়া একপ্রকার অসম্ভব। কিন্তু এ-কথার অর্থ এই নয় যে, আমাদের সকলকে প্রপঞ্চবাদী হতে হবে। এমন কী, এই ভদ্রলোকদেরও এই বাস্তব ঘটনার প্রতি গুরুত্ব দিতে হয় যে, আধেয় ছাড়া বা বহির্মুখী গতিপথ ছাড়া সচেতনতা অসম্ভব। আমি বুঝতে পারি না, ওদের দলে যোগ দিয়ে আমরা কী ভাবে বস্তুর অত্যাচার থেকে নিজেদের মুক্ত করব। অবশ্য এটা একটা ছোট পয়েণ্ট এবং বড় প্রবন্ধে দাঁড় করানো সম্ভব নয়। তাছাড়া এই শহরের বর্তমান পরিবেশ[১] চিন্তা-ভাবনা করতে আদৌ সাহায্য করে না।

অস্তিত্বাবাদ সম্পর্কে আমার সমালোচনায় আমি খুসি হইনি। কিন্তু নূতন মতবাদ কী বলতে চায়, তা অনুধাবন করা এত কঠিন যে, খুঁটিনাটি বর্ণনা করা আমার কাছে অপ্রয়োজনীয় মনে হয়েছে। আমি অবশ্য তারপর নিজের দর্শনের সপক্ষে সার্ত্রে'র[২] লেখা পড়েছি, যেখানে তিনি কৌশলের সঙ্গে

অস্তিত্ববাদকে কারলেসিয়ানইজমের সমপর্যায়ে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। একই সময়ে আমি সার্ত্রে'র উপর একাধিক আক্রমণ পড়েছি এবং তাঁরা সার্ত্রে'র মতবাদকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। কিন্তু দুই ধরনের লেখা থেকেও আমি সার্ত-প্রচারিত এথিকস্ অনুধাবন করতে সক্ষম হইনি। আমি তাঁর উপন্যাস-গুলি সম্পর্কে যা শুনেছি তাতে আমার ওইসব বই পড়ার কোন ইচ্ছে নেই। কিন্তু তাঁর দুটি নাটক খুবই সুন্দর, বিশেষ করে 'লে মুশ' (মাছি)।

ক্যেসলার-কাহিনী[৩] কম্যুনিস্ট-সুবিধাবাদের এক নিখুঁত উদাহরণ। এলেন রাজেশ্বরীকে এ-বিষয়ে লিখেছিলেন এবং কিছুটা তিক্ত হলেও আমরা ওটা নিয়ে খুব হাসাহাসি করেছিলাম। লিগুসে K-কে[৪] কোন্ বিষয়ে বলছিল, আপনি যখন শুনবেন, আমাকে জানাবেন। আপনাদের দুজনকেই ভালবাসা।

সুধীন।

॥ ১২ ॥

এলেন রায়কে

৬ রাসেল স্ট্রী
কলকাতা
৫.৪.৪৮

প্রিয় এলেন,

আজকাল সুধীন খুবই পরিশ্রম করছে—সকাল নটায় বেরিয়ে যায়, সাড়ে পাঁচ অথবা ছটা নাগাদ খুবই ক্লান্ত হয়ে ফেরে। চিঠিপত্র বিভাগের ভার নেওয়ার পর থেকেই তাঁকে এ-ভাবে কাজ করতে হচ্ছে। আমি ঐ অদরকারী অথচ হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি একেবারেই পছন্দ করি না। সেজন্য সুধীন আমাকে জানাতে বলেছে যে, মার্কসিয়ান ওয়ে'র সেই প্রবন্ধটি লেখার সময় পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। আমি চাই, ও সেটি লিখুক। কিন্তু যখন কাজের শেষে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফেরে তখন লিখতে বসার জন্য আমি পীড়াপীড়ি করতে পারি না। ....

তোমাদেরই
রাজেশ্বরী।

। ১৩ ।

এম. এন. রায়কে

দি স্টেটসম্যান

স্টেটসম্যান হাউস, কলকাতা

জুন ২৬, ১৯৪৮

প্রিয় রায়,

দুদিন আগে পৌঁছানো আপনার ২২ তারিখের চিঠির জন্য ধন্যবাদ। এলেনের চমৎকার চিঠিটির জবাব রাজেশ্বরী ইতিমধ্যেই দিয়েছে। তবে এই সুযোগে অক্টোবরে দেরাদুনে যাবার আমন্ত্রণের জন্য আপনাদের দুজনকেই ধন্যবাদ জানাই। ছুটি পেলে অবশ্যই আমন্ত্রণের সদ্ব্যবহার করব। কিন্তু আমাদের ছুটির নিয়ম-কানুন সম্প্রতি বদলানো হয়েছে। আর সে-সব আমার নিকট এতই জটিল মনে হচ্ছে যে, আমার অবস্থা কী, তা আমি বুঝতে পারছি না। যাই হোক, স্টিফেনস[1] ছুটি শেষ করে না-ফেরা পর্যন্ত আমি ছুটি পাব না। কেউই ঠিক মতো জানেন না কখন তাঁর ছুটি শুরু হয়েছিল আর কবেই বা শেষ হবে। অতএব, আমি নিজে যদি পরিকল্পনাবিদ হতাম, তা হলেও আমাকে এখনকার মতো এ-সব জিনিস আবছা রাখতে হত।

উদ্বোধনী বক্তৃতাটা পড়ে খুবই আনন্দ পেয়েছি। আমাদের আগের আলোচনা থেকে আপনার জানা আছে যে, মোটামুটিভাবে আমি আপনার থীসিসের সঙ্গে একমত। আমি এখনও পর্যন্ত 'রাশিয়ান রিভোলুশান'[2]-এর ভূমিকা পড়ার চেষ্টাই করিনি। এটা এজন্য নয় যে, আমি এই মুহূর্তে বিশেষভাবে শ্রম-বিমুখ। বর্তমানে আমার উপর সত্যিই অত্যধিক কাজের চাপ এবং তা আমার অলস মনকে আরও অসাড় করে ফেলেছে। এই গরম, এই ক্রমবর্ধমান আত্মকেন্দ্রিকতাপূর্ণ জগতের প্রভাব এবং এই রুগ্ন ও স্বাস্থ্যভ্রষ্ট অফিসে একটানা আট-ন ঘণ্টা পরিশ্রমের পর যখন বাড়ি ফিরি, তখন আমি কেবল কথা বলার উপযুক্ত থাকি। দু এক গ্লাস মদ আমাকে রাতের খাবার পর্যন্ত চাঙ্গা করে রাখে এবং তারপর সুখ-নিদ্রার প্রতীক্ষা ছাড়া আর কিছুই সম্ভব হয় না।

আমার আশঙ্কা, এ-সব কথা আত্ম-করুণার মতো শোনাচ্ছে। আমি কিন্তু নিজের জন্য সত্যিই দুঃখিত নই, কেবল যে-পৃথিবীতে আমি বাস করছি, আমরা সকলেই বাস করি, সেই পৃথিবী আমাকে সম্পূর্ণ হতবুদ্ধি করেছে— এছাড়া আমরা ভালোই আছি এবং আশা করছি আপনারাও ভালো আছেন। আপনাদের দুজনকেই ভালবাসা।

সুধীন।

॥ ১৪ ॥

এম. এন. রায়কে

সেণ্ট অ্যান'স হোম
বিমলাপতম
অক্টোবর ২৭, ১৯৪৮

প্রিয় রায়,

আপনার চিঠির জন্য অশেষ ধন্যবাদ। চিঠিটা কলকাতা ঘুরে এই ঘুম-পাওয়া অনাবাদী জায়গায় আমাদের কাছে দুদিন আগে পৌঁছেচে। আমরা এখানে কী করে এলাম, তা রাজেশ্বরী ইতিমধ্যে এলেনকে জানিয়েছে। তাই আমি আর পুনরাবৃত্তি করছি না। এই ছোট্ট ছুটিটা আপনাদের সঙ্গে কাটাতে পারলে আমি আরও বেশী খুশী হতাম। কিন্তু ৩৬ ঘণ্টার ট্রেন যাত্রার পক্ষে ১০ দিনের ছুটি যথেষ্ট দীর্ঘ নয়। সৌভাগ্যক্রমে আপনি এ-বছর অনেক আগেই কলকাতা আসছেন। কাজেই শীগগিরই আমাদের দেখা হবে এটাই সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যদিও ১৩ মোহিনী রোডের বাড়িতে অতিরিক্ত কিছু যোগ[১] করা সম্পর্কে সুশীলের বর্ণনা আমাদের কৌতূহলী করেছে। অবশ্য এই সমস্ত বাড়তি স্বাচ্ছন্দ্য ছাড়াই দেরাদুন আমাদের নিকট অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল।

রুশো[২] বরাবরই আমার মনে বিরূপ মনোভাবের উদ্রেক করেছে। আর তাঁর মতো একজন প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিকে যে সমসাময়িক প্রগতিশীলেরা শ্রদ্ধা জানিয়েছেন এবং তাঁকে ফরাসী বিপ্লবের জনক বলে গণ্য করেছেন, তাতে আর একটা প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এমন কী, শ্রেষ্ঠ বিচারশক্তিও কতখানি বিবেচনাহীন হতে পারে এবং তাঁদের বেশীর ভাগ সুনামেরই তাঁরা অনুপযুক্ত।

আমি নিজে রাসেলের[৩] এই বক্তব্যে বিশ্বাসী যে, হিটলার (আমার মনে হয় স্ট্যালিনও) রুশোর মতবাদ এবং রুজভেল্ট ও চার্চিল লকের[৪] মতবাদ থেকে সৃষ্ট। রুশো রোমান্টিক পুনর্জাগরণে যেটুকু প্রেরণা জুগিয়েছিল, সেজন্যও আমি তাঁকে তীব্রভাবে নিন্দা করি। কিন্তু আমি মনে করি না যে, মহৎ বর্বরতার কাব্যিক উপাসক ওয়ার্ডসোয়ার্থের[৫] মধ্য-বয়সে রক্ষণশীল হয়ে যাওয়া কোনও আকস্মিক ঘটনা। কোনও সন্দেহ নেই যে, গোটিনজেনে বসবাস কোলরিজের[৬] প্রতিক্রিয়ার সাহায্য করেছিল। কিন্তু বায়রনের[৭] ভীতিকর ব্যক্তিগত আচরণ নিশ্চয়ই রুশোর সেনসিবিলিটি কাল্ট থেকে পাওয়া। এমন কী শেলীর[৮] মতো একজন খাঁটি বিপ্লবীও অমানুষিক নিষ্ঠুরতা এবং ব্যক্তিগত জীবনে স্বেচ্ছাকৃত মিথ্যা ভাষণে সক্ষম হতে পেরেছিলেন। কারণ তিনি হৃদয়কে মস্তিষ্কের উর্ধ্বে স্থান দেওয়ার শিক্ষা পেয়েছিলেন। রেনেশাঁসের অল্পদিন পরেই যে প্রথম রোমান্টিক আন্দোলন শুরু হয় এবং যার মেয়াদ অন্ততঃ বিলেতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত টিঁকে ছিল, সেই আন্দোলনের পুরো ধারাটা সত্যিই মুক্তিদাতা শক্তি হিসাবে কাজ করেছিল। এই রোমান্টিক আন্দোলনের কয়েকজন প্রবক্তা, যেমন চেলিনী[৯], নিঃসন্দেহে পুরোদস্তুর ইতর ছিলেন। কিন্তু তাঁদের দোষ-ত্রুটি তাঁদের মনুষ্যত্বের মধ্যেই নিহিত ছিল। এবং রুশোও তাঁর নব্য-বর্বর বা বরং নব্য-ধ্বংসকারী শিষ্যদের মতো এথেনসের জাঁকজমকপূর্ণ সংস্কৃতিকেই কামনা করতেন, স্পার্টার বর্বরসুলভ দক্ষতা নয়। রেনেশাঁসের ব্যক্তিরা টেরেনস[১০]-এর নিকট থেকে তাঁদের শ্লোগান ধার করেছিলেন, তাঁরা সম্ভবত প্রোটাগোরাস[১১]-এর কাছে তাঁদের ঋণ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না। এমন কী, সচেতন থাকলেও সম্ভবত যথেষ্ট পরিমাণে অধ্যয়ন-জনিত অন্তর্দৃষ্টির অভাবে তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেননি যে, প্রোটাগোরাসের বক্তব্যের দ্বিতীয়ার্থে সত্যের ব্যক্তি-নিরপেক্ষ ভিত্তিকেই বর্জন করা হয়েছে এবং প্রতিটি মানুষকে সমস্ত বিষয়ের মাপকাঠি এবং ভাল-মন্দের চূড়ান্ত বিচারক করেছে। উনবিংশ শতাব্দীর বীর-পূজারীরা এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি বেশী গুরুত্ব দেওয়ায় এই পৃথিবীতে যে ব্যক্তি-প্রবণতা দেখা দিয়েছে সেটাই জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠার উৎসাহ দেয়। সম্ভবত হেরাক্লিটাস[১২] ঠিকই বলেছেন। কারণ পরস্পর বিরোধীদের এক সঙ্গে মেলামেশা অনিবার্য, যারা ব্যক্তিকে ঐতিহ্যের দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিল, তারা সেই ব্যক্তির শরীর এবং আত্মাকে জাতীয় রাষ্ট্রের কাছে শেষ পর্যন্ত বিক্রি করে বসল।

নিজের চেয়ে অপরের কাছে নতি-স্বীকারের ফলে উনিশ শতকের বেশ কয়েকজন রোমান্টিকের কাছে নিকটতম আত্মীয়ার সঙ্গে যৌন-সংসর্গ অত আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল। বরজিয়ারা[১৩] এই বদ-অভ্যাসে লিপ্ত হলেও তারা এ-ব্যাপারে লোকের প্রশংসা আশা করেনি, যেমনটি বায়রন করতেন। মাদাম দ্য ওয়ারেনস তাঁর উপপত্নী হওয়ার পরেও রুশো তাঁকে মামাঁ (মা) বলে ডাকতেন। ওদিকে শেলী ব্যক্তিগত জীবনে নিকট আত্মীয়ার সঙ্গে যৌন-সংসর্গে অভ্যস্ত না হলেও 'রিভোল্ট অব ইসলাম'[১৪]-এ এ-বিষয়ে তাঁর মতামত সহানুভূতির চেয়েও বেশী ছিল। বোনের প্রতি ভালবাসাকে নীটশে[১৫] নীতির পর্যায়ে উন্নীত করেছিলেন এবং ডি-এইচ লরেন্সের[১৬] মাতৃ-প্রবণতা একটা কস্‌মিক তাৎপর্য পেয়েছিল। আমি জানি না, বাঙালী জাতীয়তাবাদের মাতৃ-পূজায় বিশ্বাসের এই জাতীয় কোনও ব্যাখ্যা সম্ভব কিনা।
ধর্মযুদ্ধগুলির অব্যবহিত পরে বন্ধ্যা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান থেকে রোমান্টিক পুনর্জাগরণ একটা শুভ পরিবর্তন। এটা যদি কিছু না-ও করে থাকে অন্তত ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যে একটা ভারসাম্য এনেছিল, যে-ভারসাম্য ধর্মীয় যুদ্ধের পর নৈরাজ্যের ভীতির জন্য নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু এই ভারসাম্য আনার চাইতেও এটা যে আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল, গ্যেটের[১৭] বিরাট ব্যক্তিত্ব ও সাকল্যই তার প্রমাণ। তা কেবল নীতিশিক্ষার হাত থেকেই শিল্পকে রক্ষা করেনি, নূতন শিল্প-রীতিও সৃষ্টি করেছিল। তাছাড়া, ধ্রুপদী ও রক্ষণশীলতার মধ্যে যতটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, রোমান্টিকতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতার মধ্যে সম্পর্ক তার চেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠ নয়। এ-বিষয়ে আরও একটা স্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে, রোমান্টিকতাকে ব্যক্তির নিজস্ব ও স্বতন্ত্র মনোভাবের প্রকাশ হিসাবে গণ্য করতে হবে, যে বিশেষ মনোভাব বেশীরভাগ সৃজনশীল কাজে প্রথম তাগিদ সৃষ্টি করে থাকে। এভাবে দেখলে সফোক্লিস[১৮] ও দান্তের[১৯] মধ্যেও রোমান্টিক মানসিকতা খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

আমার মনে হচ্ছে, আমি অনেক আজেবাজে বকলাম। কিন্তু এখানেই শেষ না করলে এই চিঠি আজ আর যাবে না—বিমলাপতমে আসা আমাদের দুজনের পক্ষেই ভালো হয়েছে। কিন্তু ছুটিটা অত্যন্ত অল্প হওয়ায় আমাদের পুরোপুরি সজীব করতে পারেনি। আমরা আগামী পরশু ফিরব। দুজনেই কেমন আছেন? ভালবাসা।

সুধীন

এলেন রায়কে

॥ ১৫ ॥

৬ রাসেল স্ট্রীট
কলকাতা

প্রিয় এলেন,

তোমার সুন্দর চিঠিটা গতকাল এসেছে। অবশ্য অত সান্ত্বনা দেবার দরকার ছিল না। কারণ শেষ পর্যন্ত দিল্লির কাজটি[১] হয়নি, সেটা সুধীনের নূতন কিছু করতে অনিচ্ছার জন্য নয় বা আমার দিল্লিতে বসবাসের কষ্টের কথা ভেবেও নয়। পত্রিকার মালিকেরা সুধীনের একটি শর্তে অরাজী হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সুতরাং সমস্ত পরিস্থিতিটা বদলে যায় এবং দিল্লি যাওয়ার চিন্তা বাতিল করতে হয়। কিন্তু তুমি আমার ভূমিকা সম্পর্কে ভুল ধারণা করেছ। আমি যখন তোমাকে আগের চিঠিটা লিখেছিলাম, তখন সুধীন আমার মত (যদিও একটু ভয়ে ভয়ে) নিয়েই চাকরিটি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয় এবং সমস্ত শর্তগুলি স্পষ্ট করে জানিয়ে তার চাকরি গ্রহণের চিঠিটি পত্রিকার মালিক পক্ষের নিকট পাঠায়। কারণ তাঁরা সুধীনের নিকট তাঁদের চিঠিতে শর্তগুলি স্পষ্ট করে জানাননি। আমরা কখনও ভাবিনি যে, শর্তগুলিতে ওঁদের আপত্তি করার মতো কিছু থাকতে পারে। সুতরাং দিল্লিতে চলে যাওয়ার জন্য কী কী ব্যবস্থা করতে হবে, তাই নিয়েই আমরা সত্যিসত্যিই ভাবতে আরম্ভ করেছিলাম। এই সময়েই এখানকার বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার (কত বছরের জন্য জানিনা) কথা ভেবেই আমি অসুখী বোধ করি এবং সেই মানসিক অবস্থাতেই আমি তোমাকে আগের চিঠি লিখি, যেটাকে তুমি বেপরোয়া বলে আখ্যা দিয়েছ। ওই চিঠিতে অবশ্য বিশেষ মুহূর্তের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছিল, যে-মনোভাব মানুষের খুব শান্তিতে বসবাসের এবং বিশেষ স্মৃতি-বিজড়িত জায়গা ছেড়ে চলে যাবার সময় হয়, যেমন কলকাতা আর এই ফ্ল্যাটটির প্রতি আমার আছে। এখানেই আমি সুধীনকে প্রথম জানতে পারি। এই ফ্ল্যাটেই আমরা আমাদের প্রথম সংসার পেতেছিলাম। এটা অবশ্য সেন্টিমেন্টের ব্যাপার। কিন্তু এ-ধরনের ঘটনা অনেকেই এড়াতে পারে না। মনে মনে এটাও বুঝেছিলাম যে, দিল্লিতে কিছুদিন বসবাসের পর সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু ছোট একটা হোটেলে বসবাসের চিন্তা খুবই মারাত্মক ও অস্বস্তিকর ছিল। কারণ সবাই বলছিল এভাবে আমাদের এক বছর, এমনকী তার চেয়েও বেশী সময় থাকতে হতে পারে। যাই হোক, আমার সিদ্ধান্ত ঐ চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। এসব সত্ত্বেও, আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম এই ভেবে যে, কাজটা সুধীনের পক্ষে খুবই আকর্ষণীয় হবে। কিন্তু পত্রিকার মালিকেরা অপ্রত্যাশিতভাবে সুধীনের চিঠিকে ভুল বুঝলেন এবং আগে যে-শর্তে রাজী হয়েছিলেন, তাতেই তাঁরা আপত্তি জানালেন। ওঁদের চিঠিটা আমাদের কাছে অনেকটা আঘাত হিসাবে এসেছিল—আমরা নিশ্চয়ই ও-জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। ফলে পুরো জিনিসটা হঠাৎ পড়ে গেল, মুখে রেখে গেল একটা তিক্ত স্বাদ, যা থেকে আমরা এখনও মুক্তি পাইনি। সুতরাং ছুটির ব্যাপার নিয়ে আমরা আদৌ আলোচনা করিনি। তবে, আমার মনে হয়, সুধীন এপ্রিল বা মে মাসের গরমে বেড়াতে যেতে চাইবে না। এপ্রিলে দেরাদুন কেমন? তখন কি খুব গরম?

রায় কেমন আছেন? দিল্লির কাজ সম্পর্কে তাঁর মত কী ছিল? তিনি কি এর পক্ষে ছিলেন, না বিপক্ষে?

কলকাতার জীবন সম্পর্কে আমার বিতৃষ্ণা এখনও আছে। কিন্তু দিল্লি এমন একটা জায়গা নয়, যার সঙ্গে আমি কলকাতাকে বদল করতে চাইব। সুধীনের পক্ষে কাজটি আকর্ষণীয় হবে ভেবে আমরা দিল্লির প্রস্তাব বিবেচনা করেছিলাম। যাই হোক, ঐ-সব বিষয়ের চিন্তা শেষ হয়ে গিয়েছে। এ-নিয়ে আর আলোচনা করে কোনও লাভ হবে না। তাড়াতাড়ি চিঠি লিখবে। ভালবাসা জেনো।

তোমাদের
রাজেশ্বরী।

পত্র-পরিচয়

চিঠি—১

১. দুখানি বই। একখানা এম. এন. রায়ের নিজের লেখা 'লেটারস ফ্রম জেল' এবং অপরটি 'কম্যুনিস্ট ইণ্টারন্যাশনাল'।

২. এম. এন. রায়ের ধারণা ছিল 'শেষ প্রশ্ন' একটি উঁচুদরের উপন্যাস, এমনকী নোবেল পুরস্কার পাওয়ার মতো বই।

৩. ম্যাক্স বর্ণ (১৮৮২-১৯৭০)—জার্মান পদার্থবিদ। তাঁর গবেষণার ফলে আগেকার কোয়ানটাম থিয়োরির পরিবর্তন হয়। 'বর্ণ-ওপেনহাইমার থিয়োরি অব মলিকুলস' বিখ্যাত। বর্ণ ১৯৩৩ সালে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন। ১৯৫৪ সালে নোবেল পুরস্কার পান।

৪. হাইজেনবার্গ (১৯০০-) জার্মান পদার্থবিদ। কোয়ানটাম মেকানিকস সৃষ্টির জন্য ১৯৩২ সালে নোবেল পুরস্কার পান। প্রথমে তিনি গটিনজেন-এ ম্যাক্স বর্ণের সঙ্গে এবং পরে তিন বছর নীল্‌স্ বোরের সঙ্গে কাজ করেন। কোয়ানটাম থিয়োরির উপর হাইজেন-বার্গের কাজ আণবিক ও পরমাণবিক চর্চার ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

৫. নীল্‌স বোর (১৮৮৫-১৯৬২) ডেনিশ পদার্থবিদ। প্রথমে পরমাণুর অভ্যন্তরে ইলেকট্রনের কার্যকলাপ নিয়ে গবেষণা করেন। গত ৫০ বছর যাবৎ কোয়ানটাম ফিজিক্সের বিবর্তনে বোরের অবদান সবচেয়ে বেশী। 'হাইড্রোজেন-অ্যাটম' থিয়োরির জন্যও বোর বিখ্যাত। বোর ১৯২২ সালে পদার্থবিদ্যায় এবং ১৯৫৭ সালে শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পান।

৬. আন্দ্রে মালরো (১৯০১-) ফরাসী লেখক ও রাজনীতিবিদ। নৃতত্ত্ব আবিষ্কারের কাজে প্রথমে ইন্দোচীনে যান, ইরান ও আফগানিস্থানে গ্রীক-বৌদ্ধ শিল্প আবিষ্কার করেন। চীনে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সাহায্য করেন, স্পেনের গৃহযুদ্ধে রিপাবলিকানদের পক্ষে লড়েন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন

জানিয়েছিলেন। যুগলের মন্ত্রিসভায় সাংস্কৃতিক মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৭৪ সালে তাঁকে নেহরু শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয়।

৭. ইংরেজ-কবি ডবলিউ বি ইয়েটস-এর 'দি সেকেণ্ড কামিং' কবিতাটির কথাই সম্ভবত বলা হয়েছে।

৮. শ্রীমতী সেন কে, তা জানা সম্ভব হয়নি।

৯. সুশীলকুমার দে, আই-সি-এস।

চিঠি—২

১. ধরিত্রী গঙ্গোপাধ্যায়। তিরিশ দশকের এক সর্বভারতীয় ছাত্রনেতা। র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির সদস্য ছিলেন।

২. এম. এন. রায় সম্পাদিত ত্রৈমাসিক 'মার্কসিয়ান ওয়ে' (MW)।

৩. রাজেশ্বরী দত্ত।

৪. শিল্পী যামিনী রায়।

৫. লক্ষ্মণশাস্ত্রী যোশী তর্কতীর্থ। এদেশের একজন বড় সংস্কৃত পণ্ডিত ও ভারততত্ত্ববিদ। এম. এন. রায়ের প্রাক্তন সহকর্মী এবং মহারাষ্ট্রের ওয়াই ইনষ্টিটিউটের ডিরেক্টর।

৬. 'ফিলজফি অব লাইফ অ্যাণ্ড আর্ট' প্রবন্ধটি MW-এর প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৭. আবু সয়ীদ আইয়ুব। দার্শনিক ও সাহিত্য-সমালোচক। দীর্ঘকাল ইংরেজী ত্রৈমাসিক 'কোয়েস্ট' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি এই সময়েই প্রথম প্লুরিসিতে আক্রান্ত হন।

৮. দি লিবারেল রিট্রোসপেক্ট। MW-এর প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৯. জন ডিউই : ফ্রীডম অ্যাণ্ড কালচার।

১০. সুধীন্দ্রনাথের সমালোচনা বের হয় — MW-তে। প্রথম বর্ষ। পৃঃ ৩৯১-৩৯৩।

১১. সুশীলকুমার দে'র স্ত্রী ইন্দিরা'র ডাকনাম।

চিঠি—৩

১. MW.

২. প্রথমে ঠিক হয়েছিল MW-এর প্রচ্ছদ হবে টর্চ এবং সেটা যামিনী রায়কে দিয়ে আঁকানো হবে।

চিঠি—৪

১. MW-এর প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত সুশীলকুমার দে ওরফে সিকান্দার চৌধুরীর প্রবন্ধ। তিনি আই-সি-এস হওয়ায় স্বনামে রাজনৈতিক পত্রিকায় লিখতে পারতেন না।

২. ফিলিপস স্প্র্যাট—ব্রিটিশ কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য হিসাবে এদেশে কম্যুনিস্ট সংগঠন গড়ে তোলার জন্য আসেন। মীরাট কম্যুনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী। পরে এম. এন. রায়ের সঙ্গে তিনি মার্কসবাদে আস্থা খোয়ান এবং র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট হন।

৩. দেবশরণ দাশগুপ্ত। একজন র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট। MW-এর প্রকাশক ছিলেন। বর্তমানে সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত।

৪. মরিস গয়ার—দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য এবং ভারতের ফেডারেল কোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন।

চিঠি—৬

১. এলেন রায়, এম. এন. রায়ের বিদেশিনী স্ত্রী ও রাজনৈতিক সহকর্মী। ১৯৬১ সালে দেরাদুনে আততায়ীর হাতে রহস্যজনকভাবে নিহত হন।

২. এম. এন রায়ের প্রস্তাবিত বই 'রিজন, রোমান্টিসিজম অ্যাণ্ড রিভোলুশান'-এর কাঠামোর খসড়া।

৩. ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তখন তিনি লখনৌ থাকতেন।

৪. 'উক্তি ও উপলব্ধি'। প্রথমে প্রতিভা বসু সম্পাদিত 'বৈশাখী'-তে বের হয়। প্রবন্ধটি 'কুলায় ও কালপুরুষ' গ্রন্থভুক্ত।

৫. বইটির লেখক আর্থার ক্যেসলার।

৬. ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'অন ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্রি—এ স্টাডি ইন মেথড'।

৭. আর্থার ক্যেসলার (১৯০৫ —) প্রাক্তন হাঙ্গেরিয়ান কম্যুনিস্ট ও ইংরেজ সাহিত্যিক। কম্যুনিস্ট হিসাবে রাশিয়ায় গিয়ে কম্যুনিজম সম্পর্কে তাঁর মোহভঙ্গ হয়। স্পেনের গৃহযুদ্ধে শত্রুপক্ষের হাতে পড়ে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসেন। কুখ্যাত মস্কো-বিচারের পটভূমিকায় লিখিত ক্যেসলারের 'ডার্কনেস অ্যাট নুন' বইটি এক সময়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ইংরেজী সাহিত্যে সমকালীন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উপন্যাস রচনার অন্যতম পথিকৃৎ।

৮. এম. এন. রায়ের 'ফ্রীডম' নামে বইটি।

চিঠি—৭

১. অধুনালুপ্ত র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির সাপ্তাহিক মুখপাত্র।

২. ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে সংক্ষেপে 'ডি-পি' বলা হত।

৩. সমরেন রায়। প্রাক্তন র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট। এম. এন. রায়ের বাল্য ও কৈশোর নিয়ে লেখা 'রেস্টলেস ব্রাহ্মিণ' বইটির রচয়িতা।

৪. 'ফ্রীডম' বইটির আলোচনা।

৫. লিণ্ডসে এমার্সন (১৯১২ —) জন্ম কলকাতায়। ১৯৩২ সালে স্টেটসম্যান পত্রিকায় যোগদান করেন, বর্তমানে ঐ পত্রিকার ডেপুটি-এডিটর। তিনি ইংরেজ হলেও এদেশকেই নিজের দেশ হিসাবে মেনে নিয়েছেন। তাঁর পরলোকগত স্ত্রী শ্রীমতী মৃণালিনী এমার্সন বেথুন কলেজের অধ্যক্ষা ছিলেন।

৬. তখনও পর্যন্ত লিণ্ডসে কম্যুনিস্ট ছিলেন।

চিঠি—৯

১. এলেন রায়ের সমালোচনা সম্ভবত 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া'র প্রকাশিত হয়েছিল।

২. একই পত্রিকায় ফিলিপস স্প্র্যাট ও সুধীন্দ্রনাথ কৃত সমালোচনা।

৩. ভি. এম. তারকুণ্ডে। মহারাষ্ট্রের লোক। বোমবাই হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি। বর্তমানে মাসিক 'র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট' পত্রিকার সম্পাদক এবং জয়প্রকাশ নারায়ণ কর্তৃক গঠিত 'নির্বাচনব্যবস্থার সংস্কার' কমিটির চেয়ারম্যান।

৪. অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায়। বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারত-চর্চা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। ইংরেজী ও বাংলায় অনেকগুলি মননশীল গ্রন্থের রচয়িতা ও সম্পাদক। সর্বশেষ বাংলা বই 'কবির নির্বাসন ও অন্যান্য ভাবনা'। এলেন রায়ের সঙ্গে লিখিত 'ইন ম্যানস ওউন ইমেজ' বইটিও উল্লেখযোগ্য।

৫. এ-বিষয়ে এম. এন. রায়ের 'নিউ হিউম্যানইজম' বইটি দ্রষ্টব্য।

চিঠি—১০

১ 'ডিসকভারি অব ইণ্ডিয়া'।

২. নেহরুর 'অটোবায়োগ্রাফি'।

৩. একটা বিশেষ মুহূর্তের কথা হলেও নিজের সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথের এ-বক্তব্য পুরোপুরি ঠিক নয়।

চিঠি—১১

১. ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে হিন্দু ও মুসলমানের পক্ষে ভিন্ন পাড়ায় যাওয়া নিরাপদ ছিল না। প্রতিদিনই ছুরিকাঘাতে কিছু লোক মারা যেত বা আহত হত।

২. অস্তিত্ববাদ দর্শনের অন্যতম প্রবক্তা ফরাসী লেখক ও বুদ্ধিজীবী জঁ্যা পোল সার্ত (১৯০৫ —)।

৩. ক্যেসলার-বর্ণিত কাহিনী।

৪. আর্থার ক্যেসলারকে ? অবশ্য লিগুসে এমার্সনের ধারণা ক্যেসলারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় আরও পরে।

চিঠি—১৩

১. আয়ান স্টীফেন্‌স, স্টেটসম্যানের তৎকালীন সম্পাদক। ভারত-বিরোধী। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর পাকিস্তান সরকারের টাকায় আজাদ কাশ্মীর সরকারের নামে স্টেটসম্যান পত্রিকায় একটা বিজ্ঞাপন ছাপলে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল রেগে যান এবং তার কিছুদিন পরেই স্টীফেন্‌স-কে এদেশ ছেড়ে যেতে হয়। পরবর্তীকালে তিনি পাকিস্তানী প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁর পরামর্শদাতা হন এবং একটা ভারত-বিরোধী বই লেখেন।

২. রুশ-বিপ্লব এবং রুশ দেশে বিপ্লব পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে এম. এন. রায়ের বই।

চিঠি—১৪

১. দেরাদুনে এম. এন. রায়ের বাড়িতে ঘরের সংখ্যা বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে।

২. জঁ্যা জ্যাক রুশো (১৭১২-৭৮) — ফরাসী লেখক, দার্শনিক ও রাষ্ট্র-বিজ্ঞানী। তাঁর 'কনট্রাকুট স্যোশাল' বইটি রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রজাদের সংগ্রামে প্রেরণা জুগিয়েছিল। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর কোনও নৈতিকতার বালাই ছিল না। ২৫ বছর যাবৎ এক পরিচারিকার সঙ্গে জীবন কাটিয়ে তাদের ৫টি সন্তানকেই একটা হাসপাতালে জমা দিয়েছিলেন।

৩. বার্ট্রাণ্ড রাসেল (১৮৭২-১৯৭০) — ইংরেজ দার্শনিক ও লেখক।

৪. জন লক (১৬৩২-১৭০৪) রচিত বইগুলির মধ্যে ১৬৯০ সালে প্রকাশিত 'ট্রিটিজ অব গভর্ণমেণ্ট' বইটি আলোড়ন সৃষ্টি করে। তিনি রাজাদের ঈশ্বর-প্রদত্ত অধিকার মতবাদের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন।

৫. ওয়ার্ডসওয়ার্থ (১৭৭০-১৮৫০) — ইংরেজ রোমান্টিক কবি।

৬. স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ (১৭৭২-১৮৩৪) — ইংরেজ কবি ও সাহিত্য সমালোচক। দুবার দুটি পত্রিকা বের করেছিলেন। জার্মান দার্শনিকদের বক্তব্য ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করেন।

৭. জর্জ গর্ডন বায়রন (১৭৮৮-১৮২৪) — ইংরেজ রোমান্টিক কবি।

৮. পি. বি. শেলী (১৭৯২-১৮৮২) — ইংরেজ রোমান্টিক কবি। 'নাস্তিকতার প্রয়োজন' শীর্ষক পুস্তিকা লেখার জন্য ১৮১১ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হন।

৯. বি. চেলিনী (১৫০০-১৫৭১) — ইতালির ফ্লোরেন্সে জন্মগ্রহণ করেন। এই ইতালিয়ান স্থপতি তাঁর শিল্পকর্মে রুচি ও দক্ষতার জন্য ফ্রান্স ও ফ্লোরেন্সে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। ১৭২৮ সালে ইতালিতে প্রকাশিত 'আত্মজীবনী' রোমান্টিক আন্দোলনের জোয়ারে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। পরে বইটির ইংরেজী (১৭৭১), জার্মান (১৭৯৬) এবং ফরাসী (১৮২২) অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

১০. টেরেনস (খৃঃ পূঃ ১৯০-১৫৯ অব্দ) — রোমান ভাষায় হাস্যরসের কবি ও নাট্যকার। কার্থেজে জন্ম। বাল্য বয়সে ক্রীতদাস হিসাবে রোমে যান, তাঁর মালিক তাঁকে মুক্তি দেন। পরে গ্রীসে যান এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি ছটি নাটক লিখেছিলেন।

১১. প্রোটাগোরাস (খৃঃ পূঃ ৪৯০-৪২১, মতান্তরে খৃঃ পূঃ ৪৮৫-৪১১ অব্দ) — প্রথম ও সবচেয়ে বিখ্যাত সফিষ্ট। সফিষ্টরা মানুষের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যে আস্থাবান। প্রোটাগোরাস শাশ্বত বলে কিছু বিশ্বাস করতেন না। তাঁর 'ট্রুথ' বইটার প্রথম লাইন হচ্ছে, মানুষই সব কিছু বিচারের মাপকাঠি। অন্য বইটিতে তিনি নাস্তিকতা প্রচার করেছেন।

১২. হেরাক্লিটাস — প্রথম দার্শনিক যিনি পরিবর্তনের ধারা বুঝতে পেরেছিলেন। খৃঃ পূঃ প্রায় ৫০০ অব্দে "প্রকৃতি সম্পর্কিত" বইতে লেখেন, জগতের সব জিনিসই একটা প্রবাহমান পর্যায়ে আছে, কোনও জিনিসের গঠনই স্থায়ী নয়। হেরাক্লিটাসের আবিষ্কার দীর্ঘকাল যাবৎ গ্রীক-দর্শনের বিবর্তনকে প্রভাবিত করেছে।

১৩. বোরজিয়ারা — সম্ভবত ইতালির পোপ ষষ্ঠ আলেকজাণ্ডার (১৪৩১-১৫০৩) তাঁর ছেলে সিজার (১৪৭৬-১৫০৭) এবং মেয়ে লুক্রেসিয়া বোরজিয়ার কথা বলা হয়েছে। নিকট আত্মীয়ার সঙ্গে যৌন সংসর্গ অপেক্ষা মেয়ে বা বোনকে কী ভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল, সেটাই অনেকের নিকট বেদনাদায়ক মনে হবে।

১৪. ১৮১৭ সালে রচিত শেলীর একটা দীর্ঘ কবিতা।

১৫. ফ্রেডারিক উইলহেলম নীটশে (১৮৪৪-১৯০০) — পোলিশ বংশোদ্ভূত জার্মান দার্শনিক।

১৬. ডি-এইচ্‌ লরেন্স (১৮৮৫-১৯৩০) — ইংরেজ কবি ও ঔপন্যাসিক। লেখকের "লেডি চাটারলি'জ লাভার" উপন্যাসটি এখনও অশ্লীলতার অভিযোগে বিতর্কের সৃষ্টি করে থাকে।

১৭. গ্যেটে (১৭৪৯-১৮৩২) — জার্মান কবি, নাট্যকার, চিত্রকর ও রাজনীতিবিদ্‌। বাংলায় এঁর নামের বানান তিন ভাবে লেখা হয়— গ্যেটে, গ্যোয়ঠে ও গ্যয়টে। কাব্য নাটিকা 'ফাউস্ট' সবচেয়ে বিখ্যাত বই। বাংলাভাষায় গ্যেটে সম্পর্কে আলোচনায় কাজী আবদুল ওদুদের দুই-খণ্ডে প্রকাশিত "কবিগুরু গ্যেটে" এবং শিবনারায়ণ রায়ের "রবীন্দ্রনাথ ও গ্যয়টে" (সাহিত্যচিন্তা) উল্লেখযোগ্য।

১৮. সফোক্লিস (খৃঃ পূঃ ৪৯৬-৪০৬ অব্দ) — গ্রীক ট্রাজিক নাটকের অন্যতম জনক। তাঁর ট্রাজেডির নায়কদের মধ্যে বীরত্ব কম থাকলেও তাঁরা অনেক বেশী মানবিক ছিল। তাঁর অয়দিপাউস, আন্তিগোনে প্রভৃতি নাটক বিখ্যাত।

১৯. দান্তে আলিগিয়েরি (১২৬৫-১৩২১) — ইতালীয় কবি ও ইতালীয় ভাষার জনক। জন্ম সম্ভবত ফ্লোরেন্স-এ। ২৬ বছর বয়সে প্রকাশিত 'ভিটা নুওভা' এবং 'ডিভাইন কমেডি'র জন্ম তিনি বিশ্বসাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। পোপের বিরাগভাজন হওয়ায় জেল ও জরিমানা এড়াতে তিনি ১৩০১ সালে ফ্লোরেন্স থেকে পালিয়ে যান এবং জীবনের শেষ বছরগুলি অশেষ দুঃখের মধ্যে কাটান।

চিঠি—১৫

১. দিল্লি থেকে প্রকাশিত ইংরেজী সাপ্তাহিক 'থট' পত্রিকার সহকারী ও সাহিত্য সম্পাদকের দায়িত্ব।

২. স্টেটসম্যান পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক আর্থার মুর পত্রিকাটির অন্যতম মালিক ছিলেন। এখানে ছাপা হল না এমন কয়েকটি চিঠিতে এ-বিষয়ে আরও আলোচনা আছে।

অনুবাদ : নার্গিস সাত্তার   সম্পাদনা : নিরঞ্জন হালদার